জীবনের চেয়ে বড়

দেবেশ দাশ

Jibaner Cheye Bara
By Debesh Das

প্রকাশক :
নিভা মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

সরকার প্রদত্ত কাগজে মুদ্রিত

প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৪৪

মূল্য : ১৫·০০ (পনের টাকা) মাত্র

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীসুধীর মৈত্র
ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোঃ

মুদ্রাকর :
শ্রীমন্মথনাথ পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

আগামী দিনে
যারা জীবনের চেয়ে বড় কিছুর সাধনা করবেন
সেই বীর তরুণ তরুণীদের

এই লেখকের :

ইয়োরোপা

রাজোয়ারা

অর্ধেক মানবী তুমি

রোম থেকে রমনা

রাজসী

রক্তরাগ

সেই চিরকাল

প্রথম ধরেছে কলি

সুদূর বাঁশরী

সেই কলকাতা

উপন্যাসের উৎস মুখে

সিনরা পুত্তির চোখে জল, কিন্তু মুখে হাসি।

দুইয়েরই ছবি আমি লেক জেনিভার বুকে দেখছি। মুখ তুলে এই রূপসী ইটালিয়ান মহিলার দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছে না।

কি জানি কি কাহিনী উনি বলবেন। কোন্ বেদনার স্মৃতি। কোন্ সান্ত্বনার শান্তি দিতে হবে তাঁকে।

ওঁর স্বামী গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে যুদ্ধবন্দী ছিলেন। স্বামীর ভাবনায় ব্যাকুল দীর্ঘ তিন বছরের কাহিনী শুনছি। আমি ভারতীয় আর কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের সেক্রেটারী। তাই উনি তাঁর স্বামীর ভারতের অভিজ্ঞতার কথা আমায় শোনাচ্ছেন।

যুদ্ধ সত্ত্বেও, যুদ্ধের মধ্যেও আমাদের দেশ আর বন্দীশিবিরের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি ধারণা আর অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই বর্ণনা। শুধু বিরহবিধুরার অন্তরের কাহিনী হলে অন্য কথা ছিল। সে ব্যথা তো অনেক পুরনো, অনেক গল্প উপন্যাসে জানা, অনেক ভুক্তভোগীর মুখে শোনা—এমন আর নতুন জিনিস কি? স্বামী যে আমারই 'অতিথি' ছিলেন তা জানেন না।

কিন্তু শত্রুরা যে বর্বর ব্যবহার করে, নিষ্ঠুর কষ্ট দেয়, অত্যাচারে অনাহারে মেরে ফেলে নিজেদের দায়ভার কমিয়ে ফেলতে চায় একথা কাগজে বেতারে প্রায়ই বলে। স্বামীর বন্দীদশার প্রথম পর্যায়ের সময় সিনরা পুত্তির যা মানসিক অবস্থা হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ তিনি দিচ্ছিলেন। নীরব আর সংবেদনশীল শ্রোতা পেয়ে তাঁর মনের আগল খুলে গিয়েছিল। এমনিতেই ইটালিয়ানরা কথা বলতে, মুখের তোড়ে বুকের ব্যথা উজাড় করে দিতে ভালবাসে। তাঁর বর্ণনা অন্তরঙ্গ রোজনামচার মত হয়ে গেল।

আর এখানে যে নিরীহ লোকটি শ্রোতা তিনি আগামী ইণ্টারন্যাশন্যাল সোশ্যাল সিকিউরিটি কনফারেন্সের সভাপতি। সেই আন্তর্জাতিক ইউ. এন. প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই কনফারেন্সের লেয়াইজন অফিসার তাঁর স্বামী। লেকের পারে তাঁর গৃহের নিরালা বাগানে আমাদের বসিয়ে তিনি হঠাৎ অফিসে গেছেন জরুরী ডাকে। এ অবস্থায় স্মৃতিচারণ করা চলে।

সেই কাহিনী শুনতে শুনতে নতুন একটি মানসজগতের সন্ধান পেলাম। সে খোঁজ যারা যুদ্ধ করে, মরে আর মারে এবং যারা যুদ্ধে পাঠায় মরবার আর

মারবার জন্য—তারা কেউ পায় না। পাবার মত সময়, মন বা অনুভবশক্তি কোনটাই তাদের থাকে না। থাকলে তারা যুদ্ধ করতে বা যুদ্ধ ঘোষণা করতে গিয়েও থমকিয়ে যেত।

কিন্তু আমি তো সে সব সংক্রামণ থেকে বেশ দূরে নিরাপদ দূরত্বে নিজের মনকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পেরেছি। তিন চার বছর ধরে সারা ভারতের অন্তরীণ য়্যাকসিস ইণ্টার্নী অর্থাৎ জার্মান ইটালিয়ান জাপানী বন্দীশিবিরগুলি পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে তাদের বন্দীজীবনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় করেছি।

সেই জীবনের খুঁটিনাটি তদারক করাই তো শুধু নয়। ধরা পড়ার আগের ঘটনা, পলায়নের চেষ্টা, অচেনা আঘাটায় ধরা পড়ে আবার ক্যাম্পে ফিরে আসা—কত কিছুরই বেদনাভরা বৈচিত্র্য, রোমাঞ্চকর য়্যাডভেঞ্চার মানবতার আয়নায় প্রতিফলিত দেখেছি। আসাম বর্মা সীমান্তে মৃত্যুর পদধ্বনি আর অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার হিংস্রতা ও হাহাকার মর্মে অনুভব করেছি।

যুদ্ধ-সংক্রান্ত অনেক বিবরণ এখনো অলিখিত বা অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। তারাও আমায় দিয়েছে অনেক কল্পনা, অনেক তথ্য। কিন্তু সে সবই মেলে ধরেছে তথ্যের চেয়ে বড় একটি সত্য। তা হচ্ছে মানবতার দৃষ্টিতে দেখা মানুষের কথা। ব্যথা অসহায়তা আনন্দ আশ্বাসের কথা।

সেই সঙ্গে স্বপ্ন দেখেছি যে বীরোত্তম বাঙালী নেতাজীর প্রেরণায় ভীতু ও ভেতো নির্বীর্য ও নিরুপায় বাঙালীর যৌবন সামরিক জীবনে অমৃত রসায়নের স্বাদ গ্রহণ করবে।

সিনরা পুত্তির মানসকাহিনী শুনতে শুনতে মনে হল যে জীবনে একটি সার্থক কাজ করেছিলাম আমার 'রক্তরাগ' উপন্যাসের মধ্যে সেই বাঙালীকে সাহিত্যের সিংহাসনে অভিষেক করবার চেষ্টা করে। আমার সাহিত্যধর্মে এটিকে একটি সত্য জ্ঞান করেছি। এবারও তাই করেছি।

এই কাহিনী কিন্তু পুরোপুরিভাবেই উপন্যাস। এর চরিত্রগুলিও সবাই কাল্পনিক। যাঁরা ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন তাঁদের কথাতে অবশ্য এতটুকুও কল্পনা মেশানো হয়নি। ঘটনাগুলি, এমন কি খণ্ডযুদ্ধগুলি পর্যন্ত সত্য।

সাহিত্যের মন্থনে রূপান্তরিত সত্য।

দেবেশ দাশ

RASHTRAPATI BHAVAN,
NEW DELHI.

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬

শ্রীদেবেশ দাশ ইন্‌ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের একজন উচ্চ পদাধিকারী। নিজের উচ্চ পদের কর্তব্যগুলি পূর্ণভাবে করেও ইনি বাংলা সাহিত্যের রস গ্রহণ করেন ও তার সমৃদ্ধির জন্য সক্রিয় সহযোগিতা করেন এবং এইভাবে স্বনামধন্য বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী, রমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকদের ঐতিহ্য ইনি এই যুগে অব্যাহত রেখেছেন।

*   *   *   *

এই বই সামরিক পটভূমিকায় উপন্যাসের রূপে লেখা হয়েছে। সামরিক জীবন সর্বসাধারণের কাছে একরকম রহস্য হয়ে আছে। সেই জীবনের উপর এই বই আলোক-পাত করছে। আমি আশা করি যে এতে দেশ এবং বিশেষ করে আমাদের সৈনিকরা কিছু দিক্‌দর্শন পাবেন আর খাঁটি সৈনিকের আদর্শ তাঁদের সামনে প্রতিভাত হবে।

রাজেন্দ্র প্রসাদ

সেই সময়কার ভারতের সৈন্যবাহিনীর পরম অধিনায়ক ও রাষ্ট্রপতি মনীষী ৺রাজেন্দ্র প্রসাদের "রক্তরাগ" সম্বন্ধে এই অভিমত বর্তমান উপন্যাসটির প্রতি আরো নিবিড়-ভাবে, সার্থকরূপে প্রযোজ্য।

১

প্রেম ?

না, মৃত্যু ?

কোন্‌টা জীবনের চেয়ে বড় ?

অথবা স্বাতী ? যার মধ্যে প্রেম আর মৃত্যু দুই-ই স্বয়ম্ খুঁজে পেতে চেয়েছে।

দুটোর মধ্যে যে কোন একটাতে সে স্বাতীকে খুঁজে পাবেই।

অথবা কোনটার মধ্যেই নয় ? জীবন, জীবনের চেয়ে বড় কিছুই নয়। শুধু বেঁচে থাকা, এই মাটির পৃথিবীতে বেঁচে থাকা। এমন কি সব চেয়ে সামান্য, সব চেয়ে ছোট হয়ে বেঁচে থাকা। তার চেয়ে বড কথা আর কিছু আছে কি ?

জীবনই যদি না থাকল তবে থাকল কি ? হাসি, খেলা, ভালবাসা, ভোগ-বিলাস সবই তো সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যায়। জীবন হচ্ছে আধার। তার পাত্রে ধরে তবেই প্রেমকে করব আস্বাদ। মৃত্যুকে করব অবহেলা।

সংসারে সবই হচ্ছে রং। সুখের রঙীন রং অথবা দুঃখের কালো ছায়া কার উপর পড়বে জীবনই যদি ফুরিয়ে যায় ?

তাই জীবনই বুঝি সব চেয়ে বড়। শুধু বেঁচে থাকা। শুধু দেহ ধারণ করে থাকা সেটাই সব চেয়ে বড কথা।

অদেহী প্রেম ?

সে তো শুধু কবির কল্পনা। আকাশের নীলিমার মত দূর থেকে অধরা। তাই দেখতে সুন্দর।

এই তো দশ হাজার ফুট উপর দিয়ে সেই নীলিমার বুক চিরে স্বয়ম্ভু আর তার সৈন্যদলের ডি সি থ্রি প্লেন উড়ে চলেছে। কোথায় নীলাভ রং ? কোথায় তার মোহ অঞ্জন ? কিছু নেই। সব কিছু শূন্য। অলীক।

কিন্তু এই জীবন ?

যে জীবনকে স্বয়ম্ভু স্বাতীর একটুখানি কথার, একটুখানি হাসির ঝংকারে মরণের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। মরণাতীত হবে বলে।

তাই তো এই ভয়ে ভরা তারা-হারা রাতে জীবনের চেয়ে বড় কিছু নেই।

জীবনকে ব্যবহার করেই সেই জীবনের চেয়ে বড় কিছু পাবে স্বয়ম্ তারই সাধনা করছে।

স্বয়ম্ বার বার মন থেকে স্বাতীর স্মৃতি সরিয়ে দিতে ' ! করছে.

প্যারাসুট সম্বল করে উড়ন্ত প্লেন থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

সময় এগিয়ে এল। এবার মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হবার জন্য মরণ ঝাঁপ দিতে হবে।

সেজন্য তার কোন ভয় বা দ্বিধা নেই। ভারতীয় এমার্জেন্সী কমিশন অফিসার স্বয়মের চোখে প্যারাট্রুপ বাহিনী পদাতিক বা গোলন্দাজ বা বোমারু বাহিনীর চেয়ে অনেক অনেক বেশী নতুন, অনেক বেশী রোমাঞ্চকর, অ্যাডভেঞ্চারে ভরা। তাই সে এই ডিভিসনটাতে নিজে যেচে এসেছিল। অবশ্য মানসিক যোগ্যতা, হার্টের অবস্থা মাংসপেশী আর স্নায়ুর রিফ্লেকস অ্যাকশন ইত্যাদি পরীক্ষায় পার হতে হয়েছিল।

স্বাতী কয়েকমাস আগে একবার মৃদু হেসে ওকে বলেছিল—লিভ এ লিটল।

ও তখন তার কোন উত্তরও দেয়নি। শুধু মনে মনে শপথ করেছিল—এ লিটল নয়, এ লার্জ স্কাইস—প্রকাণ্ড বড়ভাবে বৃহৎ জীবন আস্বাদ করব।

পণ্ডিত নেহরু কয়েক বছর ধরেই তরুণদের উদ্দেশে বলছিলেন—লিভ ডেঞ্জারাসলি। বিপজ্জনকভাবে বাঁচো। সে কথা আর কেউ মনে রেখেছিল কিনা স্বয়ম্ জানে না। সে শুধু জানে যে স্বাতী বলেছিল—লিভ এ লিটল। সেইটুকুই তার কাছে বৃহতের সাধনার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল।

এই জন্যই সে শান্তভাবে যুদ্ধ বাহিনীর নানা শাখার দিকে নজর দিয়েছিল। কোথায় সব চেয়ে বেশী নূতনত্ব, মৌলিকতা, অ্যাডভেঞ্চার। আরাকান ফ্রণ্টে প্যারাট্রুপ বাহিনীকে কাজ ছাড়াই তাঁবুর দড়ির গিঁট গুণে গুণে দিন কাটাতে হচ্ছিল। তখন সে নিজে থেকে যেচে সাময়িকভাবে ভি ফোর্সে যোগ দিয়েছিল। সে বাহিনীর কাজে ছিল সব চেয়ে বেশী বিপদ। আর নিজের বুদ্ধি খরচ করে নিজের পরিকল্পনা অনুসারে ঘুরে বেড়াতে হত। সেই সুযোগ সে পুরোপুরি নিয়েছিল। আর এখন সে নিজের ইউনিটে ফিরে এসেছে আসল কাজের সময় এসে গেছে বলে। জাপানী যুদ্ধের এই অধ্যায়ে জেতা বা হারা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে প্যারাট্রুপ সৈন্যদলের ওপর।

আজ রাতেই আরাকানের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পঞ্চম ইণ্ডিয়ান ডিভিসনকে রাতারাতি সরিয়ে এনে জাপানী হামলার মাঝখানে নামিয়ে দেওয়া হবে। শুধু

সেনাদল স্বয়, তার রসদ, অস্ত্রশস্ত্র কামান। প্রায় মালবাহা খচ্চরের দল পর্যন্ত। সব কিছু নামানো হবে জাপানীদের আগুয়ান বাহিনীর ঠিক পিছনে। একটা নতুন সামরিক স্ট্র্যাটেজি এই প্রথম চালু করা হল এই বর্মা-আসাম সীমান্তে।

হঠাৎ একদিন ভোরবেলা প্রথম বসন্তের পাহাড়ী মাদকতায় ভরা আবহাওয়াতে জাপানীরা চিন্দুইন নদী বাঁশের ভেলায় চড়েই নির্বিবাদে পার হয়ে এসেছিল। তাদের দুর্বার বন্যাস্রোত ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় বিনা বাধায় এসে পৌঁছেছিল। পাহাড়ের পর পাহাড়ের চূড়া এই সীমান্তকে অগুণতি কেল্লার মত আড়াল করে রেখেছে। তবু তাদের ওপর দিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত এসে জাপানী সৈন্যদল ইম্ফল, উখরুল আর কোহিমার চারপাশ ঘেরাও করে ফেলল। সোমরা শৈলমালাব চূড়া থেকে ওরা আসামের সমতল ভূমিকে নজরবন্দী করে রাখল।

উঠতি সূর্য অর্থাৎ রাইজিং সান মার্কা জাপানী জাতীয় পতাকা ওরা ভারতের ভূমিতে পুঁতে দিল। ক্ষণে ক্ষণে রেডিয়োর অন্যান্য কর্মসূচী থামিয়ে জাপানী ঘোষক জানাচ্ছিল যে, দিল্লী দখলে এলো বলে। ভারত বিজয়ের উৎসবের জন্য টোকিয়ো শহর আলোয় আলোময়।

আর অন্ধকারেব আড়ালে নিজেদের গা ঢেকে স্বয়মের দল শত্রুসৈন্যে ঘেরাও এলাকার মাঝখানে নামতে যাচ্ছে। আকাশ পথে। আকাশ থেকে।

হালকা সাদা মেঘ পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে প্লেনগুলির চারপাশে জমা হচ্ছে। আবার সরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু সরে যাবার মধ্যেও প্রায় লেপ্টে থাকার ভাবটা থেকে যাচ্ছে। কলকাতায় চৌরঙ্গী পাড়ার সেই হোটেলের নাচঘরের যুগল নৃত্যের মত।

জীবনে সেই প্রথম স্বপ্নের মত একটা ইন্দ্রপুরীতে প্রবেশ। সঙ্গতি সাজ-পোশাক আর সামরিক আমেরিকান-মার্কা আবহাওয়া সব দিক দিয়েই এক রকম নিষিদ্ধ এলাকা ছিল সেই পুরী। যুদ্ধের কল্যাণে আউট অব বাউণ্ডস। স্বয়মের মত বাউণ্ডুলে বাঙালীর পক্ষে।

পাইলটের পাশে বসে স্বয়ম্। ডাকোটা বিমানের ড্যাশবোর্ডে হরেক রকম বোতাম টিপে টিপে পাইলট মাইকেল আলোর সঙ্কেত দেখে দিচ্ছে আর নেভাচ্ছে। মিটমিটি তারার মত আলোর ফোঁটা। যেন সেই চৌরঙ্গী পাড়ার রেস্তোরাঁর মধ্যে বাতি নেভানো রয়েছে। শুধু সামনের নাচের ব্যাণ্ড বাজিয়েদের

পিছনের দেওয়াল থেকে বিন্দু বিন্দু বিজলী আলোর সংকেত নাচঘরে এসে পড়ছে। নৃত্যমাতাল যুগলদের চোখের ভাষায় চকিত ইশারার সঙ্কেত।

না। স্বয়ম্ ওসব কথা এখন মনে করবে না, মনে আসতে দেবে না। কোলের উপর মাইক্রোফিল্ম করা ম্যাপটা পেতে ছোট্ট একটা লেন্স দিয়ে নামবার জায়গার ভূগোলটা আবার খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

এখন কোন পিছু টানের সময় নেই। জঙ্গী ট্রান্সপোর্ট প্লেন শুধু সামনের দিকেই এগিয়ে চলে। ঠিক জীবনের মত।

কিন্তু নীচু টান হঠাৎ এক হ্যাঁচকায় প্লেনটাকে অনেক নীচে নামিয়ে আনল। সহসা একটা অপ্রত্যাশিত এয়ার পকেটে পড়ে প্লেনটা এক নীচু টানে হাজার দুই ফুট বোধহয় নেমে এল। সোমরা হিলসের একটা চূড়া সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ জেগে দৈত্যের মত মাথা তুলে ওদের দিকে ছুটে এল। বেয়নেটের খোঁচা যেন নীচে থেকে ওপরে উঠে আসছে তেড়েফুঁড়ে। মাইকেল (বন্ধুদের কাছে সংক্ষেপে মাইক) ব্যাটল ফর ব্রিটেনে অংশ নেয়নি। কিন্তু বম্বস ওভার বার্লিনে হাত পাকিয়েছে। সেই অভিজ্ঞ পাইলট মাইকেলও একটা উল্লাসের আওয়াজ করে উঠল। ওদের অল্প কয়েক মাস আগে পরিচয়। তবু মুখ খুলে কথা বলার অবসর নেই।

সেই আওয়াজটা কানের মধ্যে ঢুকে মিঠে সুরের মত মনটাকে আনন্দে ভরে দিল কারণ সেই চূড়ার দৈত্যটাকে পাশ কাটিয়ে প্লেন কোনমতে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। তারপরই নীচে পাহাড়ের সানুদেশ। বাতাসের ঝাপটা কম। তাই প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দও কম। গতিবেগ কমিয়ে দিয়ে মাইক প্লেনটাকে একটু ধাতস্থ করছে মনে হল। যেন প্লেনটাও একটু শান্তিতে স্মৃতি রোমন্থন করতে চাইছে।

স্বয়ম্‌ও যেন এক ঝাপটায় কুলায় প্রত্যাশী পাখীর মত কোথায় কোন্ স্মৃতির মধ্যে নেমে এল।

স্বাতী। স্বাতী নক্ষত্র আকাশে, অনেক দূরে। ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু তার মনের আকাশের স্বাতী এই মুহূর্তে অনেক কাছে। আকাশের কোন্ এয়ার পকেট কবে কোথায় মনের মণিকোঠায় এমন করে টেনে আনে? ··

সেই রেস্তোরাঁটা।

নীরব নয়, কিন্তু নিবিড়। জনতাকে যারা উপেক্ষা করতে জানে তাদের কাছে সব জায়গাই নির্জন।

কিন্তু স্বয়ম্ চাকরির সন্ধানে টহলদার পদাতিক মাত্র। তার উপরও যে হাওয়াই হামলা হবে তা সে কবে ভেবেছিল? চাঁদনীর শার্ট কোট আর ট্রাউজার্সের ইউনিফর্ম, থুড়ি, ব্যাটল ড্রেস পরা পদাতিক সে। ডালহাউসী পাড়ার নো-ম্যানস ল্যাণ্ডে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সে চাকরির খোঁজ করে এবং সে স্থির করে রেখেছে যে বলতে পারার মত একটা প্রাইজ চাকরি যোগাড় করতে পারার আগে সে মামার কাছে কিছুই রিপোর্ট করবে না।

তবু সে সেদিন সন্ধ্যার দিকে ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে মামার অফিসের দিকেই যাচ্ছিল। তারপর একবার বন্ধুদের সন্ধানে যাবে। এমন সময় হবি তো হ সে নিজেই কব্জা হয়ে গেল।

এবং এক অত্যন্ত স্মার্ট আর অগ্রসর তরুণীর হাতে।

তারই প্রতিবেশিনী।

স্বয়ম্ অবশ্য শুনেছিল যে স্বাতী বিলেত থেকে সদ্য ফিরেছে। হাওয়াই হামলার ঠ্যালায় পাশের বাড়ির বোমারু বিমান, মানে এই মেয়েটি, একেবারে সাত সমুদ্র পার হয়ে সোজা নিজের দেশে।

ঝকঝকে বেবী অস্টিন কারের দরজা খুলে সেই বোমারু তার স্থলপথের বিমানে উঠে আসার জন্য স্বয়ম্‌কে আহ্বান করল। হুকুম করতে অভ্যস্ত নিশ্চয়ই। তাই কথা শুনবে কিনা তা না ভেবেই হুকুম চালাল। ইঞ্জিনটা বন্ধ পর্যন্ত করল না।

বেশ কয়েক বছর পরে দেখা। তার জন্য কোন সংকোচ নেই। শুধু প্রতিবেশী হিসাবে সামান্য পুরনো পরিচয়টা কোন বাধা নয় ওর কাছে। ব্যবহার যদিও সিভিল, মনটা মিলিটারী। যুদ্ধের আঁচ পেয়েছে তো!

স্বয়ম্ অবশ্য জানে যে পুরনো বালিগঞ্জের এই প্রতিবেশীরা আর ওরা শুধু নামেই প্রতিবেশী। কিন্তু আচার-বিচারে চালচলনে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। স্বাতীরা হাল-ফ্যাশানের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের একেবারে সামনের দিকে। উপরের দিকে স্বয়ম্‌রা ইঙ্গের চেয়ে বঙ্গ অনেক বেশী। সাবেকী আমলের বড় অ্যাটর্নী অফিসের নতুন পার্টনার ও বড় সাহেব হয়েছেন মামা। অফিসের পুরনো আর নিজের নতুন ইজ্জত বাড়াবার জন্যই সাহেব পাড়ায় উঠে এসেছেন।

স্বয়ম্ ইতস্তত করতে লাগল। মরি ভয়ে ভয়ে—যাব কি যাব না। অথচ মুখ ফুটে হ্যাঁ কি না কিছুই বলতে পারছে না।

ইতিমধ্যে হাইকোর্ট পাড়ার মক্কেল আর মামলাবাজরা একটু রসের সন্ধান পেয়ে গেল। নিশ্চয়ই এই দুজনের মধ্যে কিছু একটা আছে। না হলে কি আর হিটলারের 'ভি' রকেট মার্কা একটা মেয়ে এখানে হাজির হয়?

দেশী কলকাতাটা একেবারে পুরুষের শহর। ফুড সাপ্লাই দপ্তরের কল্যাণে সবে মেয়েরা অফিসে আসতে শুরু করেছে। তবু কোর্টপাড়া রক্ষণশীল।

স্বাতী হাত এগিয়ে দিল, কাম অন ইন—ডোণ্ট বি সিলি।

স্বয়ম্ গলার টাইটা আগেই খুলে নিয়েছিল ভাগ্যিস। না হলে গলা কাঠ হয়ে বন্ধ হয়ে যেত।

বালিগঞ্জের বাড়িতে উঠে আসার পর প্রথম প্রভাতে যে কিশোরীকে সে ভোরের আলোয় দেখেছিল তার কথা স্বয়ম্ ভোলেনি কখনো। কিন্তু এখন মনকে নাড়া দিয়ে সেকথা স্মরণে এল।

শুধু দূর থেকে প্রথম দেখা। অপরিচয়ের দেখা।

একটা উপমা মনে এসেছিল। যেন দার্জিলিং-এ কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর প্রথম অরুণোদয়ের রংয়ের খেলা দেখছে ম্যাকেঞ্জি রোডের হোটেলের নিজের নিভৃত জানলা থেকে। একান্তভাবে তার নিজস্ব নিরালায় দেখা।

মাই গড, সেই ভোরের আলোয় একটা পাখী উড়ে যাচ্ছিল মেয়েটির বারান্দার উপর দিয়ে। খুব কাছ দিয়ে। সেই পাখীর দুটো উড়ন্ত ডানার ছায়া সেই কিশোরীর মুখের ওপর মায়া বুলিয়ে গিয়েছিল। একটা মিষ্টি ডাক দিয়ে ওরই বাগানের ঝোপে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

সেই কিশোরী। সে অকারণে একটু নিজের মনেই হেসে ঘরে ফিরে গিয়েছিল।

আর স্বয়ম্ প্রায় বলে উঠেছিল—যেয়ো না, যেয়ো না। আর একটু দাঁড়াও। আর একটুখানি দেখি।

সেই কিশোরী আজকের যুদ্ধের বিলেত-ফেরৎ তরুণী হয়ে এই মুগ্ধ প্রাণকে নিজে থেকে আহ্বান করেছে।

একটি কথাও না বলে স্বয়ম্ মোটরে উঠে এসে পাশে বসল।

সে এখন এই প্লেনের ককপিটের খোঁদলে উবু হয়ে মুর্গীর মত বসে আছে। সেই বেবী অস্টিন মোটরের বালতি মার্কা অর্থাৎ 'বাকেট সীটে' বসার কথা এখন খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ল। ককপিটের মধ্যে কথাবার্তা এমন কি সংকেত

বিনিময়ও প্রায় নীরবে চালাতে হয়। শত্রুরা যদি 'মনিটর' করে ফাঁস করবার চেষ্টা করে? সেইজন্যেই তো সেখানে নেই আলো, নেই ভাষা।

মোটরে পাশাপাশি বসে স্বয়মেরও সেই অবস্থা। চারধারে প্রায় অন্ধকার। নিজের মুখে নেই ভাষা। ব্ল্যাক আউটের আকাশে সুদূরের তারাগুলি কি কথা কয়ে উঠতে চাইছে?

তারার আলোর টুকরোগুলো যেন স্টার ডাস্ট রেস্তোরাঁর মিটিমিটি আলো। ছাদ থেকে ফুটো করে কয়েকটা আলোর বিন্দু সাজানো রয়েছে। ওইটুকুতেই কাজ চলবে। আঁধারে আঁধার হলেই তো হিয়ায় হিয়ে হবে একাকার।

২

রেস্তোরাঁটা নতুন। বলতে গেলে প্রধানত বিদেশী, বিশেষ করে বিদেশী মিলিটারীদের কল্যাণেই সরগরম। সাধারণ বেসামরিক বা মধ্যবিত্ত লোক এখানে কলকে অর্থাৎ চেয়ার পাবে না। অর্থাৎ ঢুকতেই পাবে না। এসব ঝকঝকে চেয়ার টেবিলে ঠাঁই পেতে হলে চাই সর্বাঙ্গ থেকে যেন পিছলিয়ে পড়া পালিশ। এ রেস্তোরাঁর জন্য চাই শুধু রেস্ত নয়, রাশভারী মর্যাদা আর রসে ভরা মন।

উঁচু তলার স্বাতী অনায়াস রসে আর পালিশে অবলীলাক্রমে পিছলিয়ে এগিয়ে গেল। স্বয়ম্‌কে নিয়ে ডবল ঘুরপাক খাওয়া কাঁচের দরজা পার হয়ে এসে ঢুকল। সাদা বকের পালকের মত ধবধবে দস্তানা পরা একটা হাত এমনভাবে দরজা খুলে ধরল যেন কোন রাজরানীর আবির্ভাব হয়েছে।

এ যুগের রাজরানীরা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু এই রকম নতুন ইন্দ্রাণীদের জৌলুষ তাদের চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। স্বয়ম্ মনে মনে ছবি এঁকে নিল—আধুনিকা অ্যাট হার বেস্ট।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যে, নিজের পোশাক আর চালচলন এই জায়গা আর এই সঙ্গিনীর সঙ্গে বড়ই বেমানান। কিন্তু সে যা তাই থাকতে চায়। তাতেই তার সম্মান, তার ব্যক্তিত্ব বজায় থাকবে। নাই বা থাকল তার ময়ূরপুচ্ছ। সে তো দাঁড়কাক নয়। সে রাজহংস। তার মরাল কণ্ঠ নেই, কিন্তু মরাল দৃষ্টি আছে। আকাশে এত দূরে তার কল্পনা আর দৃষ্টি যায় যেখানে হাই সোসাইটির চন্দ্র-সূর্যরা হয়তো পৌছতে পারবে না। তার চাল-চলন চরিত্র আর আচরণ থাকুক রাজহংসের মতই শুভ্র, স্বচ্ছন্দ।

রাজহংসের মতই সে ঘাড় উঁচু করে স্বাতীকে আবার দেখল। বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে। সে চেয়ারটা টেনে স্বাতীকে বসবার জন্য আহ্বান করতে ভুলে গেল।

স্বাতীর দৃষ্টি শূন্য চেয়ারের দিকে পড়তেই সে নিজের ভদ্রতার ত্রুটির কথা বুঝতে পারল। তাড়াতাড়ি হাসিমুখে চেয়ারটা টেনে সঙ্গিনীকে বসবার জন্য অভ্যর্থনা জানাল।

সঙ্গিনীর প্রসন্ন দৃষ্টিটুকু সে পুরস্কার হিসাবে নিল। ধন্যবাদ তো মামুলী বাঁধা বুলি। তার হিসাব না রাখলেও চলে।

বেয়ারা এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াতেই স্বাতী চট করে অভ্যস্তভাবে বলল, ছুটো শেরী, প্লিজ। আমারটা ড্রাই। আর তোমারটা কি হবে, স্বয়ম্ ?

কোন বিব্রত ভাব বা বিস্ময় না দেখিয়ে স্বয়ম্ বলল, আমার জন্য শুধু কফি। হট কফি, প্লিজ।

স্বাতী ডান চোখের ভুরু একটু উপরের দিকে তুলতে আরম্ভ করেও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, অ্যাণ্ড টু হট ডগ্‌স্, প্লিজ।

জিজ্ঞেস করবে না কি ? অথচ সংকোচও হয়। বস্তুটা নিশ্চয়ই কোন খাবারের নাম। বইয়ে এ নাম কোথাও দেখেনি। হালের ইংরেজী ম্যাগাজিনেও নয়। নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ মাংস নয়। গরম কুত্তার মাংসে তৈরী অবশ্যই নয়। তার প্রতিবেশিনীর উপর এটুকু আস্থা না রাখা মানে তার অসম্মান করা।

ফরাসীরা ব্যাঙ খায়। জাপানীরা খায় সাপ। চীনেরা আরশোলা। ওদের কাছে এগুলি নাকি সুখাদ্য। আবার অভিজাত খাদ্যও। প্রত্যেক জাতই কিন্তু নিজেদের অনভ্যস্ত খাদ্যকে অখাদ্য মনে করে। কাজেই চিন্তাটা সে মন থেকে সরিয়ে নিল।

আর স্বাতী তো সদ্য বিলেত ফেরৎ। তায় মার্কিন-মার্কা অনেকখানি। কলকাতাতে ওকে কেমন বেমানান মনে হয়। ও যেন বিংশ শতাব্দীর স্ত্রী-স্বাধীনতার সোনালী আলোয় ঝলমল রূপোলী সুপার ফরট্রেস এরোপ্লেন। একগাদা গরুর গাড়ি ভরা গেঁয়ো তেপান্তরে ফোর্স ল্যাণ্ডিং করে দায়ে পড়ে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে।

একবার স্বয়মের মনে হল—পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শুধরে নিল—এ তো যবন নয়। আর্য অথচ যবনী। আয়োনিয়ান অর্থাৎ গ্রীক রূপসীদের সংস্কৃতে বলা হত যবনী। আর্যের সেরা আর্য, সুন্দরী তনুমধ্যা আধুনিকা। সুবাসিত পশ্চিম পবনের ব্যাকুল নিঃশ্বাস ভেসে আসছে তার কাছ থেকে।

চকিতে ডি. এল্. রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকের কথা মনে হল। যবনী হেলেন রাজকন্যা। চন্দ্রগুপ্ত যবনের শিবিরে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। শেষে গুরুর বিদ্যাতেই গ্রীকদের হারিয়ে গ্রীক সম্রাটের কন্যা হেলেনকে

লাভ করেছিলেন তিনি। বাহুবলে সাম্রাজ্য আর সম্রাজ্ঞী দুই-ই জয় করেছিলেন।

মনে মনে স্বয়ম্ চঞ্চল হয়ে উঠল।

ততক্ষণে স্বাতীর সামনে বসানো হয়েছে একটা লম্বা ডাঁটির উপরে জেগে থাকা টিউলিপ ফুলের মত দেখতে ছোট গ্লাসে শেরী। আর নিজের সামনে মাঝারী সাইজের কালো ধাতু আর কাঁচের গোলা দিয়ে তৈরী কফি পারকোলেটার। নীচের কাঁচের পাত্রে উপরের গোলা থেকে বিন্দু বিন্দু নেমে আসছে কফি।

মনের পাত্রেও বিন্দু বিন্দু ঝরছে একটা গাঢ় অনুভূতি। তার স্বাদ বিচিত্র। সৌরভ মনোহর। সুধায় ভরে দিচ্ছে সমস্ত চৈতন্যটাকে। আর দেহে জাগিয়ে তুলছে কদম্বকেশরের রাঙা আবেশ।

খানিকক্ষণ পর সিগারেটের ধোঁয়ায় স্বাতীর রাঙানো ঠোঁট দুটির বানানো সার্কল অর্থাৎ বৃত্ত থেকে নতুন নতুন শিকলি উপরে উঠতে লাগল। মৃদু সুবাসে স্বয়ম্ আচ্ছন্ন বোধ করল। স্বাতীর সামনে শেরী আর স্বয়মের কফি যেন কোন্ মায়াজালে অর্থহীন হয়ে গেল। সার্থক শুধু স্বয়মের অনুভূতি।

কফির পেয়ালাটার দিকে একটু তাচ্ছিল্য হয়তো বা অনুকম্পার চাহনি হেনে স্বাতী বলল, ছো, স্বয়ম্, তুমি সেই টিপিক্যাল বাঙালীই থেকে যাবে?

স্বয়ম্ বিচলিত হয়ে খালি গলাটাতে হাত বোলাতে লাগল। প্রশ্নটা যেন কোন অজানা বেদনায় বরফের মত নীল ধোঁয়ার মায়াজালের ওপার থেকে ওর কাছে ভেসে এসেছে।

স্বাতী সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, এই ধর না কেন, গলায় টাইবিহীন কলারাটা যেন বাঙালী ঘরের বিধবা।

আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে স্বয়ম্ কলারটা সোজা করতে করতে বলল, বুঝলাম না।

যেন কলা দেখাবে এমনভাবে আঙুল নাচিয়ে স্বাতী বলল, বুঝেছ খুব ভাল করেই। বনেদী ঘর, সাবেকী চাল, পুরনো ঠাঁট সব কিছু মিলিয়ে একটা অসহ্য মিইয়ে যাওয়া জীবন। বাদলায় ছাতাপড়া গোছের আর কি। দি ক্লাইম্যাক্স অব ডালনেস।

স্বয়ম্ ওর সুন্দর ভ্রূভঙ্গির দিকে তাকিয়ে শুধু একটু হাসল। পাঁচ বছর বিলেতে থাকার পরও যে চোস্ত বাংলায় চোখা আক্রমণ করছে আর বাক্যবাণের মুখে একটু ইংরেজীর ফুলঝুরি ছিটিয়ে দিচ্ছে হাসি ছাড়া আর কিছু দিয়েই তার ধাক্কা সামলানো যায় না।

স্বয়ম্‌কে হাসতে দেখে ও আরো অসহ্য বোধ করল। হাতের গ্লাসটা স্বয়মের দিকে হেলিয়ে বলল, লুক অ্যাট ইউ। আই মিন লুক অ্যাট ইউ। একজন টিপিক্যাল বেঙ্গলী ইয়ুথ। মায় তোমার পায়ের মোজা পর্যন্ত। রাইট ডাউন টু ইয়োর সক্‌স্‌।

ইংরেজীর তোড়ে ভেসে যাওয়া বেড়ালের মত স্বয়ম্‌ এবার নিজের মোজার দিকে তাকাল। মোজা দুটোতে অনেক ফুটো হয়ে গেছে। কিন্তু বাইরে থেকে তো দেখা যায় না। তবে ?

বরং তার মনে হল যে মামার মক্কেলেরা পা থেকে নীচে নেমে-আসা মোজা আর গলায় লেপ্টানো বিধবা কলারের উপরই ভরসা করে ভারী ভারী মামলাগুলো হাতে তুলে দিয়ে যায়। মনে হল যে মামা তার জুনিয়ারদের একদিন বোঝাচ্ছিলেন যে, বেশী স্মার্ট বা ফ্যাশনদুরস্ত হলেই মক্কেলরা মনে করতে পারে যে, নতুন য়্যাটর্নীর কোর্টের চেয়ে কোর্টশিপের দিকেই নজর বেশী। তার মানে এই যে প্রফেশনে এখনো তেমন পাকাপোক্ত হয়নি।

কিন্তু সে কথাটা কোন সদ্যপরিচিতা প্রতিবেশিনীকে এখনি বলতে কেমন যেন লাগে।

সেই তরুণীকে যার নাম ছিল স্বাতী, কিন্তু সাহেবী কায়দায় হয়ে গেছে সুইটি।

তবু নিজের কোট বজায় রেখে স্বয়ম্‌ বলল, হ্যাঁ। আমার তো টিপিক্যাল বেঙ্গলী ইয়ুথ হবারই কথা। জীবনে আমি যা, চেহারায় তাই তো মালুম হওয়া উচিত ?

স্বাতী একথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না। মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়ার শিকলি একটার পর একটা তৈরী করতে লাগল।

ওর সুন্দর রাঙানো ঠোঁটের বঙ্কিম ভঙ্গিমা দেখে স্বয়মের কৃত্তিবাসের রামায়ণের বর্ণনা মনে পড়ল—কামের কার্মুক যেন এক একখান।

কার্মুক মানে ধনুক।

স্বয়ম্‌ ভাবতে লাগল—স্কুলে পণ্ডিত মশায় যখন কথার মানে বুঝিয়ে দিতেন তখন তার মধ্যে যে এত রস আছে তা তো বুঝতে পারিনি।

শেষ পর্যন্ত স্বাতী বলল, ইয়েস ডিয়ার, ইউ আর টু-উ অনেস্ট উইথ ইয়োরসেলফ। কিন্তু এখনো তোমার উদ্ধারের আশা আছে। তোমার হিতৈষী প্রতিবেশী বলেই বলছি—বয়েস বেড়ে গেলে তুমি সেই পুরনো 'রাট'-এ সেঁটে বসে যাবে। তার চেয়ে এইবেলা কিছু একটা করে ফেল।

স্বয়ম্‌কে অবাক হয়ে ওর ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে স্বাতী ঠাট্টায় ঠোঁট দুটি উদ্ভাসিত করে তুলল, এই ধর, তোমার মামার কোন শাঁসালো মক্কেলের টাকা মেরে উধাও হয়ে যাও। হাওয়াই দ্বীপে পাড়ি দাও। লড়াই সত্ত্বেও সেখানে হুলা হুলা ডান্স এখনো ওরা চালিয়ে যাচ্ছে। না হয় অন্তত কোন প্ল্যাটিনাম ব্লণ্ডকে নিয়ে লোপাট হয়ে যাও।

স্বাতী স্বয়মের কনুই ধরে একটু আলতোভাবে টিপে দিল। ফিস ফিস করে যেন কত গোপন একটা কথা জানিয়ে দিল—লিভ এ লিটল। একটুখানি বাঁচো।

একটুখানি মরমে মরে সে সাড়া দিল, সত্যি স্বাতী। বিলেতে গেলে এ রকম হয় কিনা জানি না। কিন্তু বাঁচার সম্বন্ধে তোমার ধারণাগুলো বড় আজব।

স্বাতী আরো নিবিড় হয়ে এসে বলল, আজব নয়, মাই গুড বাট লোনলি স্লেবার। আজব নয়, সজীব। একসাইটিং। তোমরা হচ্ছ সেই দু-তিন শো বছর আগেকার ঘুমিয়ে পড়া ঘুনে-ধরা বাঙালী বাঁশফুল। কিন্তু তোমাদের সেই তারাও বেঁচে থাকত। যা তোমরা নেই।

—যথা ?

—ফর ইনসটানস—যথা তোমার এনেমিক ধমনীর ক্ষীণ রক্তে কোন সাড়া জাগবে না যদি কেউ বলে,—

অর্কেস্ট্রার বাজনা ছাপিয়ে ওর মাজা-ঘষা 'হাস্কি' গলায় ও বলে চলল, যদি কেউ বলে যে, নারী হচ্ছে ভালবাসার জন্য, সুরা সুধার মত পান করার জন্য, যুদ্ধ বেঁচে থাকবার জন্য, আর ইজ্জত মরণ দিয়ে রক্ষা করবার জন্য। কই, এর মধ্যে কোন্‌টা তুমি করেছ, বল ? কোন্‌টা ?

স্বাতীর কথার স্রোতে স্বয়ম্‌ ভেসে যেতে লাগল। অসহায় খড়কুটোর মত। সে তো জানত না যে কথার মধ্যে এত সুধা। সুধার মধ্যে এত সুরা। সুরার মধ্যে এত ঝাঁজ।

সে উঠে পড়ার জন্য উসখুস করতে লাগল।

পরাজিতের পথ পলায়ন।

স্বাতী হেসে বলল, কি ? খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ ? আমার কথার ঝাপটার ঝড়ে ? কিন্তু কি করি বল ? বিলেত থেকে ফিরে দেখি যে পুরনো বন্ধুদের আর আমার মধ্যে তৈরী হয়ে গেছে একটা দুস্তর ইংলিশ চ্যানেল।

তারপর আগ্রহ করে বলল, এস না একদিন আমাদের বাড়ি সন্ধ্যেবেলা। ইংলিশ চ্যানেলটা পার হয়ে। প্ল্যাটিনাম ব্লণ্ড তোমাকে দেব।

আশ্চর্য হয়ে ওর বব-করা তেল-ছাড়া ঘোড়া রংয়ের চুলের দিকে তাকাতে দেখে স্বাতী হেসে ফেলল।

বলল, ভড়কে গেলে দেখছি প্ল্যাটিনাম ব্লণ্ডের নাম শুনেই। ভয় নেই। তোমায় কিডন্যাপ করে 'হাওয়াই'তে সে নিয়ে যাবে না। ক্লান্ত সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে ছ আনা কয়ঁন্ত্রো, ছ আনা রাম আর চার আনা ক্রিম মেশানো একটা নতুন পানীয় তুমি খাবে। একটু চিনিও মেশানো থাকবে। আর উপরে ভাসবে একটা টুকটুকে চেরী। 'সিপ' করতে করতে তুমি খুশী হয়ে হাসবে। জীবনটাকে আর বোঝা মনে হবে না। এই হচ্ছে প্ল্যাটিনাম ব্লণ্ড।

ডাকোটা বিমানের মাফল-করা অর্থাৎ যেন কম্বল চাপা ইঞ্জিন দুটো মনে হল গেয়ে উঠছে—প্ল্যাটিনাম ব্লণ্ড। প্ল্যাটিনাম ব্লণ্ড।

৩

প্ল্যাটিনাম ব্লণ্ড।

প্ল্যা-টি-না-ম ব্ল-ন-ড। নামটার মিষ্টি রেশ অনেকক্ষণ ধরে স্বয়মের মনে ধ্বনিত হয়েছিল।

ওই পানীয় বস্তুটি কেমন স্বাদের হবে, তার প্রতিফলই বা কি সে সম্বন্ধে ভাববার কথাই মনে হয়নি সেদিন। শুধু সুরেলা রেশটুকুই সমস্ত অন্তরাত্মা ভরে রেখেছিল।

আজ রাতের এই নিশীথ অভিসারের ডাকিনী ডাকোটার ইঞ্জিনের মৃদু গর্জনকে মনে হচ্ছে মধু গুঞ্জরণ।

হঠাৎ এয়ার পকেটের টানে অনেক প্লেন শোঁ শোঁ করে এক নিমেষে নেমে আসে। যাত্রী আর মালসুদ্ধ আসাম-বর্মা সীমান্তের আকাশে উড়তে উড়তে শেষ হয়ে যায়। আজ এদের প্লেনের সেই একই গতি হতে পারত। অবশ্য মাইক বিশেষ হুঁশিয়ার পাইলট। আর বেশ কয়েক হাজার ফুট উঁচু দিয়ে যাচ্ছিল বলে সামলে নিয়েছে।

সামলাতে যদি না পারত তাহলে নীচে হুমড়ি খেয়ে পড়বার আগেই হৃদযন্ত্রটা বিকল হয়ে যেত অথবা প্লেনে আগুন ধরা আর চুরমার হবার পরে দেহটা দাহ হয়ে যেত। সে খবর কেউ রাখতে আসত না।

স্বাতীর স্কুল অব ইকনমিকসের সহপাঠী বন্ধু মাইক আর কলকাতার প্রতিবেশী স্বয়ম্ দুজনেরই নাম থাকত নিখোঁজ, সম্ভবত মৃত, এই তালিকায়।

যুদ্ধ তো যুদ্ধই। এবং মৃতরা কথা কয় না।

তবু একটি যুদ্ধে সে জয়ী হবার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছিল। সেদিনের সেই আহ্বান, লিভ এ লিটল, ওকে টেনে এনেছে অজানা পথে অশান্ত অ্যাডভেঞ্চারে। পিছনের দিকে সে তাকায়নি।

যে স্বাতীকে সে পিছনে রেখে এসেছে তাকে কোন বাঁধনে জড়িয়ে প্রতীক্ষা করে থাকতে পর্যন্ত বলে আসেনি।

এরোপ্লেনটা সামলে নিয়েছে। পিছনে প্যারাসুট বাঁধা প্যারাট্রুপের দল

এবং পাশে বসা বহু অভিযানের বন্ধু মাইক পর্যন্ত জানে যে সব কিছুই সামলে গিয়েছে।

শুধু স্মৃতির এয়ার পকেট এখনো স্বয়ম্‌কে পিছনের দিকে হু-হু করে টেনে নিয়ে চলেছে। ঘূর্ণির দুরন্ত টানে।

প্লেনের ককপিটটা যেন কোন মায়াবীর পরশকাঠের ছোঁয়ায় আরেকটা কামরা হয়ে গেছে।

* * * *

সেদিনও বাইরে এমনি অন্ধকার ছিল। রাতের নয়, ব্ল্যাক আউটের। আর সেটাই শেষ দেখা। বিদায় বেলার দেখা।

কামরার সব দরজা জানলা ঘন পর্দায় ঢাকা। বাইরে যেন কোন আলোর রেখা বেরিয়ে না আসে। কিন্তু বেরিয়ে আসছিল পিয়ানোর রেশ। কার, কোন্ মুখর মূর্তির মূক বাণী মেলডি হয়ে সুরের স্রোত বইয়ে দিচ্ছিল তা স্বয়ম্ জানত;

তাই কোন আওয়াজ না করে এমন কি দরজায় টুক টুক করে জানান না দিয়েই সে ঘরে ঢুকে চুপ করে বসে রইল।

সুরটা চিনে নিতে তার ভুল হয়নি। স্বাতীরই দেওয়া কয়েকটি ইয়োরোপীয় ক্ল্যাসিক্যাল রেকর্ডের মধ্যে একটি ছিল বীঠোফেনের মুনলাইট সোনাটা। অন্য রেকর্ডগুলি সে ফেরত দিতে পেরেছিল। কিন্তু এটি স্বাতী ফিরিয়ে নিতে রাজী হয়নি।

সংস্কৃত পণ্ডিতের ছেলে শুনবে প্রতি রাতে সামগানের বদলে সোনাটা।

তার মধ্যে স্বাতী কি শোনাতে চায় তা স্বয়ম্ জানত।

এই জ্যোৎস্না সঙ্গীতের অনুরণন আকাশ ছুঁয়ে যায়, মেঘলোক ছাপিয়ে যায়। প্রেমের গহন বন আর আকুতির স্রোত সৃষ্টি করে যায়। ছন্দে ছন্দে আত্মার সংবেদন উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পরিক্রমা করে আসে।

কিন্তু বেছে বেছে মুনলাইট সোনাটা কেন? এটা যে পরম বেদনার সঙ্গীত।

কাল ভোরে স্বয়মের প্রভাত আর শান্ত বেসামরিক জগতের প্রভাত হিসাবে তার কাছে আসবে না। তাই কি এই বাজনা স্বাতী বাজাচ্ছে?

স্তব্ধ হয়ে নিঃশব্দে সে শুনছিল।

স্বাতীর কাছেই এই সঙ্গীতের রহস্য আর মর্মবাণী সে জেনেছিল।

প্রথম অংশ যেন আত্মার প্রশান্তির রূপ, তার মৃদুমন্দ পদধ্বনি। মাঝখানে

করুণ অন্তরের আবেদন, আত্মার প্রার্থনা শোনাতে শোনাতে স্বর্গে পাখা মেলে ওড়া। শেষ অংশ সুরের বন্যাস্রোত। মূর্ছনার পর মূর্ছনা যেন সাগরতরঙ্গের মত মনের উপর আছড়ে পড়ে।

আরো কয়েকবার স্বাতী তাকে এই মুনলাইট সোনাটা বাজিয়ে শুনিয়েছিল।

মনে পড়ল, প্রথমবার শুনে স্বয়ম্ এই মহান সঙ্গীতের মর্মকথা বুঝবার জন্য গোপনে অর্থাৎ স্বাতীকে না জানিয়ে ইউরোপীয় সঙ্গীতের বই পড়ে নিয়েছিল। আর সেই সঙ্গে কিছু জার্মান কথা মুখস্থ করে ছিল।

মনে পড়ল : প্রথম প্রণয়ভীরু স্বরে বীঠোফেনের ব্যবহার করা কয়েকটি জার্মান কথা সে স্বাতীকে শুনিয়ে দিয়েছিল—আইন লীবেস, ৎসাউবারিশচেস মাডচেন। একটি প্রিয়া, একটি মায়াবিনী মেয়ে।

স্বাতী ভ্রূভঙ্গিতে বিশ্বের রাগ তুলে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি হচ্ছ বঙ্গ। আমি অনেকটা ইঙ্গ। কিন্তু তুমি জার্মান ভাষার আড়াল দিয়ে আমায় কি বললে তার মানে আমি জানি না মনে করেছ ?

স্বয়ম্ অত্যন্ত নিরীহভাবে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করেছিল যে এই মেয়েটি কি শুধু শুধুই তমসা তীর্থে এত বছর শকুন্তলার মত কাটিয়ে এসেছে ?

শুনে স্বাতী আরো ক্ষেপে গেল।

বলেছিল, তোমাদের বাংলাদেশে সোজাসুজি য়্যাডমায়ার করবার হিম্মতও দেখি গজায় না। ফ্লার্ট করার তো মুরোদই নেই কারো।

হাত জোড় করে প্রায় পদ্মকলির মত একটা মুদ্রা করে ছিল স্বয়ম্। নিবেদন করেছিল স্বপনচারিণী মানসী হয়ে উঠতে পারে এমন কোন মেয়ে কখনো আমাদের বাংলাদেশে বলে না—পুরুষ হও, আকাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠো। আয়নায় তাকিয়ে যাচাই করে নাও তুমি কি সত্যি সত্যি প্রেমের চোখে আকর্ষণীয়। আমরা যে রোগা-পটকা বরবটি হলেও বর সাজবার সুযোগ পেয়ে থাকি।

—অর্থাৎ আবার তোমরা মেয়েদের ঘাড়েই দোষ চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছ।

—কি করব বল ? আমাদের বাথরুমের বীঠোফেনরা এমন কোন প্রেয়সী জুলিয়েট্টাকে পায় না যে তাদের সব বিষাদ ও মানুষের প্রতি বিদ্বেষ দূর করে দিতে চেষ্টা করবে। যে বেকারী আর দারিদ্র্যের বিভীষিকার উপরে তুলে তাদের অন্য জগতের সন্ধান দেবে।

—তবে সবাই যে বলে, তোমাদের দেশে সবাই প্রেমে পড়ে, সেটা সত্য কি?

—শোন মন দিয়ে। মেনে নিতে না পার ক্ষতি নেই। আমার নিজের পেয়ালাটি ছোট। কিন্তু আমি অন্যদের সুরা পান করে থাকি।

—আঃ, তুমি একেবারে একটা হেঁয়ালী। সোজা সরলভাবে কিছু বলতে পার না।

—কি করে পারব বল? রিসার্চের দোহাই দিয়ে আমি না হয় মামার দৌলতে এতদিন মোটামুটি ভালভাবে কাটিয়েছি। কিন্তু আমাদের সমবয়সী আর সমসাময়িকরা? যুদ্ধের কল্যাণে আর সবাই করে খাচ্ছে। কিন্তু ওরা হয়ে গেল রকবাজ—প্রায়ই অকাজের। নিজেদের মন নেই, উদ্দেশ্য নেই। কোন কাজ জোর করে ধরে নিতে ভয় পায়। নিজেদের মুখোমুখি একলা হতে সাহস নেই। এমন কি বাড়ি ফিরে যেতে ভরসা পায় না। ঘেন্না করে এভাবে জীবন কাটাতে অথচ কাটাতে বাধ্য হয়।

একটু পরে সে আবার বলল, আমিও সেই জেনারেশনের একজন। তুমি আমায় সেই চৌহদ্দি থেকে তুলে এনে শোনালে কি না মুনলাইট সোনাটা।

দৃঢ়ভাবে বাধা দিয়ে স্বাতী বলেছিল, না, তুমি তাদের একজন নও। আমি অনেক দিন তোমায় দূর থেকে দেখেছি। এবং আশা করি বুঝেছি। তা না হলে সেদিন হুট করে তোমায় মোটরে তুলে নিতাম না। একা রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতাম না। বাড়িতে আসতে বলতাম না।

—প্রতিবেশী বলেও না?

—না, প্রতিবেশী হয় মন দিয়ে, ভবন দিয়ে নয়।

—বাঃ।

হো হো করে হেসে উঠেছিল স্বয়ম্।

—তুমিও দেখছি কেতাবী বাংলায় হাতে পাকাচ্ছ আজকাল।

—তোমারই সঙ্গদোষে হয় তো। আচ্ছা, এবার তোমার সেই ছোট্ট পেয়ালাটার কথা বল তো! ভারী চমৎকার লেগেছে শুনতে। বীর পুরুষের নিট ব্যাটলড্রেসে সাজা তোমার মুখে এখন আরো ভাল মানাবে।

স্বয়ম্‌ও এই অনুরোধটুকুরই অপেক্ষা করছিল।

নইলে নিজে থেকে কিছু বলবার বাসনা থাকলেও ওর মনের দিক থেকে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকেছিল।

—তবে শোন। যেদিন প্রথম তোমায় দেখি সেদিন তুমি জানতে না কেউ তোমায় সেই মুহূর্তে দেখেছে কিনা। কিন্তু শুদ্ধাচারী পণ্ডিত বাবার ছেলে আমি। ভাঙা চোরা নোংরার বাইরের মানুষ আমি। বাল্মীকির কমণ্ডলুতে আমার তৃষ্ণার জল খুঁজে পেলাম। বয়স তখন কতই বা। কিন্তু এর চেয়ে সরল করে এত গভীর অনুভব আর কোথাও আমি খুঁজে পাইনি।

—তোমার কমণ্ডলু থেকে একটু ছিটেফোঁটা ছিটিয়ে দিতে পার।

স্বাতীর গলার স্বরে সে সুরের অনুরণন পেয়েছিল। হালকা ঠাট্টা ছিল না একটুও।

তাই বলেছিল, তুমি শুনিয়েছ মুনলাইট সোনাটা। আমি শোনাচ্ছি রামায়ণী গান। এটাও মুনলাইটেরই সোনাটা।

সুপ্তৈক হংসং কুমুদৈরুপেতম্
মহা হ্রদস্থং সলিলং বিভাতি
ঘনৈর্বিমুক্তং নিশিপূর্ণচন্দ্রং
তারাগণাকীর্ণমিবাম্তরীক্ষম্।

প্রথম ভোরের আলোকে আমার মনে হয়েছিল পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। অনেক কুমুদফুল ফুটে আছে। সায়রে একটি হাঁস ঘুমিয়ে আছে। আকাশ ভরা তারার মধ্যে তুমি। তুমি হচ্ছ পূর্ণিমার চাঁদ।

এবার ঠাট্টায় হালকা হয়ে স্বাতী জিজ্ঞেস করল, ওঃ, তোমার আকাশে বুঝি অনেক তারা আছে ?

ওর ঠাট্টা গায়ে না মেখে স্বয়ম্ উত্তর দিয়েছিল, আমার ওড়বার আকাশই নেই, তায় তারা।

—ওঃ। তবে ওই যে পূর্ণিমার চাঁদ না কি যেন একটা বলেছিলে ?

—সেটাও আমার আকাশের নয়। দূর গগনের।

—কি রকম ? আবার যেন হেঁয়ালী করছ।

—না, হেঁয়ালি নয়। তুমি যখন পিয়ানো বাজাচ্ছিলে বিদেশী ব্যাটলড্রেসে সাজা আমি তখন বইয়ে পড়া এবং ছবিতে দেখা ভিয়েনার প্রাসাদ আর দুর্গের কথা ভাবছিলেম। সেই সব প্রাসাদ দুর্গের কুঞ্জবনের আড়ালে আঁধারে কত মধুর বাণী, কত চুম্বন, হয়তো কত প্রতিশ্রুতি বিনিময় হত। ওই সঙ্গীতের রেশই থাকত তার মূলে। কিন্তু সে সবই হয়তো বাতাসে শিমুল ফুলের আঁশের মত উড়ে গেছে।

হেসে স্বাতী বলেছিল, এবার তাহলে হেঁয়ালি ছেড়ে স্বীকার কর তো, এই বাজনাটার রেশও তেমনি করে মিলিয়ে যাবে কিনা।

দৃঢ়ভাবে স্বয়ম্ বলেছিল, না স্বাতী, না। তোমার সমাজের লোকরা তোমায় 'সুইটি' বলে ডাকে। সুইটির ড্রয়িংরুমের বাজনা তারা ভুলে যাবে। স্বাতীর পিয়ানোতে মুনলাইট সোনাটা আমি ভুলব না।

একটু থেমে সে বলল, আমি যে সোনাটার পরিশেষের প্রেসটো য়্যাজিটাটোর মাতাল ঝঙ্কার নিজের হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করেছি, স্বাতী।

*   *   *   *

এদিকে ডাকোটা প্লেনটাও পাহাড়ী ঝড়ের মধ্যে পড়ে উথালি-পাথালি করছে।

মাইক সেজন্য একটু ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। রওনা হবার আগে আবহাওয়া দপ্তরের 'মেট' রিপোর্টে এর পূর্বাভাষ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চাঁদের আলো কতক্ষণ থাকবে আর জাপানী বাহিনী সক্রিয় হয়ে এগিয়ে আসার জন্য আর কতদিন দেরী করবে, সে কথা বিবেচনা করে ঝড়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও অভিযান পেছিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

তাছাড়া একবার সাজ সাজ রব উঠলে আর প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেলে সেটা স্থগিত রাখলে শত্রুর কাছে তা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। ঝড়-ঝাপটায় কয়েকটা প্লেন, কিছু অস্ত্রশস্ত্র আর কমব্যাটান্ট সৈন্য শেষ হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ করা যায়। হারানো সুযোগ ফিরে নাও আসতে পারে।

আর সারপ্রাইজ, হঠাৎ চমকে শত্রুকে বেকায়দায় ধরা যুদ্ধের সবচেয়ে বড় কৌশল। সেরা স্ট্রাটেজি।

স্বয়ম্ একবার ভাল করে মাইকের কাজ নজর করে দেখল। পিছনে তাকিয়ে দলের সবারই মনের অস্থিরতা অনুভব করল। অন্য সময়ে এই অবস্থায় হৈ-হৈ চঞ্চলতার সীমা থাকত না।

কিন্তু এখন সমরশৃঙ্খলা সবার উপরে। যার যা কাজ তা নির্বিবাদে, বিনা প্রশ্নে তাকে করতে দাও।

এবং স্বয়ম্ স্থির সাহসে অবিচল থাকবেই। তার দলের মনে সাহস সঞ্চার করা, ভরসা বজায় রাখার দায়িত্ব তারই।

ঠিক যেমন স্বাতীর কাছ থেকে বিদায়ের সন্ধ্যাতে সেই বিদায়কে সহজ করে রেখে আসার দায়িত্বও তারই ছিল।

মাত্র কটা সন্ধ্যার দেখা। মাঝখানে ট্রেনিংয়ের জন্য দুর্গম গোপন সেণ্টারে থাকার সময়টা তার নিজের দিক থেকে ভরে রেখেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়।

আর স্বাতীর দিক থেকে ধীর প্রতীক্ষায়।

আর মাঝখানে বিরহের নদী।

কিন্তু স্বয়ম্ সেই বিরহের কথা এতদিন এত বিপদের মধ্যে, শত্রু এলাকায় ঘুরে ঘুরে যুদ্ধে মেতে থাকার মধ্যে মনে করতে চায়নি। শুধু সঙ্গসুধার কথাই মনে করেছে বারবার। বিরহের বিধুরতা নয়, মিলনের মধুরতাই তাকে উৎসাহ দিয়েছে। দিয়েছে সাহস। দিয়েছে বিশ্বাস।

তাইতো মরণের দিকে অভিযানের মধ্যে সে জীবনের অভিসার চালিয়েছে।

তাইতো এই সাংঘাতিক ঝড়ের পাগলামি আর ডাকোটার দুটো পাখার ঝটপটানির মধ্যেও স্বয়ম্ শান্ত মনে ধর্মপদের একটা লাইন মনে করল—চিত্তম্ রাজরথূপমম্।

তার চিত্তই তার রাজরথ।

*　　*　　*　　*

সেই রথের দোলায় দোলায় সে স্বাতীর পিয়ানোর সুরের দোলায় যেন ভাসতে লাগল। তার আত্মার সঙ্গীত প্লেনের অন্ধকারকে আলোর স্রোতে উজ্জ্বল করে তুলল। স্বাতী যেন সন্ধ্যার পূরবী জাগিয়েছিল তার বাজনাতে। যেন সন্ধ্যাকে চাঁদিনীর রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল।

স্বয়মের মন তখন শুধু একটি সুন্দর দেহকেই দেখেনি। তার মধ্যে দেখেছিল সঙ্গীত। প্রিয়ার আঁখি কৃষ্ণকলির মত কালো না মাইকেল এঞ্জেলোর মত অরুণাভ সে কথা তখন মনে হয়নি। তার মধ্যে সে দেখেছিল বিগলিত মমতা। লীলায়িত আঙুলগুলির মধ্যে অনুভব করেছিল আদরের উচ্ছ্বাস।

আর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে থাকতে সেই সন্ধ্যায় স্বাতীর কণ্ঠস্বরে স্বয়ম্ অনুভব করেছিল বহু দূরে বাজানো শঙ্খের মূর্ছনা, চোখে তুলসীতলায় সন্ধ্যাদীপের আলো।

'প্রেসটো য়্যাজিটাটোর' দ্রুত লয়ের ঝঙ্কার স্বাতীর মনেও উঠেছিল। সেদিনই সে প্রথম, প্রথম নয়, পরমভাবে বুঝেছিল যে স্বয়ম্ সত্যি সত্যি ফ্রণ্টে চলে যাচ্ছে।

কেন যাচ্ছে তাও বুঝেছিল।

ভালবাসতে আরম্ভ করলে বোধ হয় এমনই হয় পরম পরিণামটুকু

বিচ্ছেদের রূপ নিয়ে আসে তার দিকে তাকাতে, তাকে স্বীকার করতে ইচ্ছা হয় না।

ভালবেসেও মানুষ অস্ট্রিচ পাখীর মত বালিতে মুখ ঢাকে। শুধু ভয় পেয়ে নয়, ভালবেসেও।

স্বাতী তাই বলল, রাখ তোমার ম্যাজিটাটো। আজই যে তুমি চলে যাবে তা বেশ বুঝতে পারছি। আমার বাজনাটা তুমি থামিয়ে দিলে না কেন?

—কেন থামালাম না তা তুমি জিজ্ঞেস করছ, স্বাতী? তুমি কি জান না?

স্বাতী খুব ভাল করেই জানে। তবু সে আবহাওয়া হালকা করার জন্য অন্যদিকে কথার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করল।

—হ্যাঁ জানি। আমাদের সোসাইটির মত মেরুদণ্ডহীন লোক তুমি নও। তারা সব কিছু বোঝে, সব কিছু ব্যাখ্যা করে, অথচ কিছুই অনুভব করে না। তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আর্ট আর লভ নিয়ে চুলচেরা আলাপ করে, অথচ কোনটাতেই না করে বিশ্বাস, না পায় আশ্বাস।

—আমি কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ সেলাই করে তোমার দিকে তাকিয়ে থেকে অফুরান আনন্দ অনুভব করতে পারি। আর কিছুই পারি না।

রাগের ভান করে স্বাতী বলল, তুমি? এ হেন অধঃপতন তোমার?

অত্যন্ত নিরাশার ভান করে স্বয়ম্ বলল, উঃ, কত দুঃখ আমার। ঠিক অধঃপতনের সৌভাগ্য হলো না। যে-কোন সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে মন গরম হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু আমি বেচারা ত্রিশঙ্কু। আমার আনন্দে বাসনা মেশে না। আমি আনন্দের মধ্যে পাই সান্ত্বনা, শান্তি, স্বস্তি। একরকম বলতে পার ইংরেজীতে যাকে বলে 'ভার্চু'। আমার ব্যারাকের বন্ধুরা বলেছে যে আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই। আমারও সে-ভয়টা আছে।

না হালকা না ভারী কি রকম একটা স্বরে স্বাতী তার পরের কথাটা বলেছিল। স্বয়ম্ বুঝতে পারেনি তখন ঠিক করে।

স্বাতী বলেছিল, ভয় ভাঙার সাহস কোনদিন হয় কিনা চেষ্টা করে দেখ না একবার।

—জোর খাটাবার আগে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। যোগ্যতাই জোর। ইচ্ছার দাম নেই।

—তোমার কি ইচ্ছাটুকুও নেই?

স্বাতী তখন একটা ঘেরাটোপে ঢাকা মৃদু বিজলী বাতির তলায় দাঁড়িয়ে

ছিল। ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার জগতে ওইটুকু আলোর বৃত্ত যেন ওকে সমস্তটা স্বর্গের আলোতে ঘিরে রেখেছিল। সেই সুদূরের শঙ্খধ্বনি যেন আবার স্বয়মের কানে এসে বাজল।

শঙ্খ। একটা শঙ্খের ভিতর দিকটা কি চমৎকার স্নিগ্ধ শুভ্র, মুক্তোর মত টলটলে। স্বাতীর অঙ্গের সমস্ত অনাবৃত অংশ যেন শঙ্খের গুঁড়োর প্রলেপে ঢাকা।

স্বয়ম্ বলল, আমার ইচ্ছার কথা জানতে চাও? তুমি যেমন করে তোমার পিয়ানোর রীডগুলি স্পর্শ করে তা থেকে ঝঙ্কার তুলছিলে, ঠিক তেমনি করে আমি তোমার মধ্যে ঝঙ্কার তুলতে চাই। তেমনি মমতা দিয়ে তোমায় জড়িয়ে ধরতে চাই। ঠিক তেমনি করে। কারণ, তুমি আমার আকাশে চাঁদ এনে দিয়েছ।

তারপর স্বাতীর গলার স্বর কেমন যেন বদলে গিয়েছিল। এমন সেই স্বর যার ভিতরে লুকানো থাকে বহুদিনের ইতিহাস। বহু অন্তর-নিংড়ানো স্বীকারোক্তির রোমাঞ্চকর প্রকাশ।

স্বাতী সেই স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, তবে তুমি কিসের জন্য অপেক্ষা করেছিলে এতদিন? তুমি কি কোন আকস্মিক, কোন আশ্চর্য ঘটনার অপেক্ষায় ছিলে?

স্বয়ম্ নীরব রইল।

স্বাতী আবার বলেছিল, তুমি কি এমন কিছুর অপেক্ষায় ছিলে যার কোন মানে হয় না? অথবা সাড়া পাবে না বলে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলে?

স্বয়ম্ তবু নীরব রইল।

স্বাতী আবার বলেছিল, অথবা তুমি ঠিক লোকের জন্য অপেক্ষা করছ কিনা তা-ই ভাবছিলে? জান, জবাব পাব কি পাব না সেই আশঙ্কায় চুপ করে থাকলে উত্তর কোনদিনই এসে পৌছায় না। মানুষকে এমনভাবে চলতে হয় যেন উত্তর সে পাবেই। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত উত্তর কখন আসে সে-লগ্নের জন্য কি অপেক্ষা করা চলে?

খুব মৃদুস্বরে স্বয়ম্ উত্তর দিয়েছিল, জানি যে তা চলে না। তবু আমি পারিনি। ঠিকানা মামার বাড়ি, পেশা চাকরি খোঁজা, নেশা বইয়ের মধ্যে, রিসার্চের মধ্যে পলায়ন। এই মূলধন সম্বল করে শুধু অপেক্ষাই করা চলে। তোমার দিকে তাকিয়ে শুধু দেখেছি একটি অ্যান্টিক স্ট্যাচু, মুখে দেখেছি

দা ভিঞ্চির আঁকা ছবি। আর ভেবেছি যে জীবনের একটি দিন রমণীয় অপেক্ষায় কেটে গেল।

দুজনেই তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল। আর মায়াবিনী রাত অসীম মমতায় ওদের দুজনকে যেন ঢেকে রেখে ছিল।

* * * *

প্লেনের জানলার কাঁচ দিয়ে স্বয়ম্ বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন অন্ধকারকে মনের ফটোমিটার দিয়ে মাপবে।

শত্রু এলাকার একটা ছাউনী উপর থেকে নজরে পড়ছে। কিন্তু ওদের সন্ধানী নজর আর অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট কামানের নিশানা এড়িয়ে, ওদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে।

বসন্ত-সন্ধ্যা, বাগানে পাশাপাশি বেড়ানো, নীচু স্বরে ফিসফিস করা এসব সুখের স্বপ্ন, যে ছত্রী বাহিনী নিয়ে শত্রুর সীমানার পিছনে গোপনে নামবে তার জন্য নয়।

আকাশে একটা তারা হঠাৎ খসে পড়বে, তারকার মৃত্যু দেখে চিত্তে একটু দোলা লাগবে, একটা স্বপ্নের অবসান হবে। এসব মন-মাতানো সুদূরের ছবিও তার জন্য নয়।

ভিতরের দিকে চোখ ফেরালো স্বয়ম্।

স্বাতী ওকে সেই সন্ধ্যায় বলেছিল, কিন্তু আমি তোমায় শুধু বলেছিলাম জীবনকে খুঁজে নিতে, একটুখানি বাঁচতে। কিন্তু বাঁচার রসের সন্ধানে তুমি যে মিলিটারীতে যাবে, তাও আবার প্যারাট্রুপে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। ভাবলে···

বাধা দিয়ে স্বয়ম্ বলেছিল, এমন একটা অভাবনীয় কাণ্ড করতে দিতে না, এই তো? জান, প্যারাসুট ঝাঁপ অভ্যাস করতে করতে আমার নিজেকে এত হালকা লাগছে যে রবি ঠাকুরের কবিতা আউড়ে ফেলতে পারি।

ওর মুখের ভাব আর বলার ভঙ্গি দেখে স্বাতী হেসে উঠেছিল, সে তো সব বাঙালীই পারে।

দুই বাহু তুলে প্যারা-ঝম্পের একটা আভাস দিয়ে স্বয়ম্ বলেছিল, মনে রেখো, জঙ্গীদলে ঢুকে যে জঙ্গলে মরণঝাঁপ দিতে যায় সে ঠিক বাঙালী নয়। কিন্তু তাকে কি তুমি চিনলে না এতদিনে?

—চিনি বলেই জিজ্ঞেস করতে পারিনি যে আমার সামান্য কথাটার এমন অসামান্য দাম কেন দিলে।

—সামান্য নয়, স্বাতী। যে নিজে স্বয়ং আসবে আমার কাছে সেই হচ্ছে স্বাতী। স্ব আতি। যে পথ দিয়ে তুমি নিজে থেকে আসবে সেই পথ আমি তৈরী করতে যাচ্ছি। আমি ধন্য হতে চাই।

—তুমি আমার বীর, স্বয়ম্ তুমি নিজে থেকে তুমি তা হয়েছ। বীর আমার।

৪

বীর আমার।

স্বাতী স্বয়ম্‌কে বলেছিল, বীর আমার। এই একটুখানি সম্বোধনে সে তার সমস্ত হৃদয় উজাড় করে দিয়েছিল।

আর স্বয়ম্ মনে করেছিল যে যুদ্ধ জয় করে ফিরে এসেও কোন পৃথ্বীরাজ বা কোন নেপোলিয়ন এমন প্রেমের সম্ভাষণ, প্রেমের সম্বোধন পায়নি।

যেদিন স্বাতী ওকে এই বলে ডাকল তখন পর্যন্ত সে তো শুধু যুদ্ধে যেতে তৈরীই হয়েছে। তার শিক্ষার পরীক্ষাটুকুও তখনো হাতে কলমে হয়নি। তবু···

ভাবতে ভাবতে তার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ বয়ে গেল। যেন শিরদাঁড়া দিয়ে বরফের স্রোত নেমে আসছে। ডাকোটা প্লেনটা যেন এভারেস্টের চূড়ায় একটা পাখির বাসা। খড়কুটোয় তৈরী। তেমনি সামান্য অসহায় একটা আচ্ছাদন শুধু।

না। ভয় তার করেনি। কিন্তু আজ রাতে প্লেন টেক অফ করার আগে তার দলের কারো কারো করেছিল।

অন্ধকারের মধ্যে প্লেনের ইঞ্জিন গর্জে ওঠার আগে দরজাটা বন্ধ করার কথা। ইঞ্জিনের দিক থেকে একজন হেঁকেছিল, অল সেট? অর্থাৎ সব তৈরী?

মাটিতে গ্রাউণ্ড স্টাফ সবাই সরে দাঁড়িয়েছিল। ইঞ্জিন দুটো নড়ে চড়ে গর্জন করে উঠল। হঠাৎ পাইলটের পাশে একজন আর্তনাদ করে উঠল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, দরজাটা খোলা।

দরজা খোলা অবস্থায় প্লেন আকাশে উড়লে ভারসাম্য থাকবে না। তখন খুব সহজে প্লেনটা মাতালের মত উথালি-পাথালি করতে করতে ভোকাট্টা ঘুড়ির মত গোঁত্তা খেয়ে নেমে আসবে।

মিলিটারী জীবনে হরদম ব্যবহার করা হয় অকথ্য হরেক রকম রামখিস্তি। তারই তুবড়ী ফুটতে লাগল এখন অনেকের মুখে। শুধু তেরছা চোখ দিয়েই এই সৈন্যটির দিকে সবাই তাকাল। একজন হাঁকল, হারি আপ—অ্যাণ্ড শাট দি ডোর।

হরি হরি। হারি আপ—অর্থাৎ তাড়াহুড়ো করবে কি। বেচারী ঠায় দাঁড়িয়ে দরজার জন্য হাতড়াতে লাগল অথচ দরজাটা বেশ দূরে।

বে···বেটা দরজাটা খুঁজেই পায় না। অন্ধ শা।··

যেন সবারই স্নায়ু বিগড়ে ছিল। সব কাজেই, বার বার মহড়া দেওয়া সত্বেও অভ্যস্ত কাজেও ওদের অনেকেরই দেরী হচ্ছিল। বেবন্দোবস্ত হয়ে যাচ্ছিল।

প্লেনের মধ্যে সেই সৈন্যটি হঠাৎ বলে বসল, আমার পেটের ভেতর খালি খালি মনে হচ্ছে যেন।

একজন বেরসিকভাবে উত্তর দিল, কুছ ডর নেহি। কাগজের ঠোঙা ব্যবহারের অনেক মৌকা মিলবে।

কিন্তু বমি পেলে ব্যবহারের জন্য ঠোঙা এই প্লেনে এই যাত্রায় একটা অসম্ভব বিলাস। রোজ প্যারাস্যুট নিয়ে মরণঝাঁপ যারা অভ্যাস করেছে তাদের বমি বমি হবে কেন ?

বোমারু বিমানই বরং আগুন বমি করে একথা বলা চলে।

অর্থাৎ ব্যাপারটা গুরুতরভাবে স্নায়ুর চাপের।

স্বয়ম্ তাড়াতাড়ি বেচারার মনটা অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টা করল।

বলল, জান জার্মান প্যারাট্রুপদের সঙ্গে কি দেওয়া হয় ? ওদের সঙ্গে দু-তিনদিনের র‍্যাশন দেয়। চকোলেট, স্লাইস রুটি, বিস্কুট আর সিগারেট। আরো কত কি। সব সেলোফেন কাগজে মোড়া। একটা করে কম্বল আর রান্নার জন্য স্টোভ পর্যন্ত। তা ছাড়া দেয়···

বলতে গিয়ে স্বয়ম্ থেমে গেল। জার্মান প্যারাট্রুপদের সঙ্গে যে 'কারেজ পিল' অর্থাৎ সাহস যোগাবার পিল দেওয়া হয় সে কথা চেপে গেল।

বেচারা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

স্বয়ম্ বলল, খুব গোপন রেখো কথাটা। ইমফলে আমাদের নামিয়ে দেবে। তারপর কি হবে, কি মজা হবে জান ?

—না, স্যার।

—শোন, কথাটা চাউর করা হয়নি। কারণ মাল বেশী নেই। ওখানে পাবে সি অ্যাণ্ড সি।

সি অ্যাণ্ড সি ? ওর চোখ দুটো ফ্যাল ফ্যাল করে অন্ধকারে তাকিয়ে রইল। কথাটার তো মানে হয় কম্যাণ্ডার ইন চীফ। মিলিটারীদের মুখে মুখে এই নামটাই চালু। তাহলে ?

সি অ্যাণ্ড সি হচ্ছে কয়ন্ত্রোঁ। ককটেল। ইম্ফলে বলে যে এমন মোলায়েম ভিকটোরী কাপ অর্থাৎ বিজয়োৎসবের পেয়ালা নাকি আর হয় না। সিকি ভাগ কয়ন্ত্রোঁ, আধ ভাগ ক্যানিয়াক আর বাকিটা লেবুর রস। ভাল করে ফেটিয়ে বরফ কুচির উপর ঢেলে দাও। আর নৈবেদ্যের উপর মণ্ডার মত সাজাও একটা তাজা পুদিনার পাতা। ব্যাস, লড়াইয়ের হয়রানি এক লহমায় খতম।

কিন্তু সেখানে পৌছবার আগেই যে নিজেরা খতম হয়ে যেতে পারি স্যার।

না। এসব হার মানার ভাবনা ওদের মনে আসতে দেওয়া চলে না।

নেপোলিয়ন বলতেন, মনের সাহস দেহের শক্তির চেয়ে তিন গুণ বেশী জরুরী যে কোন যুদ্ধে। প্যারাট্রুপ বাহিনীর পক্ষে সেই সাহস অনেক বেশী, আরো অনেক বেশী দরকার।

স্বয়মের মনে পড়ল রেজিমেণ্টাল মেসে সবাই কিরকম পড়ি মরি করে লাকী চার্মস যোগাড় করে রাখত। বিশেষ করে ইংরেজরা।

ওরা তো দেশী সহকর্মী মারফৎ তান্ত্রিক কবচ মাদুলী পর্যন্ত যোগাড় করত। প্রচুর বিয়ার পান আর প্রচণ্ড হৈ-হল্লার মাঝখানে বাহুর উপরে বাঁধা মাদুলী হঠাৎ হঠাৎ দেখা দিয়ে ব্যাটলড্রেসের তলায় মিলিয়ে যেত।

প্যারাঝম্প অভ্যাস করতে করতে বা যুদ্ধের মহড়ায় হঠাৎ কেউ পড়ে মরলে অনেকে মনে মনে খুশী হতো। কারণ এর পরের দুর্ঘটনাটা নিশ্চয়ই কিছুদিন পরে আসবে। ততদিন বাঁচার মেয়াদ।

স্বয়মের মনে পড়ল ওর তাঁবুর সঙ্গী এক যোদ্ধা স্বপ্ন দেখে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। সকলের ঘুম ভাঙিয়ে সিকিউরিটি রিস্কের কথা ভুলে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠেছিল, নো, নো।

তার স্বপ্নলোকের কম্যাণ্ডার যেন তাকে প্লেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে কড়া হুকুম দিচ্ছেন আর ও বেচারা প্রাণভয়ে প্রাণপণে বলছে, নো, নো।

পঞ্চাশ নম্বর প্যারাশুট রেজিমেণ্টের সেই যোদ্ধা পরদিন ইম্ফলে সৈন্যসংখ্যা বাড়ানোর জরুরী তাগিদে প্লেনে রওনা হয়েছিল। সে ঝাঁপিয়ে নেমেও ছিল ঠিকই। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে মিলিটারী ক্রশও পেয়েছিল পরে। সেদিনই বীরের মত মৃত্যুর জন্যে।

কিন্তু মৃত্যুটাই তো শেষ কথা।

সে কথা বাহিনীর লোকদের বলা যায় না। যেটা বলা যায় তাই সে ওদের বলল, তোমরা নিশ্চয়ই প্যারা-মিউলের কথা জান?

ওরা এই নামটা শুনেছে। প্যারাশুট বেঁধে খচ্চরকে আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া শেখানো হয়েছিল—নেহাৎই স্থানীয় প্রয়োজনে। খচ্চর ছাড়া ভারী ভারী অস্ত্র ওই ঘন জঙ্গলে ভরা পাহাড়ী এলাকায় কে আর নির্বিবাদে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে? তাই চার চারটে প্যারাশুট একটা খচ্চরের সঙ্গে বেঁধে প্লেন থেকে শূন্যে ছেড়ে দেওয়া চালু হয়েছিল। মিলিটারী স্ট্র্যাটেজির সবচেয়ে রোমাঞ্চকর নমুনা। অথচ বাইরের কোন লোক জানত না।

তোমরা ভেবে দেখ, প্যারা-মিউল পর্যন্ত হাসিমুখে ঝাঁপ দিচ্ছে দুশমনের মোকাবিলা করবার জন্য। আর তোমরা হচ্ছ মরদ। শুধু মানুষ নও, পুরুষসিংহ। শের-ই-হিন্দুস্তান। থ্রি চিয়ার্স ফর অল অব ইয়ু।

যে কথা স্বয়ম্ খুলে বলল না তা হচ্ছে—প্রথম প্যারাখচ্চর যখন দেখেছিল যে নীচের পৃথিবী ওর দিকে ছুটে আসছে তখন সে এত আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে মাটিতে নামার পর চারদিন ধরে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত পঙ্গু হয়ে ছিল।

তাই পরে যে খচ্চরগুলিকে নামানো হয় তাদের প্লেনে তোলার সময় এনাসথেটিক ইনজেকশন দেওয়া হত যাতে মাটিতে নামার পরে আরো পনের মিনিট ধরে তার ঘোর থাকে।

ফলে যখন ইনজেকশনের ঘোর কেটে যেত তখন খচ্চর একটু বিহ্বল হলেও শান্ত ও সুস্থভাবে কাজ করে যেত।

—কিন্তু স্যার, ওরা হচ্ছে মিউল। আর আমরা মানুষ।

মনে মনে স্বয়ম্ ভাবল—তা কি আর বুঝছি না বাছাধন। এত দিনের প্যারাশুট ঝাঁপের অভ্যাস। এখন গভীর রাতে শত্রুসেনার পিছনে অজানা আঘাটায় নামার বেলা কোন ভরসাই দিচ্ছে না ওদের। ওই সব যুদ্ধজীবী সৈন্যদের।

তবু ওদের সাহস দেবার জন্য সে একবার শূন্যে ঝাঁপ দেবার দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

পাহাড়ের চূড়াগুলো যেন হঠাৎ মাথা তুলে ওর দিকে তাকাল। মনে হলো যেন পিছনের প্লেনগুলিও ওই চূড়াগুলোর মধ্যে পাখির মত ব্যাকুলভাবে নিজেদের গোপন আস্তানা খুঁজে বের করবার জন্য পাখা মেলে এগিয়ে চলেছে।

আর সে হচ্ছে দলপতি। সবাইকে সাহস দিয়ে ভরসা দিয়ে ভরিয়ে তোলার দায়িত্ব তার।

স্বাতী তো ওর আজ রাতের বিশেষ দায়িত্বটার কথা না জেনেই ওকে বলেছিল, বীর আমার।

স্বয়ম্ নিজের বসবার জায়গাতে এসে বসল। ওর ঘুরে ফিরে যাওয়াতে সবাই একটু ধাতস্থ হয়েছে। বুঝেছে যে সবই ঠিক আছে। এবং এখনো হাতে সময় আছে।

* * * *

এই সময়টুকু স্বাতীর জন্য।

কারণ, ধরণীর ধরাছোঁয়ার উর্ধ্বে আমি দেখেছি স্বাতীকে। আমার নক্ষত্রটিকে। সংসারের সার সেই প্রতিমা, অনির্বচনীয় আনন্দমূর্তি। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের অমরতার আভাসের মত মনের মধ্যে খোদাই করা মূর্তি। নাঃ, মরণের পথে ঝাঁপ দেবার রাতেও পড়া-পাগলের বইয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

হায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তুমি যদি জানতে।

অনেক বৈজ্ঞানিক বলেছে যে তারা একবার আকাশে উড়লে বদলে যায়, আর আগেকার মানুষটি থাকে না। শুধু আকাশে উড়লেই যদি এতটা বদলে যাওয়া সম্ভব হয় তাহলে স্বাতীর চৈতন্যময় চিন্ময় আকাশে বিচরণ করলে সে রূপান্তর না জানি আরো কত বেশী গভীর।

আকাশে শুধু একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র রোবট উড়িয়ে দিলে সেটাও তো সমস্ত পৃথিবী ঘুরে সব কিছুকে ধ্বংস করার মত অস্ত্র ছড়িয়ে বেড়াতে পারে।

আর স্বয়মের মনটা যে স্বয়ংক্রিয় হলেও যন্ত্র নয়। মন্ত্রে গড়া, মাধুর্যে ভরা মন। সারা আকাশে সে যখন যুদ্ধের জন্য উড়ছে তখনো সন্ধান করে বেড়াচ্ছে জীবন। সারা বিশ্বজগতে ছড়িয়ে আছে যে জীবন শুধু তাকে নয়, তার চেয়ে বড় কিছুকেও সন্ধান করছে।

হালকা মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য তারা মখমলের মত নরম আকাশকে যেন মিনা করে রেখেছে। পাহাড়গুলি কতরকম গাছগাছড়ার অলংকারে সেজে আছে আর সেই গহনাগুলি হেলেদুলে ওদের নিশীথ অভিযানকে যেন স্বাগত জানাচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে প্লেনের ককপিটটা যেন কোন মায়াবীর যাদুদণ্ডের স্পর্শে আরেকটি নিভৃত কক্ষ হয়ে গেল।

সেখানে স্বয়ম্ পরম একটা পুরস্কার পেয়েছে—যার তুলনা কোন মিলিটারী ক্রশ বা ভিকটোরিয়া ক্রশেও নেই। স্বাতীর চোখে সে এখন বীর।

৫

বিদায়-রাতের বাকি কথাগুলি তাই মনের মধ্যে ফিরে আসছে।

বাইরে অন্ধকার সেই রাতও আজকের মতই ছিল। ব্ল্যাক আউটের মধ্যে রাতের কলকাতা। তার মধ্যে ঘন পর্দায় ঢাকা, মাথার উপরের ভেনটিলেটর বন্ধ করা ঘেরাটোপের মৃদু আলোয় রহস্যময় একটি কামরা। ঠিক প্লেনের ককপিটের ভিতরের গহন অন্ধকারের মধ্যে যন্ত্রপাতির প্যানেলের একটি মিটমিটে আলো যেমন রহস্য সৃষ্টি করে রাখে ঠিক তেমনি একটি ছোট্ট আলোর বৃত্ত সেই ঘরে।

আর প্লেনের ককপিটে যে ইঞ্জিনের কম্বল চাপা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি চলে তারই মত সেই পিয়ানোর বাজনার মৃদু অনুরণনের রেশ মনে ধ্বনি তুলছিল।

আইন লীবেস। একটি প্রিয়া। একটি দীপশিখা। অন্ধকারকে সার্থক করে। তারার মত স্তিমিত, কিন্তু চাঁদের মত মধু বর্ণের।

সাহিত্যের কথা মনে পড়ল হঠাৎ। ইংরেজীতে যখন প্রেয়সীকে 'হনি' বলে ডাকে তার মধ্যে এত মধু কি থাকে কখনো? এত সুধা? এত সার্থকতা?

আবার একটা সাহিত্যেরই কথা মনে পড়ল ওই আলোর বৃত্তের তলায় দাঁড়ানো স্বাতীকে দেখে। একটা ইংরেজী কবিতা। আমার জীবনে স্বাতীই তো দ্বিতীয়ার চাঁদ।

তুমি বলো—এ শুধু কাগজে আঁকা চাঁদ
কার্ডবোর্ডের সাগরে যাচ্ছে ভেসে :
কিন্তু এ শুধু মনগড়া নয় কোন ফাঁদ
আমায় যদি বিশ্বাস করো তুমি হেসে।

মিলিটারী ইউনিফর্ম পরা সুঠাম দেহের ওপর জাগ্রত মুখ থেকে কবিতাটা যেন আপনা থেকেই বেরিয়ে এলো। যেন ওর নিজের রচনা।

স্বাতী মৃদু স্বরে, প্রায় নিজের মনে বলল, যদি বিশ্বাস করি? সে কথা ভাবছ এখনো?

—না, তা ভাবছি না মোটেই। ওটা শুধু একটা কবিতার অনুবাদ। ওটা শুধু পেপার মুনের সম্বন্ধে। মনের মধ্যেকার মুনের নয়।

সোনাটার সঙ্গীতের রেশ যেন এখনো ঘরটাকে ভরে রেখেছে, মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। যেন একটা দখিনা বাতাস ঘরের মধ্যে ব্যাকুল হয়ে বয়ে যাচ্ছে।

স্বয়মের বঙ্গোপসাগরের তীরে প্যারাট্রুপ শিক্ষার সময়ে সে আকাশের তারাগুলির নীচে পাল তোলা হুলিয়া নৌকো দেখত। এখন তেমনই সব কিছু মনে হতে লাগল।

তেমনি অধরা, তেমনি সুদূর।

বিরাট উন্মুক্ত আকাশের নীচে জীবনের কালো স্রোত বয়ে যাচ্ছে। তার কোন ভার নেই, নেই কোন সীমানা। আছে শুধু ছন্দ আর গতি আর প্রেম। আছে শুধু নিজেকে সার্থক করে তোলার সাধনা, ধ্যান।

সেই ধ্যানকে দেশের ব্যর্থ বেদনা বা অভাগা লোকগুলির আর্ত ক্রন্দন—একটু ফ্যান দাও মা—ভঙ্গ করতে আসতে পারে না।

সেই সাধনার পথে রণবেশে সে স্বাতীর সামনে দাঁড়িয়ে। তার মুখে একটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরের আভা। আলোর বৃত্তটা তাতে মায়া মিশিয়ে দিয়েছে। সে তো হিয়া সমর্পণ করবার স্বীকার না হোক সংকেত জানিয়ে দিয়েছে।

নিজে থেকে। অযাচিত।

স্বয়ম্ ভাবল—তবু ভাল আমাদের মধ্যে কোন কাফ্ লভ—ছেলেমানুষী প্রেম নেই। নেই বোকার মত, ভীরুর মত আলগোছে হাত ধরা, আধো-আধো মিঠে কথা। বন্ধুদের প্রথম 'কাফ্ লভে'র সময় থেকেই সে এ জিনিসটাকে হাস্যকর মনে করেছে। এই প্রেমিক-প্রেমিকার চোখে ভাঙা ভাঙা ভাষা, বোকামিভরা দেহস্পর্শ আর হর্ষ, একটা চোরাই সুখের ছোঁয়াচ লাগা ভাব।

তার মতে এ সব প্রণয়ীযুগলকে নিজেদের ওপরে ওঠবার ক্ষমতা বা ফুটে ওঠবার মত ঐশ্বর্য দেয় না।

স্বয়ম্ মনে মনে অনেক প্রত্যয় নিয়ে ভাবল—ভালবাসার মধ্যে দিয়ে এক হয়ে যাবার মনোভাবটাই কেমন যেন অস্বাভাবিক। আমরা দুজনে কি করে স্বয়ংসম্পূর্ণ দুজন থাকতে পারি, আবার দুজনে এক হয়ে যেতে পারি, অথচ নিজেদের নিজস্বতা বজায় রাখতে পারি?

স্বাতীকে কি করে বিলোপ করে দিতে পারি আমার মধ্যে? তাহলে তো সে আর অনন্যা থাকবে না।

আর আমিও যদি ওরই মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাই তবে ও-ই বা আমাকে আমি হিসাবে পাবে কি করে? নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমায় ও বিকশিত। স্বাতী দেখতে চাইবে যে আমিও সেই ভাবে ফুটে উঠছি।

সেও দেখছে স্বাতীকে অনিমেষে। এমন ভাবে, যেন সে দেখার শেষ নেই।

সে ভাবছে: প্রেমে পড়ে দুজন নিজেদের স্বাধীন চিত্ত, স্বতন্ত্র সত্তাকে অক্ষুন্ন রেখে যখন ভালবাসে সেই ভালবাসাই বোধহয় সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে বড়। যা যৌবনকে অতিক্রম করে যায়, জীবনের পাত্র থেকে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে, কিন্তু পাত্র থাকে ভরপুর। থাকে অফুরাণ।

সেই ভালবাসার কথা ভেবেই বোধহয় বৈষ্ণব কবি গেয়েছিলেন—দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

ভাবতে ভাবতে স্বয়ম্ স্বাতীকে দেখছে। এতক্ষণে নজরে পড়ল যে ওর চরণে আজ শুধু সাধারণ একটা স্যাণ্ডাল। উঁচু হিলের ঔদ্ধত্য নয়, নরম নম্রতা ওর পা দুখানিকে ঘিরে রেখেছে।

পরনে সাদা, ঠিক সাদা নয় হালকা জলরঙের তাঁতের শাড়ি। পাড়ে নেই জরি, জমিতে নেই জামদানীর ছিটেফোঁটাটুকুও। খাস বিলেতী কোন যুগধর্মী পিরিয়ড গহনা নেই কোথাও। নেই বণ্ড স্ট্রীটের মেক-আপের ছিমছাম প্রকাশ। নেই সেলফরিজের ঝকমকে ট্রিংকেট, টুকিটাকি নকল গয়না।

শুধু একটা সরু মুক্তার হার প্রসাধনের সাক্ষী হয়ে গলাকে মুক্তি দিয়ে রেখেছে।

এত বছর ধরে বিলেতে সযত্নে যত্নহীনতার ছোপ লাগিয়ে প্রায় ঘোড়া রং করে আনা চুলগুলি পনি টেইল অর্থাৎ ঘোড়ার ল্যাজের মত হালকাভাবে বাঁধা নয়। কাঁধের ওপর নরমভাবে ছড়ানো। পার্ক স্ট্রীটের কোন হেয়ার ড্রেসার অর্থাৎ কেশ শিল্পীর কারুকার্যের কোন নমুনা নেই সেখানে।

লণ্ডনের স্কুল অব ইকনমিকসে নয়, কলকাতার বেথুন কলেজে যেন প্রথম লজ্জভাবে ভর্তি হতে চলেছে ভবানীপুরের কোন ছাত্রী।

নতুন এক স্বাতী।

নতুন এক স্বয়ম্ তার সামনে দাঁড়িয়ে।

সন্ধ্যা কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে না। ম্যাণ্টেল পীসের উপর দেওয়ালে টাঙানো কাঠের কাজ-করা সুইস ঘড়িটার ভিতর থেকে একটা কোকিল বেরিয়ে এল। কাঠের কোকিল মধু ঝরিয়ে ডেকে গেল—কু-হু কু-হু।

না। বিলেতী কোকিল কুহু কুহু ডাকে না। ডাকে কায়াকি, কায়াকি। আর অনন্তকালের সমুদ্রে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে সময় জানিয়ে যায়। যে সময় সমুদ্রের চেয়ে বেশী অনন্ত, তবু কারো জন্য অপেক্ষা করে না।

সেই ঢেউয়ের ধাক্কাতেই বোধহয় স্বাতী সচকিত হয়ে উঠল। বলল, জান, এতদিনে আমার সত্যি ভয় করছে। কতখানি ভয় তা এতদিন বুঝতে পারিনি। তুমি হঠাৎ 'এনলিস্ট' করে নাম লিখিয়ে ফেললে মিলিটারীতে। তার ওপর সব চেয়ে বেশী বিপদ আর সম্মানের বাহিনীতে। একেবারে 'কোর এলিট'। আমার বুক ফুলে উঠল…

হেসে স্বয়ম্ বাধা দিল, আর এখন বুঝি করছে দুরু-দুরু? হিয়া দুরু-দুরুকে কবিরা যার লক্ষণ বলে থাকেন সেটা কিন্তু ভয় নয়। অন্য কিছু।

স্বয়ম্ ওকে বিদায় রাত্রিতে ভারাক্রান্ত দেখে যেতে চায়নি। হাসি-ঠাট্টা, আলাপ-প্রলাপ; যা হয় কিছু হোক। শুধু বিষাদ নয়।

স্বাতী ম্লান হেসে বলল, তুমি এয়ারবোর্ন অফিসার কিনা। আকাশে তোমার বিচরণ। সেখান থেকে নাম। তাই হেসে সবটা উড়িয়ে দিতে চাও।

—না, ফুরিয়ে দিতে চাই। ফুর-ফুর করে পাখীর মত অন্ধকারে মিলিয়ে যাক তোমার ভয়।

—তবু তোমায় জানাতে চাই।

—সবই তো জানি।

অন্য সময় হলে ঠোঁট উলটে স্বাতী বলে উঠত, ও-হ্ রিয়েলি!

কিন্তু আজ সে ঠোঁটে রং-ই নেই। তার বঙ্কিম ভঙ্গিমা আসবে কোথা থেকে? সে কোন উত্তর দিতে পারল না। শুধু অপলক দৃষ্টি একটি দীঘল দৃঢ় সজ্জিত দেহের দিকে তাকিয়ে ছল-ছল করে উঠল।

স্বয়ম্ খুব কাছে এগিয়ে এল। আবার একটু নড়ে-চড়ে সরে গেল। সে চলে যাবে অনির্দিষ্ট আকাশপথে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। ফিরবে কিনা তার ঠিক নেই। এবং কি মূর্তি নিয়ে, কতখানি অক্ষত থেকে ফিরবে তাও কেউ জানে না।

এই ক'মাস ধরে যে হাতে মৃত্যুর অভিষেক অভ্যাস করেছে সে হাত দিয়ে স্বাতীর চোখ মুছে দিতে মন চাইল না।

একবার নিষ্ঠুরের মত ভাবল—এই তো আমার সাধনার প্রথম প্রতিদান।

সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে সে চিন্তা সরিয়ে দিল। সামরিক জীবনে প্রত্যেক বিদায়ই হয়তো শেষ বিদায়।

শুধু বলল, না স্বাতী, তুমি দুর্বল হয়ো না। তুমি তো কোনদিনই দুর্বল মেয়ে ছিলে না। স্টার ডাস্ট রেস্তোরাঁয় যারা স্টারের মত নিজের মহিমায় ঝিকমিক করে তাদের শিক্ষাই আলাদা। ব্যক্তিত্বই আলাদা। আমায় তুমি বলেছ বীর। কিন্তু বীরাঙ্গনা তো তুমি।

বীর আর বীরাঙ্গনা দুটো কথা একসঙ্গে বলে ফেলে স্বয়ম্ নিজেই বিব্রত বোধ করল। এখনো সে এই কথাটা বলতে চায় না। এখনো নয়।

তাই সে কথাটা ঘোরাবার জন্যে বলল, তুমি তো পরীক্ষিত পদার্থ। টেস্টেড টাফ স্টাফ। আমি এখনো শুধু ময়ূরপুচ্ছে সেজে আছি।

স্বাতী একথায় খুব চঞ্চল হয়ে উঠল।

মৃদুস্বরে বলল, আমাদের সোসাইটি গার্লদের সম্বন্ধে বাইরের লোকের বোধহয় তাই সাধারণ ধারণা। কিন্তু আমাদের দুর্বলতা যে কোথায় তা তারা বুঝবে না। ইয়োরোপের আধুনিকা মেয়েদেরও সেই দশা। লোকে শুধু দেখে হাই সোসাইটির মেয়েরা ফ্লার্ট করে, হাসে, 'সিলি' ধরনের কাজকর্ম করে, কথা কয়। এই ফ্লার্ট আর সিলি—এই কথা দুটোর বাংলা সঠিক অনুবাদ পর্যন্ত নেই বোধহয়। তাই তারা মনে করে যে আমরা শুধু এ সবই স্বপ্ন দেখি আর তারা আমাদের তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে।

একটু চুপ করে থেকে স্বাতী আবার বলল, ওরা যদি শুধু প্রজাপতির রং না দেখে মন দেখতে পেত। কিন্তু ওদের না আছে দেখবার চোখ, জানবার মন বা যাচাই করার ক্ষমতা।

স্বয়ম্ বাধা দিল, থাক, সে সব বাজে কথা। আমিও সে বাঙালী নই, তুমিও সে প্রজাপতি নও। তবে কেন এ সব কথা?

—না, তবু তুমি জেনে যাও, আমার বাইরের পরিচয়ই সবটা নয়। আমাদের সমাজ একটা মুখোশ মুখে এঁটে দেয়, মনে করিয়ে দিতে থাকে যে ওটাই আসল মুখ। আমাদের মায়েরাও শুধু বিয়ের আয়নার মধ্যেই ওই মুখটা দেখতে চায়।

—না না, স্বাতী। আমি শুধু তোমাকে চিনি, তোমাকে জানি।

—তবু তুমি মনে রেখো। প্রজাপতির দল যখন সমাজে বের হয় তারুণ্য ও লাবণ্য সহজেই সফলতা এনে দেয়। তারা বিভোর হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাবা, মা অন্ধ স্বপ্নে মেতে ওঠে। আমরা যখন নাচি, গাই বা পিয়ানো বাজাই

যা চটকদার অর্থহীন বুলি আওড়াই যোগ্য পাত্র যুবকরা হাসতে হবে বলেই হাসে। কিন্তু তখন আর সবাই স্বপ্নে মেতে ওঠে। এই সব মেয়েরা ছেলেদের চোখে যে আলো খোঁজে সে আলো তাদের চোখে হয়তো জ্বলেই না। তবু··

একটু থেমে স্বাতী বলল, তোমরা যদি সেই মেয়েদের দেখতে—তাদের নির্জন ঘরে নিবিড় রাতে, নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গতার মধ্যে। তখন তারা নিজেদের সম্বন্ধে কোন মায়াভরা স্বপ্নই তৈরী করতে পারে না।

—থাক না ওদের কথা। তোমার সঙ্গ যে আমি পেয়েছি সেটাই তো আমার পরম ভাগ্য। আমায় যে নতুন প্রাণ দিলে···

স্বাতী বাধা দিয়ে বলল, ঠিক তা নয়। আমি সামান্যই সঙ্গ দিয়েছি। প্রাণের প্রেরণা নিশ্চয়ই নয়।

স্বয়ম দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল, না না, তুমিই আমায় প্রাণবন্ত হতে বলেছিলে। আমার সামনে নতুন পৃথিবী জেগে উঠেছে তোমারই জন্যে। তুমিই প্রেরণা, তুমিই প্রাণ।

ম্লান ভাবে স্বাতী বলল, তোমার নিজের বাঁচবার প্রয়োজনে আমার সামান্য কথাটাকে অসামান্য দাম দিয়েছিলে। বিনা চিন্তায়, আধো পরিহাসে আমি তা বলেছিলাম। আমি নিজেই তো সম্পূর্ণ নই। শুধু একটা টুকরো।

আজ স্বয়ম্ ওকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেখে যাবে। তা না হলে নিজের ব্রতই বৃথা।

স্বয়ম্ বলল, সেই তো সব চেয়ে ভাল। শুধু একটা টুকরো। দ্বিতীয়ার চাঁদের মত। যে পূর্ণিমার দিকে অহরহ এগিয়ে যাবে। একটু টুকরো থেকে। ঠিক যেমন তুমি বলেছিলে—লিভ এ লিটল। ওই একটা অঙ্কুর থেকেই তো চারা গজায়, ফুল ফোটে। সেইভাবেই তো প্রাণ বিকশিত হয়।

—তার মানে তুমি···

—হ্যাঁ, তার মানে এমন মেয়েকেই চিরকাল মনে ধরে রাখা যায়। সম্পূর্ণ একটি নারীকে ধরা যায় না, পরশ করেও ভুলে যেতে হয়। যোগ্যা রমণীও ভোগ্যা হলেই খরচের খাতায় চলে যায়। কিন্তু মনোহারিণী একটু টুকরো থেকে যায় অফুরান। তোমার কাছে আমি সেই অফুরানের ঠিকানা পেয়েছি।

৬

মোনালিসার হাসি দিয়ে শুরু হয়েছিল।

কয়েক বছর আগেকার পুরোনো সৌরভ সমস্ত স্মৃতি জাগিয়ে আবার ফিরে এল। সেই জাগরণ সে-সময় ছিল প্রায় আধো ঘুম আধো জাগরণের মাঝামাঝি। তাকে যেন এতদিনে স্বয়ম্ স্বীকার করবার সাহস পাচ্ছে।

সেই হাসির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল সেই প্রভাতে। স্বয়মের জীবনের, জাগরণের শুরু সেই লগ্নে। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে।

* * * *

সেই সোনালী নীল সকালে স্বয়ম্ ফিরে গেল।

কৈশোর যৌবন দুঁহু মেলি গেলা। বৈষ্ণব কবির রসঘন বর্ণনার মধ্যে সেদিন স্বয়ম্ নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল। নিজেকে জাগতে দেখেছিল। দেখেছিল মনকে উড়তে।

বিখ্যাত 'বিচিত্রা' পত্রিকাতে 'ক্রমশ প্রকাশ্য' এক ভ্রমণ-কাহিনী 'ইয়োরোপা'তে সে পড়েছিল কেমন করে বসন্তের প্রথম পরশ পেয়ে হঠাৎ শীতের ঘন ঘোমটা খসিয়ে ইয়োরোপা আধো-নিমীলিত আঁখি মেলে ধরে। কেমন করে সেই দেখা দেহে জাগায় হর্ষ, মনে শিহরণ। সেই লেখাতে একটি ফুলের ছবিও ছিল। নাম—চেরীর হাসি। ফরাসী ঢঙে চেরীকে শেরী বলে উচ্চারণ করলেই সে হয়ে যায় প্রেয়সী।

সেই প্রেয়সীর হাসিই মোনালিসার হাসি।

আশ্চর্য। সে ইয়োরোপে যায়নি। তার খবর শুধু বইয়ের পাতা আর ফিল্মের ছবি ছাড়া আর কোথাও পায়নি। কিন্তু ভিন্‌দেশী বধূর হাতছানি সে সেই প্রভাতে পেয়ে গেল নিজের জীবনে। নিজের কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে।

কোন্ ইন্দ্রজালে মন মুকুলিত হয়ে ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিল দিগন্ত। দেহের উপর থেকে বরফের আবরণ খসে গেল।

সে মেয়েটির মুখে দেখল একটু হাসি। শুধু হাসি, অকারণ পুলকে আপন মনে হাসি।

বাংলায় তখনো রোমান্টিক যুগ চলছিল। লোকে আপন মনে হাসতে পারত। অন্যের মুখে হাসি দেখলে নিজে খুশী হতে পারত। বাঙালী মধ্যবিত্তের আলো তখনো দেশের মধ্য-আকাশে ছড়িয়ে থাকত।

পৃথিবীময় ব্যবসা-বাণিজ্যের ভীষণ মন্দা অবস্থার টাল সামলে বাংলা এক-রকম মোটামুটি শান্তি আর স্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। নতুন সংবিধানের ফলে যে নতুন রাজনীতি সৃষ্টি হলো, তা তখনো বাঙালীকে ততখানি উদ্বাস্ত করে তোলেনি। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর দল খেতে পেত। সম্মান পেত। ভবিষ্যতের আশাও ছিল।

ছাত্ররা প্রত্যেক মাসে রবীন্দ্রনাথের নতুন গান, নতুন কবিতা পেত। পথে-ঘাটে নজরুলের গান গেয়ে বেড়াত। আর আবৃত্তি করত :—

'কাহারে পরাবো আজি যৌবনের
রাখী পূর্ণিমায়'

যৌবনের সঙ্গে আপন মনে হনিমুন মধুচন্দ্রিমা যাপনের সেই দিনগুলির মধ্যে স্বয়মের কৈশোর কেটেছিল। একদিকে স্বাধীনতার বাণী, অন্যদিকে 'ইয়োরোপা'য় বর্ণনা করা স্বপনচারিণী বিদেশিনীর হাতছানি—দুই-ই সমানভাবে যৌবনকে দোলা দিয়ে যেত।

ভালবাসার মধ্যে ছিল রঙ, ছিল রোমান্স। যা সুদূর, যা ধরাছোঁয়ার বাইরে, তাকেই ভালবাসতে মন আকুলি-বিকুলি করত।

এ-সময়ে স্বয়মের মামা একজন 'হোমে' মানে স্বদেশে অর্থাৎ বিলেতে রিটায়ার করে ফিরে যাওয়া সাহেবের বাড়ি সস্তায় কিনে বালিগঞ্জ পাড়ায় উঠে এলেন।

তখনকার দিনের নির্জন সাহেব পাড়া। শুধু মোটরগাড়িগুলো হুস-হুস করে চলে যায়। এমনকি হর্ণ বাজিয়েও সাহেব-সুবোদের নির্জনতায় ব্যাঘাত করে না।

প্রত্যেক বাড়িতে বড় বড় বাগান, অজস্র ফুলের মেলা। গাছপালার সমারোহ। ওরা পর্যন্ত নিরিবিলি ভাবটাকে ঘন নিবিড় করে তুলেছে। শুধু তাদের মাথায় মাথায় মাঝে মাঝে ডাক শোনা যায়—পিউ কাঁহা। কখনো বা কুহু-উ-উ।

প্রেম কৃত্রিম হট-হাউসের যত্নে লালিত ফুল নয়। অগোচরে নিজে থেকে ফুটে ওঠা বনফুল। কোন শিশিরসিক্ত রাতে, অরুণরক্ত প্রাতে, নির্জন মধ্যাহ্নে হয় তার সঞ্চার। পথের ধারে, পুকুর পাড়ে, মনপবনের হাওয়াতে।

সেই মন-পবন বইবার পক্ষে সহজ অনুকূল এই পাড়াটা।

স্বয়ম্ তাই মনে করল। দক্ষিণের বাগানটাতে ছায়া নেমে আসে ছবির মত। ওদের উত্তর কলকাতার পুরোনো বসতবাড়ির উঠোনে নিজেদেরই বাড়ির তেতলার রেলিঙের ছাপমারা ছায়া নয়। লম্বা সুঠাম পাম গাছের ছায়া। তমালতালিবনরাজি নীলা প্রকৃতি সে কলকাতায় দেখেনি। কিন্তু কালিদাসের সৌন্দর্য বর্ণনা সে এইটুকুর মধ্যেই পেয়ে গেল।

নীচু পাঁচিলের উপর তারের জালিকে ঢেকে রাখা লতার মর্ণিং গ্লোরি ফুলের বাহার সেই ছায়াকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

কালই বিকেলে স্বয়মরা এ-বাড়িতে উঠে এসেছিল। জিনিসপত্র, লাইব্রেরী আগে থেকেই আসতে শুরু করেছিল। তাই তেমন গণ্ডগোল বা হাঙ্গামা হয়নি। শুধু যথাস্থানে সব সাজিয়ে রাখার ব্যাপার।

তারই মধ্যে সারা বিকেল স্বয়মের মনে একটি অচেনা রাগিণী ঝংকার তুলেছিল। যেন কোন অজানা বিদেশে সে এল। কোন রূপকথার রাজ্যে। কোন স্বপ্নভরা অলকায়।

অলকা কথাটা তার মনের মধ্যে একটা আলোড়ন তুলল। অলকা মানে স্বর্গ। কিন্তু শুধু ধরাছোঁয়ার বাইরের কল্পনার স্বর্গ তো নয়। কয়েকদিন আগে ওরা থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী'। অভিনয়ে ছিলেন শিশির ভাদুড়ী।

সেই নাটকে ধরাছোঁয়ার বাইরের ভৈরবী ষোড়শী তার মন্দির ছেড়ে সংসারের প্রেয়সী অলকা হয়ে এসেছিল। মনের মধ্যে যে প্রেয়সী তার নাম অলকা।

দক্ষিণ কলকাতা থেকে অনেক দিনের মধ্যে শ্যামবাজারে থিয়েটার দেখতে যাওয়া সম্ভব হবে না। নতুন কেনা বাড়িতে শুভ গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনও কিছু এসেছিল।

উত্তর কলকাতার বনেদী ঘরানার রীতি অনুসারে থিয়েটার দেখাটা একটা উৎসবের ব্যাপার। এতটা আমোদ বোধহয় আর কিছুতেই নেই। তাই ওদের বাড়ির সবাই দল বেঁধে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল।

স্বয়মও বাদ যায়নি। কিন্তু ওই বয়সে আর ওই বই পড়া মন নিয়ে স্বয়ম্ অভিনয়ে যা খুঁজে পেত, যা অনুভব করত সম্ভবত অন্যেরা তার ধারকাছ দিয়েও যেত না।

অভিনয় যেন জীবনের দর্পণ, মনের আয়না। রাঙানো মুখোশ নয়।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আলেকজাণ্ডার যখন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন, তখন নাটকের অভিনয় যে তাঁকে শুধু আনন্দ দিত তা নয়, প্রত্যেক বিজয়ের উৎসব হতো অভিনয় দিয়ে।

স্বয়ম্‌ও মনে মনে যেন দিগ্বিজয়ে বের হতো নাটক দেখবার সময়। ভাবত যে আনন্দ উপভোগের ব্যাপারে আমাতে আর আলেকজাণ্ডারে মিল আছে।

এর আগেও সে কয়েকবার নাটক দেখেছে। ঐতিহাসিক না হয় পৌরাণিক নাটকের জমজমাট ভাব। ভেলভেট আর চুমকী, বেনারসী আর রেশমী, মুকুট আর তলোয়ারের ঝকমক করা উজ্জ্বলতা অনেক সময় ওর চোখে চমক লাগিয়ে দিয়েছে। বহিরঙ্গের রঙ, স্টেজের দৃশ্যপট ওকে মন ভুলিয়ে কোথায় যেন নিয়ে গিয়েছে। আর অভিনয় দেখতে দেখতে এটা যে অভিনয় তা অনেক সময় যেন ভুলে গেছে।

স্ত্রী-পুত্রের বিরহে ব্যাকুল রামের বেশে যখন শিশির ভাদুড়ী ওই নীল নলিন নয়ন দুটির সন্ধান করেছেন, তখন স্বয়ম্ নিজের অজান্তে রামের ব্যথা অনুভব করতে আরম্ভ করেছে।

আমাদের মধ্যেকার মন আমাদের রোজকার জীবনের চেয়ে অনেক বেশী চিনতে পারে, অনুভব করে।

ষোড়শী নাটকের অভিনয় দেখতে দেখতে স্বয়মের দৃষ্টি দুশ্চরিত্র জমিদারের কামনা-বাসনার নতুন একটা দিকে আকৃষ্ট হলো। সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার নতুন রঙের কথা তার মনে গুনগুন করতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায় সে যার পরিচয় পেল, সে হচ্ছে 'মন্ আমি', ফরাসীতে যাকে বলে বঁধু। ফরাসী সাহিত্যের অনুবাদ বইয়ে সে যার পরিচয় পেল, সে হচ্ছে 'বেল আমি'—সুন্দর বঁধুয়া।

কিন্তু তার চেয়ে অনেক প্রখর প্রেমের কথা সে আজকালকার বইয়ে পড়েছে। নিজের মনকে প্রসন্ন সূর্যের তাপে ধীরে ধীরে পাকতে দেখেছে। কাঁচা পেয়ারার সবুজের উপর হলদে ছোপ পড়ার মত।

কত অগোচরে অলক্ষিতে পেয়ারার রঙ পাকে তার কোন হিসাব কেউ রাখতে পারবে না। স্বয়মেরও কোন হিসাব ছিল না। বাঙালী জীবনের পরিবেশে লক্ষ্মী ছেলে পাঠ্য বই আর তার চেয়ে বেশী করে অপাঠ্য বই ছাড়া প্রেমের প্রথম পাঠ আর কোথায় পাবে।

কিন্তু চোখ যার খোলা আর মন যার জাগা এবং রাজ্যের বইয়ের ভাণ্ডার যার হাতের মুঠোয়, তার শিখতে তো দেরী হবে না।

বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় আর আলোচনায় প্রেমের বিশদ বিশ্লেষণ সে শুনেছে এবং সংস্কৃতের পণ্ডিত বাবার কাছে শেখা সংস্কৃতের কল্যাণে মহিলা কবির রচনায় কৌমার-হর নায়কের জন্য ব্যাকুলতার সঙ্গে তা মিলিয়ে নিয়েছে।

সংস্কৃত যুগে মহিলা কবি লিখেছিলেন প্রেমের কবিতা। নায়িকা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সেই প্রেমিকের জন্য যে তার কৌমার্য হরণ করেছে। ভাবতেই স্বয়মের তরুণ মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

রক্ষণশীল বংশের সুশীল ও সুবোধ সন্তান স্কুলে পড়বার সময় বাপ-মায়ের ছায়ায় ঢাকা জীবনে বেশ ভালই ছিল। কি বই পড়বে, কার সঙ্গে মিশবে সবই ছিল ছকে বাঁধা। কিন্তু কলকাতায় মামার বাড়িতে থেকে পড়তে আসার পরেও কি মনের কৌমার্য অক্ষত থাকবে ?

এই ক'দিন আগেও ওরা তিনজন বন্ধু কলেজ থেকে বেরিয়ে স্বাধীনতার আনন্দে সোজা ইডেন গার্ডেনে চলে গিয়েছিল। সেখানে প্যাগোডার নীচে বসে প্রেম সম্বন্ধে কি তুমল আলোচনা।

কারণ, ওদের বন্ধু সরল প্রেমে পড়েছে বলে স্বীকার করেছে।

এবং বন্ধুদের মধ্যে গোপনে দিব্যি দিয়ে বলেছে যে, এটা একেবারেই পৌরাণিক বা প্লেটোনিক নয়। এমন কি বইয়ে পড়া প্রেমও নয়। স্বয়ম্ ওরফে শ্যাম যেসব কাব্যি-মার্কা প্রেমের উচ্ছ্বাস তোতাপাখীর মত মুখস্থ আওড়ায়, সরলের প্রেম মোটেই ওরকম পরস্মৈপদী পদার্থ নয়। একেবারে জলজ্যান্ত একটি তরুণীর সঙ্গে জীবন্ত প্রেম।

যদি সে কবিতা লিখতে পারত তাহলে নিশ্চয়ই বাংলার বায়রন হয়ে উঠতে পারত, একথাও সে ঘোষণা করেছিল।

শুনে স্বয়মেরও মনে হয়েছিল যে, ওরও এখন প্রেমে পড়া উচিত। নিজের দেহের অণু-পরমাণুতে প্রেমে পড়বার জন্য সাড়া জেগেছে। অনুরণন চলছে তার রক্তধারায়, শিরাতে শিরাতে।

কবি লিখেছেন প্রথম প্রেমের উন্মেষের বর্ণনায়—প্রথম কদম ফুল। প্রথম কদম ফুলের শিহরণ জেগেছে দেহের প্রতি রোমে। উৎসুক হয়ে সে সরলের কাহিনীতে কান দিল।

সরল বলছিল, জানিস, আমার মনে হচ্ছিল যেন একটা আশ্চর্য জ্যোতি

এসে পড়েছে আমার মনের ওপর। তার নামটা এখনো না হয় না-ই বললাম। ধরে নে তার নাম—মনু।

গোপীনাথ অন্য সবার চেয়ে বেশী দিন ধরে দাড়ি কামাচ্ছে। ওর নবোদ্ভিন্ন পৌরুষের প্রায় সবুজ আভাসের ওপর মমতা ভরে হাত বোলাতে বোলাতে বিজ্ঞের মত একটা মুখভঙ্গি করল। তারপর টিপ্পনী কাটল, হ্যাঁ, মনু নিয়ে যে নাড়া দিয়েছে, তাকে মনু ডাকনামটা মানাচ্ছে ভাল। এগিয়ে যা রে, ব্রাদার। তোর নির্ঘাৎ হবে।

সরল জোর দিয়ে বলল, হতেই হবে। পাবলিক লাইব্রেরীতে অনেকক্ষণ ধরে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। একটা অদ্ভুত সুন্দর উপস্থিতি। একটা অশরীরী মায়া। আমাদের পণ্ডিত ভায়া হয়তো কালিদাস থেকে শ্লোক আউড়ে দিত। মায়া, না স্বপ্ন, না মতিভ্রম।

বিজ্ঞ গোপীনাথ অনভিজ্ঞ স্বয়মের দিকেই যেন তাকিয়ে বলল, না রে, না। শরীরী কায়া নিশ্চয়ই। তা না হলে বেরথাই পীরিত করতে চলেছিস।

বৃথাই কথাটাকে সে বেশ ভেবেচিন্তে ওজন করে বেরথাই বলে উচ্চারণ করার ফল হাতে-হাতে দেখা গেল।

পীরিত কথাটাও যেন এক ধাক্কায় স্বয়ম্‌কে পুঁথিতে পড়া প্রেমের জগৎ থেকে মাটির সংসারে নামিয়ে আনল। মনোযোগ দিয়ে সে শুনতে লাগল।

এ যেন বৈষ্ণব কবিতার পীরিতির চেয়ে আরো বেশী কাছের ব্যাপার। হাতের মুঠোয় ধরাছোঁয়ার, আঁকড়ে রাখার মত জিনিস।

সরল বলল, না, সত্যি বলছি, ভাই। একটা অশরীরী মায়া যেন রূপ ধরে সিঁড়ি বেয়ে লাইব্রেরীর দোতলা থেকে নেমে এল। আমি একটু আগেই একতলায় নেমে এসে সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছে দাঁড়িয়েছি। যেন ওরই প্রত্যাশায়।

বেশ সবজান্তা গোছের একটু হাসি ঠোঁটের ওপর খেলিয়ে নিয়ে গোপীনাথ বলল, যেন ওরই প্রত্যাশায়? এটা যে একেবারে রবি ঠাকুর মার্কা হয়ে গেল রে, ব্রাদার।

বলেই সে গলায় একটি কাঁপন তুলে হাত দুলিয়ে আবৃত্তি করে নিল—

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হ'তে।

বাব্বা, প্রথম দর্শনে ` এত ?

সরল একটু অপ্রস্তত 'য়ে চুপ করে রইল।

অভিজ্ঞ গোপীনাথ আবা, শুরু করল, শোন ব্রাদার, ওসব অনাদি আর অশরীরীতে এ-যুগে চলবে না। 'াল লেগেছে, বেশ হয়েছে। ভালবেসেছিস মনে করছিস, বেশ করছিস। কিন্তু ভালবাসায় পড়েছিস বলে মনে করিস না। তাহলেই পড়বি গভীর গাড্ডায়। ওস্তাদরা বলে যে, শুধু প্রেমের সায়রে নারায়ণের মত অনন্ত শয়ন করলে আর এ-যুগে চলবে না। একেবারে চাই অমৃত মন্থন। বুঝলি, ভায়া, মানেটা ?

স্বয়মের এত কাঠখোট্টা সাংসারিক হিসাবমাফিক ভাল লাগার কথা ভাল লাগছিল না। ভালবাসার যে ছবি তার কল্পনায় ফুটে আছে তার সঙ্গে গোপীনাথের দৈহিক কারবারের টিপ্পনী মোটেই মেলে না।

স্বয়ম্ এখন বাধা দিল, মনে হচ্ছে, গোপীনাথ, যে তুই সরলকে ভুল বুঝছিস।

সরলও সাহস পেয়ে বলে বসল, আমারও তাই মনে হয়। তুই যা আমাদের বলেছিস তাতে মনে হয় প্রেমের উদয় তোর ওই এঁচোড়ে পাকা মনে এখনো হয়-ই নি। তুই হয়তো নিজেকেই এত ভালবাসিস যে, যাদেব ভালবেসেছিস বলে বলেছিল, তাদের যে কত ভালবাসা দেওয়া উচিত তা-ই বুঝতে পারসিনি। তাই আমাকেও বুঝছিস না।

হাত জোড করে গোপীনাথ বলল, ঘাট হয়েছে বাবা। এখন তোর সেই প্রেমিকার কথাই বল্।

খুশী হয়ে সরল বলল, আমি ওরই প্রত্যাশায় আছি। অথচ কোন কথাও হয়নি। হয়নি কোন চোরা চাহনি বিনিময় পর্যন্ত।

গোপীনাথ ডাইনে-বাঁয়ে মাথা দোলাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ঝাড়ল একখানা মোক্ষম 'নো কনফিডেন্স'।

সরল আহত হলো, 'তার মানে, তুই আমায় বিশ্বাস করছিস না ?'

গোপীনাথ মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, আহা, বিশ্বাস কবছি পুরোপুরি। তবে তোর যে ওই কটাক্ষ বিনিময়টুকু পর্যন্ত না হওয়া, সেটা বিশ্বাস করলাম না। বাবাঃ, দেখেছি অনেক সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ জলজ্যান্ত গোটা মানুষগুলো ডুবে ডুবে জল খেয়ে নেয়, আর তোর ওই উপোসী নয়ন আড়চোখে ডুব সাঁতার কেটেছে তবু—ওরে আমার আকাট

ব্রহ্মচারী—চোরা চাহনি বিনিময় হয়নি এই কথাটা তুই বোঝাতে এসেছিস আমায়? জানিস কলকাতা শহরটা বানপ্রস্থের ডেরা নয়? আর সেকালে পর্যন্ত বনের মধ্যেও বিশ্বামিত্র মেনকা প্রভৃতি থাকত? পীরিতের দাবানলে ছটফট করত।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সরল বলল, হুঁ, ভুল করেছি। ভুলেই গেছলাম যে তুইও একজন পাঁড় প্রেমিক।

৭

পাঁড় প্রেমিক এই স্বীকৃতিতে গোপীনাথ একটু সন্তুষ্ট হলো। আহা, বন্ধুবান্ধবরা ওর প্রেম করবার বিদ্যাটা স্বীকার করুক। সমীহ করে চলুক। তবেই না ওকে যথার্থ সম্মান দেওয়া হবে।

নতুন কলেজে ওঠা ছাত্রদের মধ্যে আর কে এমনভাবে প্রেমের ব্যাপারে বিদ্যাদিগ্‌গজ হতে পেরেছে? এত তাড়াতাড়ি?

আর কে-ই বা এমন সাফ ফতোয়া দিয়েছ যে লক্ষ্মী মেয়েরা লক্ষ্য করার অযোগ্য। দুষ্টু মেয়েরাই প্রেম জাগিয়ে তোলে?

তাই গোপীনাথ খুশী হয়ে বলল, আহা, যাই হোক। চার চোখ যোদ্ধা এক হলো তো সিঁড়ির নীচে এসে? তার পরের কাহিনীটি এবার বলে ফেল। আমরা শুনেই সুখী। শুনেই কনগ্রাচুলেট করব।

স্বয়ম্ নীরবে দুই বন্ধুর শুধু কথা শুনতে শুনতেই নিজের মধ্যে একটা উত্তাপের আভাস অনুভব করতে লাগল। একটা কিসের যেন উন্মাদনা, কিসের জন্য একটা উল্লাস, একটা অতৃপ্তি আর আনন্দে জড়াজড়ি অঙ্গাঙ্গী অনুভব।

এখন স্বয়ম্ মনে মনে ভাবল—বড় আশ্চর্য! ও শুনেই সুখী? সত্যি, এত সুখ যে নিজের মধ্যে আর ধরে রাখা যায় না।

স্বয়ম্ মুখে বলল, পথ দেখিয়ে যা ভায়া। তুই সত্যি সত্যিই মহাজন। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। যারা এত বয়স পর্যন্ত শুধু কেতাবেই প্রেমের কথা পড়ে এসেছে তারা এবার থেকে বেছে নেবে তোর দেখানো পথ।

হ্যাঁ। সরল একটু দম নিয়ে বলল, হ্যাঁ, পথই বটে। একেবারে বন্ধুর পন্থা। বঁধুয়া তো নেমে এল একেবারে যাকে বলে বেপরোয়া। মাথা উঁচু করে, টান টান ভাবে, থুতনিটুকু পর্যন্ত উঁচুতে তুলে ধরা···

গোপীনাথ অধীর হয়ে যোগ করে দিল, যেন চুম্বনের জন্য ব্যাকুল···

সরল বাধা দিল, আঃ থামই না তুই গোপীনাথ। আমার ফিলিংস এসে গিয়েছে আর তুই সেটা নষ্ট করে দিচ্ছিস।

স্বয়ম্ মনে মনে ভাবল, এ যে বড় অপরূপ ফিলিংস। আহা, সরলটা একেবারে লাকি ডগ যদি সত্যি প্রেমে পড়ে থাকে। যদি না…

গোপীনাথ এবার চুপ করে একদৃষ্টিতে সরলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বাহাদুর ছেলে বটে সরল। ও এত চেষ্টা করে রঙ লাগিয়ে বানানো নিজের মিথ্যে প্রেমের গল্পগুলোকে সত্যি সত্যি পেছনে ফেলে একটা সত্যিকারের প্রেম করে নিল মনে হচ্ছে। সাবাস বটে সরল।

মন্নু হনহন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। একেবারে দৃঢ় পদক্ষেপে। নীচে নেমে কোন কথা না বলে সরলের পাশাপাশি দাঁড়াল। দুজনেই আশ্চর্য হয়ে যেন এই প্রথম দুজনকে আবিষ্কার করল।

আশ্চর্য! যেন এর আগে কখনো দেখেনি পরস্পরকে। অনেক লোকের ভিড়ে লাইব্রেরীতে যারা ছিল অপরিচিত তারা হয়ে গেল এক মুহূর্তে পরস্পরের অতিপরিচিত।

ওরা একসঙ্গে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল। সরলের মত অনেক তরুণই তো কলকাতার রাস্তায় গিজগিজ করছে। মন্নুর মত মেয়ে অবশ্য খুব বেশী দেখা যায় না। তবু ওরা দুজনে মিলে যেন আর সবার চেয়ে স্বতন্ত্র।

ওরা কি সব মামুলী কথাবার্তা বলেছিল তাও সরলের মনে নেই। শুধু মনে আছে যে বেশী কথাবার্তা হয়নি। মুখে ভাষা জোগায়নি। বুকে বেশী ভরসা ছিল না। দুজনেই শুধু পাশাপাশি হেঁটে চলেছে।

এমন কি আলতো ভাবে দুজনের হাতের আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি পর্যন্ত সহজে হয়নি। হঠাৎ মনে হয়েছে যেন বিজলীর ধাক্কা লেগে দুজনে আলাদা হয়ে দূরে ছিটকে যাবে।

গোপী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে দিল, ডিরেক্ট কারেন্ট কিনা। এক ঝটকায় স্পর্শের পরেই ছিটকে দেয়।

স্বয়ম্ মনে মনে ভাবতে লাগল,—ভাল করে বুঝতে চাই, বেশ ভাল করে—কেমন করে প্রেমে পড়ে—কেমন করে—। বইয়ের বর্ণনা দিয়ে তো ঠিক মত তার হদিস পাওয়া যায় না। কাব্যের কথা শুধুই কেতাবী।

ভাবতে ভাবতে ওর মনে কথাটা ইংরেজী ভাষাতে ধ্বনিত হয়ে উঠল—'আই ওয়াণ্ট টু গেট দি ফীল অব ইট'। এর অনুভবটা পেতে চাই। শুধু বই পড়ে হয় না। বইয়ের ভাষায় কুলায় না।

গোপীনাথ বলল, আচ্ছা, তোদের দুজনের কোন মন কষাকষি হলো না? মানে, একটু, মানে একটুখানি দুরকম ভিউ, মানে মতদ্বৈধ?

সরল অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল।

মন কষাকষি? হ্যাঁ,—

আমতা আমতা করে গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, মন কষাকষি। মানে, ঠিক তা নয়। এই ধর তুই একটা শক্ত কথা কিছু বলে ফেললি। শক্ত মানে, একটু বেশী আধুনিক আর কি। এই ধর তোর সেই মনু সেকথা শুনে ভাবল যে, তুই একেবারে একটা গোঁয়ার আস্ত অজ, অথবা ধর লক্কা পায়রা অথবা ধর রকফেলার। এদিকে তোর প্রেমের স্পর্শ পেতে পেতে যার ডাকনাম মনু তার নিরালার নাম হয়ে গেল মনুয়া। সে চায় যে ওর বঁধুয়া, আই মিন বন্ধু, হোক একজন ইনটেলেকচুয়াল আর না হয় স্পোর্টসম্যান। তা তোর মধ্যে তার কোনটাই পেল না। ফলে একটু হতাশার ভাব। একটু হয়তো তাচ্ছিল্য। এবং তা সত্ত্বেও ভালবাসা। মনু ঘুরিয়ে জানিয়ে দিল যে সে অন্য দুনিয়ার দিকে নজর রাখে। তুইও তাকে মানিয়ে নিতে কোন চেষ্টা করলি না। তবু দুজনের মধ্যে প্রেম জমে উঠল।

গোপী হাতের নানা রকম মুদ্রা করতে করতে বলল, কবিরা বলেন প্রেম হচ্ছে পুজা। আমিও একমত। যদিও অবিশ্যি স্বয়মের মত কাঁব্যি করি না। আমিও অ্যাডোর দিয়ে শুরু করি। মানে, ইংরেজী ঢঙে অ্যাডোর অর্থাৎ উপাসনা —যতক্ষণ না অ্যাডোরটাকে আদরে টেনে আনতে পারি।

শিক্ষানবীশ সরল হঠাৎ ওর হাত কচলানোর মধ্যে একটা কিছু ইঙ্গিতের সন্ধান পেল।

আর স্বয়ম্ ভাবল—এর মানে হচ্ছে এই যে, প্রথমে হবে হর্ষ, কিন্তু পরিণতিতে হবে স্পর্শ। আর পরিণামে··· ?

মুগ্ধ সরল ফস করে জিজ্ঞেস করল, আর ওটা কি হচ্ছে, বাছাধন?

ওর চোখে চোখ রেখে গোপীও নতুন একটা আইডিয়া পেল—শোন তা হলে। লেখকরা বলে প্রেম হচ্ছে সেই চুম্বক শক্তি যার কাছে নীতি সম্মান সমাজ কোন কিছুরই বাধা আটকাতে পারে না। কিন্তু ওটা লেখকদের ভুল। ওরা ভদ্র কিনা, তাই ভুল করে। চুম্বক শক্তি হচ্ছে চুম্বন শক্তি। সেখানেই শুরু। বুঝলি?

—তোকে বোঝা? সে অনেক তপস্যার ফল, ওস্তাদ। বলই না খুলে ওটা কি হচ্ছিল?

মুখে একটা রহস্যের আভাস এনে গোপী বলল, ওই তো এখনি বললি, বাছাধন। বাছা মানে বৎস, মানে গরু। একটু দুধ দোয়ানো প্র্যাকটিশ করছিলাম।

সরলের মুখ লাল হয়ে উঠল। আর স্বয়মের ছাই।

স্বয়মের বুকও টিপটিপ করতে লাগল। প্রেমের কথা, রসের ইয়ারকি শুনতে লাগে বেশ। কল্পনা করতে লাগে আরও বেশ। কিন্তু গোপী তার শেষ উত্তরের সঙ্গে যে হাতের ভঙ্গী করছিল তাকে ঠিক ভরতনাট্যমের মুদ্রা বলা চলে না। গীতগোবিন্দে অবশ্য আছে—পীনপয়োধর পরিসর-মর্দন চঞ্চল-করযুগ। তাই বলে,…

স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লসের একটা চটকদার কথা ওর মনে পড়ল। ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলার সবচেয়ে উপযুক্ত ভাষা জার্মান। রাজনীতিকদের বেলা ফ্রেঞ্চ, সুন্দরীদের সঙ্গে ইটালিয়ান, মুর্গীদের বেলা ইংরেজী। আর রাজা ও দেবতাদের বেলা স্প্যানিশ।

স্বয়ম্ মনে মনে ভাবল—কিন্তু প্রেমের আর দেবতাদের বেলা ভাষা হওয়া উচিত সংস্কৃত। কালিদাস থেকে জয়দেব কত কামনার লীলাই না অবলীলায় সংস্কৃতে বর্ণনা করেছেন। কামকে করে তুলেছেন কমনীয়।

এদিকে সরল ভরসা করে জিজ্ঞেস করল, মানে তরুণী সুইটহার্টের… ?

রস আর রহস্য দুই-ই চোখের ইশারায় ছড়িয়ে গোপী জবাব দিল, হ্যাঁরে ওল্ড বয়, হ্যাঁ। সুইটহার্ট হচ্ছে স্যালাডের ডিস। তাতে যেমন ড্রেসিং মাখাবি তেমনটিই…

ধৈর্য ধরতে না পেরে সরল প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, তার মানে… তোমাদের ওই…।

গম্ভীরভাবে গোপীনাথ সরলের অব্যক্ত প্রশ্নটা বুঝে নিল।

তারপর গম্ভীরভাবে বিজ্ঞ গোপীনাথ সেই অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করল, শোন বাছাধন, সুইটহার্ট আর বয়ফ্রেণ্ড কত দূর এগোবে তার একটা অলিখিত বিধান—দাস ফার অ্যাণ্ড নো ফার্দার। এতখানি, কিন্তু এর চেয়ে বেশী দূর নয়।

উৎসুকভাবে সরল প্রশ্ন করল, বললি নো ফার্দার, কিন্তু কতদূর সেটা ?

—নো ফার্দার মানে নো ফাদার। অর্থাৎ এতদূর গড়াবি না যাতে বাপ-মার কাছে ছুটতে হয়। বুঝলি, বৎস ? আজকের দিনে এই পর্যন্তই হচ্ছে আধুনিক প্রেমের সীমানা।

একটু থেমে আবার একটি মোক্ষম সদুপদেশ ঝাড়ল, দেখ, পীরিতি হচ্ছে একটা দ্বীপ। ফর টু ওনলি। ভাবোচ্ছ্বাসে ভরা, কিন্তু খরচাতে ঘেরা। যদি বাহাদুর সাঁতারে হোস তো সাঁত্‌রে সেখানে যাতায়াত করতে পারবি। কিন্তু

খবরদার, কখনো ঘর বাঁধবি না। আর না হলে, মনে রাখিস ওরে কলিজায় প্রেমের বীজাণু পোরা কলেজের প্রেমিক, একেবারে যাবি ডুবে।

বাঁধা পড়া আর ডোবা সমান সর্বনেশে।

একটু থেমে বলল, তোর, আমার পক্ষে প্রেমের প্রথম পাঠই হচ্ছে এই। নো থ্যাট, নো খরচা।

ক্লান্ত বিষন্ন কণ্ঠে সরল জিজ্ঞেস করছিল, কিন্তু ওই যে কথাটা আছে নাথিং ভেঞ্চার নাথিং হ্যাভ। কিছুই যদি না খসাতে পারি হৃদয়েশ্বরীকে বসাব কোন্ আসনে?

ওই বাস্তব আর কল্পনা, কথার চাতুরী আর মনের ছলনা মিশিয়ে প্রেমের আলোচনা স্বয়মের নবোদ্ভিন্ন মনে রঙ ধরিয়ে দিচ্ছিল। একটার পর একটা ঘটনা কাঁচা পেয়ারাতে শরতের মায়া ঘেরা রোদের উত্তাপে অলক্ষিতে রঙ ধরিয়ে পাকিয়ে দিচ্ছিল।

সেই সময়ে সে নাট্যমন্দিরে দেখল ষোড়শী নাটকের অভিনয়। আর তার কয়েক দিন পরে উত্তর কলকাতার চোখে বিলেতের হাতছানিতে ছাওয়া সাহেবী বালিগঞ্জে উঠে যাওয়ার কথা।

নাটক দেখতে দেখতে কেবলই উচ্ছৃঙ্খল নায়ক জীবানন্দের পরিবর্তনের, প্রেমের স্পর্শে পরিবর্তনের প্রভাব মনের মধ্যে স্বয়ম্ গভীরভাবে অনুভব করতে লাগল।

বন্ধুরা কি সব দেহমন্দিরে অনুভবের কথা আলোচনা করছিল। তার মধ্যে এই দেহসর্বস্ব জীবানন্দ যে পেয়াদার ডাক নতুন করে পেল তার কোন প্রতিধ্বনি নেই।

জীবানন্দ ষোড়শীকে বলেছিল যে যে পেয়াদাটিকে চোখে দেখা যায় না তাকে শাস্ত্রে নাম দিয়েছে অতনু।

সেই অতনুর প্রভাব স্বয়ম্ নিজের মধ্যে চায়। মন যেন তৈরী হয়ে উঠছে আত্মবিকাশের জন্য। হয়তো আত্মসমর্পণেরও জন্য।

সেই অতনুর আহ্বান যেন কত দূর থেকে ভেসে আসা সাগরসঙ্গীত। হে সাগর, তোমার মধ্যে অবগাহন করতে চাই। গোপন স্বপনচারিণীর সঙ্গীত যে তুমি বয়ে আনছ তোমার কলকল্লোলে।

নতুন পাড়ায় নতুন বাড়িতে এসে সেই স্বপ্নচারিণীকে সে দেখল প্রথম প্রভাতেই। যে সুদূর, যে অধরা থাকবে, তাকে।

দেখে ওই নাটকের কথাগুলিই সে স্মরণ করল মনে মনে,—কে বলে তুমি অচেনা? তুমি চিররহস্যে ঢাকা? জন্মান্তরের সহস্র পরিচয় যে আজ তোমার মুখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তুমিই মোনালিসা।

মনোময়ী সেই কিশোরী। তার হাসির সামনে অনন্তকাল ধরে স্বয়ম্ দাঁড়িয়ে থাকতে পারত।

লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি তো তার মানসীর হাসির সামনে চার বছর ধরে প্রতীক্ষা করেছিলেন। তিলে তিলে নিমেষে নিমেষে সেই হাসির নব নব রহস্য অনুভব করেছিলেন।

অত বড় বিশ্বমুখী প্রতিভার যদি অতদিন লেগে থেকে, হা ভগবান, আমার, যে আমি সাধারণ আমি, প্রেমের কিছু জানি না, হৃদয়ের কোন হদিস জানি না, সেই আমার কতদিন লাগবে এই হাসির রহস্য উন্মোচন করতে?

হায়! গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা? আমার হৃদয় যে আজ অসীম আকাশ হয়ে গেল। তার নীলিমাময় পটে তোমার মুখখানা অরুণরাঙা করে এঁকে রাখব দিনের পর দিন। আপন মনের মাধুরী মিশায়ে।

স্বয়ম্ ভাবছিল আর ভাবছিল।

বন্ধুদের কথা অবশ্যই মনে এসেছিল। কই, সরল তো প্রেমে পড়েছে। কিন্তু তার মনে তো এরকম রঙ লেগেছে বলে মনে হল না।

অবশ্য আমার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। এমন কিছু কল্পনার দৌড়ও নেই। না আছে নিজস্ব মতামত। সরল যেমন সহজভাবে, সাহসী হয়ে মন্টুর দিকে নিজের মনখানা এগিয়ে দিল, কই আমার তো তেমন কোন অনুভূতিই হল না।

স্বয়ম্ ভাবছিল—আমি যেন কি। দুটো দেহ, তরুণ ব্যাকুল জীয়ন্ত দুটো দেহ পাশাপাশি হেঁটে চলেছে, একথা ভাবতেই নিজের দেহটা কেমন সিরসির করে উঠেছিল।

আবার সরল বলেছিল যে আলতো ভাবে দুজনের হাতের আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি পর্যন্ত সহজে হয়নি। তার মানে, শেষ পর্যন্ত হয়েছিল। সে কথা ভাবতেও নিজের মনটা চনমন করে উঠেছিল।

আর এদিকে মক্কেল ব্যক্তি গোপী। কেমন বেশ অভিজ্ঞভাবে বেশ সবজান্তা

মুরুব্বিয়ানা দেখিয়ে সরলের ব্যাপারে টিপ্পনী কেটেছে। শুধু তাই নয়। টিপ্পনী টিপতে টিপতে ব্যাপারটাতে একটা বেশ আমেজ এনে দিয়েছে। জমিয়ে তুলেছে নরম গরম মৌজ সঞ্চার করে। এমনকি আমার—নেহাতই বইয়ের পাতায় প্রেমের সম্বন্ধে বর্ণনাই যার বিদ্যার দৌড়,—সেই আমারও মনে। মক্কেল ব্যক্তি আমাদের গোপীনাথ।

কিন্তু ওকেও আজকের ব্যাপারটা বলা চলবে না।

শুধু স্বয়মের আকাশেই এতদিন কোন নীলিমা ফুটে ওঠেনি। কোন রঙই নয়। আকাশ যতক্ষণ শূন্য তাতে কোন রঙ নেই। নেই কোন মায়া, নেই কোন হাতছানি। কেবল আজ সকালে হঠাৎ কেমন যেন সব বদলে যাচ্ছে।

স্বয়মের মনে হল যেন তার, তার নিজস্ব আকাশ এতদিন যার অপেক্ষা করছিল সে আজ বিনা আহ্বানে, বিনা ব্যাকুলতায় অরুণোদয়ে উষার মত বেদগানের ঝঙ্কারের মধ্য দিয়ে উদয় হল।

বিশ্বসংসারের সব কাব্যই যেন স্বয়মের জন্য রচিত হয়েছিল।

ঋগ্‌বেদের উষার উদয় থেকে তার মন চলে এল শেকসপিয়রের জুলিয়েটের বারান্দায় আগমনের দিকে। রোমিয়ো দেখেছিল জুলিয়েটকে জানলার মধ্য দিয়ে মৃদু আলোতে। বলেছিল যে ওটা পূবদিক আর প্রেয়সী হচ্ছে সবিতা। মিনতি জানিয়েছিল—ওঠো সুন্দর সূর্য, উদয় হও।

কিন্তু স্বয়মের প্রতিবেশিনী উদয় হয়েই মনোমোহিনী হাসির রহস্য আকাশে বিলিয়ে দিয়ে অন্তরালে, কোন অমরাবতীর অন্তরালে বিলীন হয়ে গেছে অন্তরের অন্তস্তলে সে লীন হয়ে থাক। বন্ধুদের একথা বলা ঠিক হবে না।

যদি শেকসপিয়রের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত তাকেও না।

এই গতকাল পর্যন্ত যে জগতে সে নিশ্বাস নিয়েছিল সে জগৎ থেকে যেন সে বেরিয়ে এসেছে। নেই সেই হট্টগোল আর ঠেলাঠেলি। কলকাতাকে এখন আর জনারণ্য মনে হচ্ছে না। শুধু ইটকাঠের অরণ্য নয়। এখানেও যেন দ্রা ভিক্ষির চোখ আর মন থাকলে রঙ আর আলোর মায়ার পরশ পাওয়া যায়।

সেইজন্যই আজ সকাল থেকেই মনে হচ্ছে যে সে এসে পৌছেছে একটা নতুন রকম অরণ্যে। আসলে অরণ্য না বলে উপবন বললেই ঠিক হয়। বইয়ে বনের যে বর্ণনা পড়েছে তা তো আর কলকাতায় মিলবে না।

কিন্তু ছুটিতে শিলং আর দার্জিলিং পাহাড়ে গিয়ে শহরের মধ্যেই যে শ্যামলিমা,

যে প্রশান্তি পেয়েছে তারই তুলনা সে খুঁজে পেয়েছে বালিগঞ্জের এই সাহেবী পাড়ায়।

এখান দিয়ে যখন মোটরে করে হুস হুস করে চলে গিয়েছে অথবা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নতুন কাটা ঢাকুরিয়া লেক দেখতে যাবার পথে এখান দিয়ে ঘুরে গেছে, তখনি মনে হয়েছে এ যেন নতুন একটা দেশ। শহর কলকাতার সঙ্গে এর ঠিক যেন মিল নেই। এটা যেন কলকাতা নয়।

তবে কি লণ্ডন? প্যারিস?

না।

বইয়ে পড়ে আর সিনেমা দেখে সে এটুকু বুঝে নিয়েছে যে মে ফেয়ার আর লভলক প্লেস আর সানি পার্ক বিলেতী নাম অবশ্য। বিলেতের, খাস বিলেতের লোকরাই বেশীর ভাগ এই অঞ্চলে থাকে। তাই এ পাড়াগুলো কলকাতার মধ্যে বিলেত।

কিন্তু বড় কথা—সবচেয়ে মনমাতানো কথা হচ্ছে এই যে, এদিকে এলেই মেলে বিদেশের ইশারা, পশ্চিমের হাতছানি।

মেলে ভীড় আর দারিদ্র্যের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে দিন যাপনের হাত থেকে নিষ্কৃতি।

মেলে অসুন্দরের, আত্মার গ্লানির অহরহ ক্ষুদ্রতা থেকে উপরে উঠে যাওয়ার জন্য মনের ব্যাকুলতা।

মেলে ধুলো আর ধোঁয়াতে ভরা হাওয়া এড়িয়ে, পশ্চিম পবনের মধ্যে একটি দীর্ঘ সুরভিত নিঃশ্বাস নেবার ইচ্ছা।

স্বয়ম্ মনে মনে অনুভব করল যে, সে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, অনেক পরিণত, অনুভবপ্রবণ। এমনকি কাল বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রেম সম্বন্ধে যে সব আলোচনা হয়েছিল তার মধ্যে সে নিজেও একজন নায়ক হতে পারে আজ। রাতারাতি তার জীবনে একটা যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

আশ্চর্য। কাল ওদের আড্ডা শেষ হয়ে যাবার সময় গোপীনাথ ওর অনভিজ্ঞ কানের কাছে গুনগুন করে শুনিয়ে দিয়েছিল: 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল'। তুই এত বোকা আর 'ইনোসেন্ট' যে এর চেয়ে বেশী কিছু আর বললাম না।

শুনে স্বয়মের নিজেরই হৃদয় থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। একটি ফুলের কুঁড়ির উপর মৌমাছি যেন অতি লঘু পদক্ষেপে এসে বসে কলিকে আহ্বান

করে গেল জেগে উঠতে। কলি এখনো বিকশিত হয়ে উঠবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সেই প্রস্তুতির অভাবের জন্য, এখনো সময় হয়নি বলে লজ্জায় ফুলের কলি কেঁপে উঠল যেন।

স্বয়মের মন কালও ছিল সেই কলির মত। আজ অনুকূল পবনে দোলা লাগাতে তা যেন ফুটে এল বলে।

কিন্তু অনুকূল হবে কিনা তারও ঠিক নেই। এই তো আজই দিনের বেলা এই পাড়া আর পাড়ার বাসিন্দাদের সম্বন্ধে কেমন একটা প্রতিকূল আলোচনার ঝড় বয়ে গেল বাড়িতে। শুরু হয়েছিল ক্লার্কবাবুর ঘর থেকে।

আগের দিন ফাইল, কাগজ, দলিল-দস্তাবেজ সব লরী করে এ বাড়িতে চালান হয়ে এসেছিল। সকাল থেকে মুহুরীবাবু ও স্টেনোবাবু একজন বেয়ারা নিয়ে সে সব গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখছেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে লাইব্রেরী ঘরখানা সাজানোর তদারকও করছেন। আসলে লাইব্রেরী ঘরের তদারকীটাই বেশী হচ্ছে।

সায়েব ঠিক নটার সময় এ বাড়িতে সপরিবারে এসে উঠেছেন। এবং এগারটার সময় হয়তো নীচে নেমে এসে কাজ কতদূর গোছানো হয়েছে তা দেখে যাবেন।

সে সময়ে সায়েবের কজন বন্ধুবান্ধবও বাড়িখানা দেখে যাবার জন্য আসবেন।

কাজেই মুহুরীবাবু ও স্টেনোবাবুর ব্যস্ততার অন্ত নেই।

বেয়ারা যুধিষ্ঠির কয়েকটা ব্রীফ একটা তাকে তুলে রাখার জন্য ঝাড়ছিল। ঝাড়তে ঝাড়তে হাঁকল, মুহুরীবাবু, দেখুন তো এগুলো এই তাকে রাখবো না কি ?

মুহুরীবাবু নিরুত্তর।

যুধিষ্ঠির আবার ডাকল। এবার গলাটা আরো চড়া। কিন্তু স্বরটা আরো সরু।

মুহুরীবাবু এতে বেয়াদবীর গন্ধ পেলেন। আর সহ্য করা ঠিক নয়। সময়ে একটা ছুঁচের ফোঁড় দিলে ভবিষ্যতে অনেকটা ছেঁড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

উনি হাঁকলেন, জানিস, যুধে, এটা সায়েব পাড়া।

যুধিষ্ঠিরেরও আঁতে ঘা লাগল। সে পুরোপুরি যুধিষ্ঠির। আধখামচা যুধে হতে তার সত্যিকারের আপত্তি চিরকালই আছে। এবং সে আপত্তি যে যথার্থ তাও এ বাড়ির সবাই সাধারণত মেনে চলে।

আজ নতুন সায়েব পাড়ায় এসে তার আরো কিছু পদবৃদ্ধিই হবার কথা।

এ বাড়িতে আসার দিন কয়েক আগেই ও পাড়ার রাস্তার মোড়ের বিন্দু ঠাকুরের পানের দোকানে সবাই ওকে এ সম্বন্ধে সমঝে দিয়েছিল। অবশ্য ওকে বেয়ারা সায়েব বলে কেউ ডাকবে এতটা ভরসা দেয়নি। তবে সবাই একমত ছিল যে, মুহুরীবাবু আর স্টেনোবাবু এখন থেকে নিশ্চয়ই ওকে মিস্টার বলে ডাকবে।

যুধিষ্ঠির আর মিস্টার দুটো কথা শুনতেও খানিকটা এক রকম। কাজেই কিছুদিনের মধ্যে বাপ-মায়ের দেওয়া যুধিষ্ঠিরের বদলে মিস্টার নামটাই চালু হয়ে যাবার আশা আছে। আর সায়েব বোধহয় এখন থেকে ধুতির বদলে ভাল মার্কিনের পায়জামাও করিয়ে দেবেন।

সে সময় যুধিষ্ঠির একটু মন মেজাজ বুঝে নিবেদন করতে পারলেই পায়জামার বদলে পাৎলুন একেবারে নির্ঘাৎ জুটে যাবে।

বিন্দু ঠাকুর অবশ্য একটু সময়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল, যেন পাণ্টালুন কথাটা সে ঠিকমত বলবার চেষ্টা করে। পাণ্টালুন বড় ভারী কথা। যদি ভুল করে প্যাণ্ট বলে বসে সে তাহলে সায়েব আবার চটে যেতে পারেন। মনে করতে পারেন যে মোড়ের মামলেট কেবিনের হ্যাংলা কারিগরগুলোর মত হাফ প্যাণ্ট চাইছে যুধিষ্ঠির।

তাহলেই সর্বনাশ। তাহলে যুধিষ্ঠিরের আর কোনদিন পাৎলুনে প্রমোশন হবে না। মিস্টার হওয়াও হবে না।

কাজেই মিস্টারের প্রত্যাশায় তৈরী কানে যুধে ডাকটা ঢাকের মত কড়াৎ করে আওয়াজ তুলল যেন।

অতএব যুধে যুদ্ধের জন্য তৈরী হল।

পাৎলুন কেন, পায়জামাও এখনো শ্রী অঙ্গে চড়েনি। তবে সায়েব যখন এ পাড়ায় নিবাস করেছেন পাৎলুন এই এলো বলে। কিন্তু সেটা যতদিন না আসছে ততদিন তো আর যুধিষ্ঠির নিজের পদবৃদ্ধির দিকে অন্ধ হয়ে থাকতে পারে না।

এই সঙ্গে মনিবের পদবৃদ্ধি সে নিজেই করে নিয়েছে। তাই সায়েবের বাড়িকে সে এখন বাসা না বলে নিবাস বলছে।

সে চড়া সুর তুলে বলল, সায়েব পাড়ায় যুধে কাজ করে না। করে মিস্টার।

মুহুরীবাবু অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, হো হো মিস্টার যুধিষ্ঠির। মিস্টার! মিস্টার!

স্টেনোবাবু যেন তার টাইপ মেসিনে কথাটা টাইপ করতে গিয়ে অন্য কিছু ছাপলেন। সোজা হাঁকলেন, মিস্টার নয় হে, মিষ্টান্ন। বুঝলে যুধিষ্ঠির, তুমি মিষ্টান্নর ব্যবস্থা কর। তারপর তোমার আর্জি শোনা যাবে। আগে মিষ্টান্ন, পরে মিস্টার।

মিষ্টান্নের কথায় ঘরের আবহাওয়া একটু শান্ত হলো। যুধিষ্ঠির আর মুহুরীবাবু দুজনেই পরস্পরের দিকে এখনো তেমন খুশী নজরে তাকালেন না। স্টেনোবাবু সেটা লক্ষ্য করলেন। এ অবস্থায় মিষ্টান্নের মিষ্টি প্রত্যাশাটা আরেকটু চালিয়ে যাওয়া দরকার।

তাই বললেন, দেখ হে যুধিষ্ঠির, এ পাড়ায় মোড়ে মোড়ে আসল বাগ-বাজারের রসগোল্লার দোকান তো আর পাওয়া যাবে না। পান তামাকেরও যোগান নেই। কাজেই ওসব আগে থেকে মজুদ রাখার ব্যবস্থা তোমার করে রাখতে হবে। তাহলেই সবাই তোমার উপর খুশী হয়ে ডাকাডাকি করবে। ততক্ষণে র‍্যাকগুলো ঠিক করে ফেল, বাবা যুধিষ্ঠির।

—র‍্যাক, বাবু?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই তাকগুলোই হচ্ছে র‍্যাক। সাহেবী বাড়ি, তার সাহেবী ভাবা।

পায়জামা আর পাৎলুনের পালা তাহলে এগিয়ে এল সত্যি সত্যি।

হাসিতে দুটো গাল কান পর্যন্ত ছড়িয়ে দিল যুধিষ্ঠির।

তারপর সবিনয়ে নিবেদন করল, কিন্তু স্টেনোবাবু, এই আলমারীগুলোর সায়েবী নামটা তাহলে বাৎলে দিন। সাহেবের খাস কামরায় তো দেওয়াল ঠাসা আলমারীতে। ওগুলোও তো আমিই ঝাড়পোঁছ করি।

মুহুরীবাবু মনে মনে চটছিলেন। এতক্ষণে ফিস ফিস করে বললেন, ব্যাটা অলক্ষ্মী এবার সরস্বতীর বরপুত্র হবেন।

প্রমাদ গণলেন স্টেনোবাবু। তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে বললেন, ওই আলমারীর ইংরিজি নাম বলবি আলমিরা, আর বাইরের মাঠটাকে বলবি লন।

যুধিষ্ঠির ততক্ষণে প্রাণপণে আলমিরা শব্দটা তালিম করছে।

স্টেনোবাবুও মনের মত শিষ্য পেয়ে গেছেন। তাড়াতাড়ি যোগ করে দিলেন, আর ওই খেজুর গাছের মত গাছগুলোকে বলে পামমিরা। আলমিরা আর

পালমিরাতে যেন উল্টোপাল্টা করে দিস না আবার। আজই সন্ধ্যের দিকে সায়েব আর মা-ঠাকুরণকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবি লনের কোণায় পালমিরা গাছের ছায়ায় বেতের কুর্সী সাজিয়ে দিবি কিনা। সায়েব তোর ইংরিজীর ঠ্যালায় খুশী হয়ে বকশিশ করে দেবেন। বুঝলি, যুধে?

ইংরেজীর ধাক্কায় মিস্টার যুধিষ্ঠির যে কখন পোষমানা বেড়ালের মত যুধে হয়ে গেল তা সে নিজেই টের পেল না। মাথা নেড়ে আলমিরা আর পালমিরা করতে করতে সে ঝাড়ন হাতে পাশের ঘরে চলে গেল।

সকালে আলমিরা আর বিকেলে পালমিরা—তাহলেই মনে রাখতে সুবিধে হবে। এই ফরমুলাটা মনে মনে তৈরী করতে পেরে যুধিষ্ঠিরের নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না।

ইতিমধ্যে মুহুরীবাবু ও স্টেনোবাবুর মাথাতেও নতুন বুদ্ধি খেলে গেছে।

রামজয়বাবু মুখটা আকাশের দিকে তুলে বললেন, বুঝেছ নবকেষ্ট, ব্যাটা যুধে আমাদের চেয়ে বেশী বুদ্ধি রাখে। ও শালা মিস্টার না হয়ে ছাড়বে না। এখন থেকেই পাঁয়তারা কষছে।

একই লোক যে কি করে রামজয়বাবুর ব্যাটা আর শালা দুই-ই হতে পারে সে প্রশ্নের মধ্যে নবকেষ্ট গেলেন না।

ওঁর নিজের মনেও সায়েব পাড়ার অনুরণন লেগেছে। পদবৃদ্ধি না হোক পয়সা বৃদ্ধিটা তো হওয়া দরকার।

ভেবেচিন্তে নবকেষ্ট বললেন, তা তো বুঝতেই পারছি, রামজয়। তোমাদের দুজনেরই পৌষ মাস পড়েছে। যুধিষ্ঠিরের দস্তারি আর তোমার তহুরি দুটোই এবার বেড়ে যাবে। শুধু বাড়বে না আমার…।

রামজয় তাড়াতাড়ি কথাটার মোড় ঘোরাতে চাইলেন। বললেন, তোমারও হবে ভায়া, তোমারও হবে। ভুলো না যে পাশের বাড়িতেই আছেন ব্যারিস্টার। আর অফিসের হাওয়া…

নবকেষ্ট মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, আর হাওয়া। ব্যারিস্টার সাহেব নিজেই হাওয়া হয়ে যাচ্ছেন বিলেতে। লং ভেকেশনে অর্থাৎ হাইকোর্ট পুজোর অজুহাতে তিন তিন মাস বন্ধ হলে। আমাদের লং ভুখাশন অর্থাৎ অনশন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে। নিয়ে যাচ্ছেন ওঁর মেয়েকেও।

—আরে, মেয়েটা আবার কি পড়বে?

—কেন? এটিকেট। বিশ্বেস না হয় পরশুরামের বই পড়ে দেখ।

যুধিষ্ঠির আর থাকতে পারল না। ভবিষ্যতে মিস্টার এই ডাকনামে প্রমোশন পাবার কথা ভুলে সে জিজ্ঞেস করল, বাবু, এটাকেটা পড়া থাকলে বুঝি জজ ম্যাজেস্টের হয়?

—না রে যুধে, না। এটিকেট পাস করলে কেউকেটা স্বামী পাওয়া যায়। একেবারে নির্ঘাৎ।

—এবং সম্ভবত নিখরচায়। টিপ্পনী কাটলেন রামজয়বাবু।

নবকেষ্টবাবু যুধের সামনে কম ওস্তাদ বা কম ওয়াকিবহাল সাজবেন সেটা অসহ্য। তিনি খুব মুরুব্বিয়ানা দেখিয়ে যোগ দিলেন যে সে পাসটা করবার মোকা নাও মিলতে পারে।

—কেন, এমন কি শক্ত পাস সেটা? যততো সব লাস্ট বেঞ্চির ফেল-মার্কা লক্কা পায়রার দল পর্যন্ত ওখান থেকে ওটা ভাল করেই শিখে আসে। তা আসুক। কিন্তু আজকালকার সবচেয়ে ওস্তাদ প্রজাপতি অফিস হচ্ছে তমসা-তীর্থ। সবচেয়ে 'প্রগ্রেসিভ'। পুরাকালে তমসা তীরে সীতা বিসর্জন হয়েছিল। একালে তমসা তীরে রামের স্বয়ংবর হয়। বুঝলে ভায়া কিছু?

স্বয়ম্ একটু আগেই ঘরে ঢুকেছিল। কান পেতে ব্যারিস্টার কন্যা সম্বন্ধে আলাপ শুনছিল।

সেই কন্যাই যে ওর দৃষ্টিতে আজ ঊষার আলোর মত উদয় হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না তার মনে। সেটা যেন হতেই হবে, সেটা যেন নিয়তি।

স্বয়মের ভাগ্যে একাধারে প্রাপ্তি আর প্রয়াণ দুই-ই।

সে জন্যই তো তার মোনালিসা মাত্র একবার একটুখানি হেসে ঘরের ভিতরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সেই চলে যাওয়াকে সে প্রয়াণ হতে দেবে না। দিতে চায়নি।

অন্তরাত্মা ভেদ করে তার কণ্ঠে একটা মূক আকৃতি জেগে উঠেছিল—যেয়ো না, যেয়ো না। আর একটু দাঁড়াও। আর একটুখানি দেখি।

সেদিন নিয়তি তাকে দাঁড়াতে দেয়নি। আজ রাতেও নিয়তি সেই হাসিটুকু আবার তার সামনে তুলে ধরেছে। রহস্যময়ী সেই হাসি।

—সুইটি বলছি—সরি, স্বাতী বলছি। তুমি আজ নিশ্চয়ই সন্ধ্যাবেলা···

—সন্ধ্যায় তো আমি ব্যস্ত থাকি। কেন, তাও জান। সরি।

—না, সরি নই আমি। আমি খুশী যে তোমার বাঁধাধরা ছকের জীবনে একটা আপসেট এনে দিচ্ছি। সামান্য একটু ওলট-পালট।

—না স্বাতী, অত সহজ নয় আমার জীবন··

বাধা দিয়ে টেলিফোনের ওপার থেকে হাসির তরঙ্গ ভেসে এলো—আরে, দূর ছাই জীবন। জীবনই তোমায় শাসন করবে, যদি তুমি ওটাকে শাসন না কর। আজ সন্ধ্যার জন্য তুমি সে লাগামটা আমার হাতে তুলে দাও। ঊর্দ্ধশ্বাসে গ্যালপ না করাতে পারি নিদেনপক্ষে নাচুনী ছন্দে ক্যাণ্টার করিয়ে ছাড়ব।

স্বয়মের মনে পড়ল স্বাতীর খেদের কথা। ওর বন্ধুবান্ধব আর ওর মাঝখানে এসে গেছে একটা দুস্তর ইংলিশ চ্যানেল। অবশ্যই বিলেতে থাকার কল্যাণে। বেচারী নিঃসঙ্গ। কিন্তু তা বলে সঙ্গী হবে আমার মত বাদলায় মিইয়ে পড়া বিস্কুট?

উপমাটা তো স্বাতীরই দেওয়া।

সেকথা মনে করিয়ে দিতে ওর আত্মসম্মানে বাধল। শুধু বলল, সন্ধ্যে-বেলাটা পড়াশুনোর জন্য আদর্শ···

আরো জোরে হেসে উত্তর ভেসে এলো, আদর্শগুলো বড় সাংঘাতিক। বাস্তবটা অনেক ভাল। কারণ তা ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু খতম করে না। অতএব একটু ক্ষতিই হোক।

তবু স্বয়ম্ একটু ইতস্তত করে আরেকটা আপত্তি তুলল। বলল, প্রায়ই তোমার সঙ্গে ঘুরলে সেটা কি ভাল দেখাবে?

এবার স্বাতী রেগে গেল, হ্যাংগ ইয়োর ভাল দেখানো। এ দেশটা ভাল মেয়েতে ভরা। ওদের সঙ্গে জানাশোনা হওয়াটা মাত্র একটা ভাল মিডল ক্লাস এডুকেশন। তুমি আমার সঙ্গে আজ স্টার ডাস্ট রেস্তোরাঁয় এসো। একজন

খাস ইংরেজ ছাত্র মিলিটারী অফিসার আর একজন ইংলণ্ডে পড়া দেশী ছাত্র এদের ডেকেছি। ওদের সঙ্গে পরিচয় হলে তোমার নতুন একটা এডুকেশন হবে। কোন ওজর শুনছি না।

মিলিটারী ধাঁচের আওয়াজ—যেন বুটের ক্লিক করে আওয়াজ করে ফোনটা বন্ধ হয়ে গেল। অর্থাৎ এই ডাকটা এড়ানো যাবে না।

যে দুজন যুবকের সঙ্গে আলাপ হবে তারা ওর কাছে সম্পূর্ণ অন্য পৃথিবীর লোক। সত্যিই তো এই ব্যাপারে একটা 'এডুকেশন'ও হয়ে যাবে। স্বাতী তো বুঝছে না যে স্বাতীর সঙ্গে পরিচয়টাও স্বয়মের কাছে একটা নতুন ধরনের শিক্ষা।

*　　*　　*　　*

হ্যালো, সুইটি।

হ্যালো সোয়াতী।

কি সৌভাগ্য, তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হল।

হাসিমুখে এগিয়ে এসে স্বাতী করমর্দন করল। প্রথমে ইংরেজটির সঙ্গে, যে ওকে স্বাতী বলে ডেকেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে বলল, তুমি তো আমাদের দেশের অতিথি। সুস্বাগত জানাচ্ছি।

স্বয়ম্ বুঝল যে, যে বন্ধুটি সুইটি বলে ডেকেছে তার মনে যেন না লাগে সেই জন্যই স্বাতী এই ব্যাখ্যাটা করল। তারপর স্বাতী তার সঙ্গে হাত মেলাল। এমন হালকাভাবে যে, তাকে প্রায় এক হাত দিয়ে নমস্কারও বলা চলে।

কিন্তু তিনজনের কলকাকলীর হুল্লোড়ে চারপাশ যেন হঠাৎ এক লাফে জীবন্ত হয়ে উঠল।

স্বয়ম্ ওদের লক্ষ্য করতে লাগল। একজন ইঙ্গ। আরেকজন নামেই বঙ্গ। কিন্তু দুজনেই অন্য একটা পৃথিবীর বাসিন্দা। কোন্ সাত সমুদ্রের ওপার থেকে এসে হাজির হয়েছে। মিলেছে ওদেরই মত রঙীন পাখাওয়ালা এক প্রজাপতির সঙ্গে।

স্বয়ম্‌কে অস্বস্তি বোধ করতে না দিয়ে স্বাতী ওদের সঙ্গে বেশ আবেগ দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল।

মাইকেল রেনল্ডস অব স্কুল অব ইকনমিকস—সংক্ষেপে যাকে সবাই এল. এস. ই. বলে জানে।

রণো সেন—ডিটো।

স্বয়ম্ রায়—ব্রিলিয়্যাণ্ট রিসার্চের ছাত্র—মাই গুড ন্যেবার।

ব্যস, পরিচয় হয়ে গেল। এখন প্রত্যেকেই নিজের নিজের ব্যক্তিত্বের ভেতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ কর।

স্বয়ম্ বিদেশী অতিথিকেই আগে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত মনে করল। তার মিলিটারী পোশাক দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল যে মাইক ন্যাশনাল সার্ভিসে যুদ্ধে যোগ দিয়ে এদেশে এসেছে।

তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল, আপনার এদেশ কেমন লাগছে?

যুদ্ধের কথা কিছু তুলল না।

মাইকেল হেসে বলল, খুব ভাল। খুব। আমি তো পড়ে গেছি লভ অ্যাট ফার্স্ট সাইটেই। প্রথম দর্শনেই।

স্বয়ম্ বলল, সে তো পুরোনো, বহু প্রচলিত কথা। ফিরে যাবার সময়ও যদি প্রেম টেঁকে সেটাই আসল কথা।

হেসে স্বাতী স্বয়ম্‌কে সাবধান করে দিল, মাইক বলছে বলেই ওকে বিশ্বাস করো না কিন্তু। ও কথা বলে র‍্যাডিক্যালের মত, কিন্তু অনুভব করে টোরিদের মত। তোমার মত মনে মুখে এক নয়। অতএব সাবধান।

স্বয়ম্ বুঝতে পারল যে এই পরিচয়ের মধ্যে স্বাতী ওকেই একটু বেশী গুরুত্ব দিল।

সেটা কি স্বাতী ওকে বাকী দুজনের তুলনায় সামাজিক নিক্তিতে ছোট বলে মনে করে বলে? মনে মনে সে একটু অস্বস্তি বোধ কর..! সম্ভবত একটু কঠিন হয়ে উঠল।

কিন্তু না, কঠিন হয়ে কচ্ছেপর মত শক্ত খোলার মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিলে সেটাই হবে হার মানার লক্ষণ। স্কুল অব ইকনমিকস পৃথিবীজোড়া খ্যাতির কলেজ হতে পারে। পরনে থাকতে পারে ক্ষুরধার ইস্ত্রি করা ঝকমকে পোশাক। কিন্তু আমিই বা কম কিসে? অমি কলকাতায় পড়েছি—যেখানে আধুনিক ভারত, দ্বিজেন্দ্রলালের গান অনুকরণ করে বলব, 'মেলিল নেত্র'। আমি নিজের বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত। কাজেই কম কিসে।

আর ওই রণো সেন? নামের ধরন আর পরনের পোশাক থেকেই চেনা যাচ্ছে বড়লোক বাড়ির লক্কা পায়রা। ইনি তো বিলেতে গিয়েছেন সম্ভবত স্রেফ এটিকেট অধ্যয়ন করতে। বড়জোর উড়ে বেড়াতে বেড়াতে মা সরস্বতীর

স্কুলিতে একটু-আধটু ঠোকর মারতে। বিলেতের ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাক্টের ধাক্কা সামলাতে না পেরে বোধহয় দেশে ফিরে এসেছে সুশীল ও সুবোধ সুপুত্তরের মত। যুদ্ধে নাম লেখাবার বা যুদ্ধকালের বেঁচে থাকার কষ্ট সইবার মত পৌরুষ ছিল না নিশ্চয়ই।

বেশ ভাল করে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিল স্বয়ম্।

না, আমি মাথা উঁচু করে অহংকার দেখাব না। আমার বিদ্যা আমায় বিনয় দিয়েছে। অবিদ্যার হাত থেকে আঘাত সহ্য করবার বর্ম দিয়েছে। মায়ের শেখানো সংস্কৃতি হচ্ছে এই।

তা ছাড়া প্রতিবেশিনীর সম্মান জড়িত আছে আমার আচরণ আর মেলা-মেশার ক্ষমতার সঙ্গে। তাকে বিব্রত হতে কিছুতেই দিতে পারি না।

মনে মনে সে একটি ইংরেজি পরিহাস আউড়ে নিল। আজকাল আমাদের সবারই খুব টানাটানি চলছে। শুধু যে জিনিস বিনা খরচায় দিতে পারি তা হচ্ছে মিষ্টি কথা আর ভদ্রতা।

সাগরপারের বন্ধুকে নিয়ে স্বাতী স্বভাবতই একটু বেশী উৎসাহ দেখাল। বলল, জান স্বয়ম্, মাইক অর্থনীতিতে এত ভাল রিসার্চ করছে যে আরো বছর খানেক তা করতে পারলে একটি খুব বড় প্রাইজ পেতে পারত।

উৎসাহ দেখাল স্বয়ম্। সপ্রশংস দৃষ্টিতে বলল, আশা করি—সে সুযোগটা শিগগির ফিরে পাবেন।

কথাবার্তার পর স্বাতী মাইক আর রণোর জন্য ড্রিংকসের অর্ডার দিল আর কোন কথা না বলে স্বয়মের দিকে একটু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। তার সামনে আগে এসে অর্ডার দেওয়া কফির পেয়ালাটা এখনো রয়েছে।

মুহূর্তে সে মন ঠিক করে নিল যে, সে যা আছে তা-ই থাকবে। আমার নিজের মূল্যই কোনদিন আমায় আকর্ষণীয় করে তুলবে, অমূল্য করে তুলবে।

মাইক আর রণো জিন অ্যাণ্ড লাইমের অর্ডার দিল। স্বাতী দিল শেরীর। এবং স্বয়ম্‌কে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, মাই গুড ন্যেবার, এবার কি তুমি তোমার মত বদলাবে? দেখই না একবার মত বদলে।

মাইক খুব মোলায়েমভাবে বলল, অবশ্য আপনার যদি কোন দ্বিধা থাকে, শুধু আমাদের সঙ্গ দেবার জন্যই যে আপনি ড্রিঙ্ক নেবেন তেমন অনুরোধ আমরা করব না।

স্বয়ম্ বলল, দ্বিধা নয়, অভ্যাস আর দরকার নেই বলে। আপনি জানেন

না হয়তো যে স্বাধীন ভারতে আগে মনের আর দৃষ্টিভঙ্গির স্বাধীনতা ছিল। মদ মাংস বা আহার বিহারের বাধানিষেধ তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারত না। আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণে আছে যে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের ভাই ভরতের সৈন্যরা বিশ্রাম করতে এলে তাদের সুরা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। আবার যদি আমরা বাহুবলের আর মনোবলের প্রসার ফিরে পাই সমাজের নিয়ম বদলাবে।

মাইক একবার সোজাসুজি স্বয়মের দিকে তাকাল। ওর সর্বাঙ্গে দৃষ্টি দিয়ে যাচাই করে নিল।

ভাবল—সম্ভবত এর মারফৎ রিয়েল ইণ্ডিয়ার কিছু পরিচয় পেতে পারি। যুদ্ধের দৌলতে যে দেশে এসেছি তাকে শুধু জানতে নয়, যাচাই করে নিতে পারি।

বম্ব্স ওভার বার্লিন—বার্লিনের উপর বিমান হানার অভিযানে সে হাত পাকিয়েছে। উড়ন্ত বেলুনের তারের জালের ব্যূহ বার বার ভেদ করেছে। জার্মান অ্যাক অ্যাক কামানের অজস্র গোলা উপেক্ষা করে বোমা ঝরিয়ে এসেছে। মনে মনে এই ধ্বংসলীলাতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। অথচ সেটা কারণ হিসাবে দেখালে নিষ্কৃতি নেই।

তাই সে নতুন আকাশে অজানা জাপানীদের মোকাবিলা করবার জন্য যেচে রণক্ষেত্রের বদল চেয়ে নিয়েছিল।

মনের মধ্যে ছিল আরো একটা গোপন সাধ। ভারতবর্ষ দেখে আসবে—যে ভারত সমস্ত হানাহানির উর্ধ্বে নিজের আত্মাকে হয়তো এখনো অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

সেই মাইক। ভারতকে যাচাই করতে চায়।

ইতিমধ্যে স্বাতীই মাইককে যাচাই করে দেখছিল। টেবিলের ওপাশে মুখোমুখি তার পরিপূর্ণ যৌবনমূর্তি।

স্বাতীর চোখে ছিল সন্ধানী দীপ, শুধু দৃষ্টি নয়।

আর মাইকের মনে ছিল আগ্রহের আলো, শুধু প্রশ্ন নয়। শুধু পরীক্ষা নয়।

কয়েক মুহূর্ত পরে স্বাতী হেসে উঠল বলল, কি দেখছি জান, মাইক? আজই তোমাকে প্রথম মানুষ হিসাবে দেখছি। এতদিন ইউ ওয়্যার এ স্টাফড শার্ট; দি ক্ল্যাসিক ব্রাইট ইয়ং ম্যান।

মাইক মনে মনে নিজের অতীতকালের মূর্তিটার ওপর যেন চোখ বুলিয়ে

নিজ। নামকরা বৃত্তি পাওয়া ছাত্র, প্রাইজম্যান, একেবারে নিখুঁত ছাত্র বিদ্যায় আর ব্যবহারে। আদর্শ চিরাচরিত ইংরেজ ছাত্র যদি দেখতে চাও তো মাইকের সামনে দাঁড়াও।

হ্যারলড লাস্কির মুট কোর্টে তর্কের নকল আদালতে বিদ্যার পরীক্ষায় সে এই পৃথিবীজোড়া খ্যাতিমান গুরুকে অভিযুক্ত করেছিল যে, তিনি বুদ্ধিজীবীদের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছেন। তার তর্কের মনীষার ছটা স্বয়ং গুরুকে আনন্দে অভিভূত করেছিল।

কিন্তু কোন সহপাঠিনী অভিভূত করতে পারেনি কখনো। ছাত্রছাত্রীদের মিলিত কমনরুমে বা রিফেকটরি অর্থাৎ খাবার ঘরেও সে তার বিদ্যার আভিজাত্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল।

সেই মাইকও তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর বিদ্যাচর্চা পিছনে ফেলে রেখে দেশের ডাকে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। বিদেশে এসেছে। বিদ্যার দৌলতে যার মাথা আকাশে উঁচু হয়ে থাকত সে আকাশে উড়ে যুদ্ধ করা শিখেছে। আজ তার মধ্যে সেই ক্লাসিক ব্রাইট ইয়ং ম্যানের চেহারা প্রায় ঢাকা পড়ে এসেছে। সামরিক পোশাকই এখন সুধী ছাত্রের একমাত্র পরিচয়।

তার জগৎ একটা যুদ্ধের ছোঁয়াচে একেবারে বদলে গিয়েছে। বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রতিবাদে সে এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। দেশ যে সবার উপরে।

স্বাতীর প্রশ্নে সে এখন হেসে বলল, সত্যিই কি আমি কোনদিন তাই ছিলাম? আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

স্বাতী মাথায় দেশী তেল মাখা কবে যে ছেড়ে দিয়েছিল তা তারও মনে নেই। মাথারও মনে নেই। ঘোড়া রঙের থুড়ি, প্রায় চেসটনাট রঙের চুলের ঝালরে ঢাকা ঘাড় দোলাল স্বাতী।

তার পর মুখে একখানা অপরূপ হাসি ফুটিয়ে তুলল। তার আধখানা বিলিয়ে দিল মাইকের দিকে। আর বাকী আধখানা অন্য কাউকে।

যে কুড়িয়ে নিতে জানে তাকে।

রণো সেনকে? অবশ্য রণো তাই ভেবে নিল। স্বয়ম্‌কে সে ধরে নিয়েছিল একটা শুধুমাত্র 'কিড' নয়, নিরেট একটা 'ক্যাড'। শুধু ছাগলছানা নয়, বিরাট গবেট।

অতএব স্বয়ম্ হচ্ছে আউট।

স্বাতী সেই হাসিটুকুর সঙ্গে আলো ছড়িয়ে বলল, আমাদের আবেগভরা মুহূর্তটি—থুড়ি, আমার আবেগভরা মুহূর্তটির কথা আমি প্রায় ভুলে এসেছিলাম। তোমার ওই মিলিটারী সাজে আবার সেটা মনে করিয়ে দিলে। তার জন্তে তোমার কি শাস্তি পাওয়া উচিত, মাইক ডার্লিং ?

স্বয়ম্ সেই কলকাতার হেমন্তের রাতে চেয়ারে বসেই ঘামতে লাগল। আবেগভরা মুহূর্ত ! সেটাকে আবার মনে করিয়ে দেওয়া ? তার রেশ টেনে এই সাত হাজার মাইল দূরে ডার্লিংকে সাজা দেওয়া ?

পাড়ার মেয়ে। প্রতিবেশিনী। মোনালিসার মত যে রহস্তমধুর ভাবে হাসে। যার হাসি দেবদূতের মত পাখা মেলে ওর মনকে তুলে নিয়ে গেছে কোন অসীম নীল আকাশের অধরা রঙীন আবেশে। যে তার অমল ধবল পালে শুধু মন্দমধুর হাসিপরিহাসের হাওয়া লাগিয়েছে।

অনেক ভারতীয় ছাত্র ইয়োরোপে গিয়ে উড়ে বেড়ায়। তার একটা রোমান্টিক সমর্থনও সে পড়েছে 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। 'ইয়োরোপা'র ধারাবাহিক বর্ণনায়। তবে অন্তত পাশের বাড়ির মেয়ে তা করেনি এহেন একটি আশা সে মনের ভিতর লালন করেছিল। ব্যারিস্টার সাহেবের মেয়ে হলেও করেনি।

তমসা তীর্থে গেলেই কি সবাই তামসিক হয়ে যায় না কি ?

পরক্ষণেই স্বয়ম্ নিজেকে সমঝিয়ে নিল। স্বাধীন দেশের সহজ পরিবেশে গেলে প্রাচীন স্বাধীন ভারতের সংস্কৃত যুগের সংস্কারমুক্ত মনটাও বোধহয় ফিরে আসে নিজে থেকে।

মাইক কিন্তু মোটেই স্বয়মের মত ঘেমে ওঠেনি। হেসে উঠেছে।

বলেছে, বাঃ। এদিকে যে আমার আবেগময় মুহূর্তের আশাটাকে তুমি শেষ করে দিয়ে বসে আছ। অজন্তার এত সব মনোহারিণী মূর্তির প্রিন্টগুলির স্বপ্ন দেখতে দেখতে মিলিটারী ট্রুপশিপে ভেসে এলাম তোমার বন্দরে। আর তুমি কি না ··

স্বাতী বাধা দিল, হোয়াই অজন্তা ? লণ্ডনে স্ট্র্যাণ্ডে অক্সফোর্ড স্ট্রীটে শাড়ির বাহার দেখেই তো তোমরা মূর্ছা যাও

—তা যেতাম এই আশায় যে হট-হাউসে কাঁচের ঘেরাটোপে যে গোলাপ দেখছি বসরাই বাগিচায় তাকে তার নিজস্ব পরিবেশে আর এক শোভায় দেখতে পাব। মোট কথা 'এল এস ই'-তে তোমায় একা পাওয়াই যেত না

কখনো। সব সময় মহারানীর সঙ্গে গুটিকয়েক বডিগার্ড। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে এ ডি সি মনে করাই উচিত। নিদেনপক্ষে ডানপিটে স্মার্টপরা পাহারাদারণীর দল।

একটু থেমে মাইক বলল, কতবার কমনরুমে ওয়েডনেসডে টি-ড্যান্সে তোমার সঙ্গে নাচতে চেষ্টা করেছি। কয়েকবার অন্যান্যদের ফাঁকি দিয়ে 'কাট ইন' করে তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু মিনিট খানেক আর পাঁচ সেকেণ্ডের বেশী কখনো মোকা পেলাম না। আর এখন তুমি বলছ আবেগভরা মুহূর্ত।

দুষ্টুমি ভরা হাসি হেসে মাইক বলল, সেটা বোধহয় তোমাদের মিষ্টিরিয়াস ইস্টের মিষ্টিরসে মেশানো। তার একটু নমুনা এবার চাখতে পারব আশা করছি।

রণো খুব সমঝদার ভঙ্গিতে শুনতে লাগল। মুখে ব্রায়ার কাঠের বাঁকানো একটা পাইপ ত্রিভঙ্গ ধাঁচে বসিয়ে ঠোঁটের কোণা দিয়ে ফিনকি ফিনকি হাসি ছড়াতে আরম্ভ করল।

কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের ক্লাশে 'উপমা কালিদাসস্য' মকস-করা ছাত্র স্বয়ম্। সেই হাসি দেখে সে মনে করল যেন ধানখেতের আলের কয়েকটি জায়গা কেটে দেওয়া হয়েছে। তাদের ফাঁকে ফাঁকে খেতের জমানো জল ফিনকি ফিনকি বেরিয়ে যাচ্ছে।

স্বাতী মোটেই ঘাবড়াল না। ডান কাঁধটা কুঁচকে এনে মাইকের দিকে তাকাল।

একটু হালকা তাচ্ছিল্যের অভিনয় করে টিপ্পনী কাটল, কি আর বলি, বল? তুমি একটুও ড্রিঙ্ক করতে না। হতাশ হয়ে দেখলাম যে, সিগারেটও খাও না। যাদের সঙ্গে নাচো, মানে যারা কলেজের টি-ড্যান্সের সময় তোমার ভাল ছেলে মার্কা তকমা দেখে নাচের জন্য এগিয়ে আসে, তাদের ভাল করে স্পর্শ পর্যন্ত কর না। তুমি সেই তরুণ নও যার কঠোর পরশে একজন সহপাঠিনী দশ লহমাতে কাঁপতে কাঁপতে খান-খান হয়ে যাবে। তোমার প্রতি আবেগ এমনকি 'কাফ লাভ' অনুভব করবে তার কোন পথ পর্যন্ত ছিল না।

এবার স্বাতী দুষ্টুমি ভরা হাসি হেসে বলল, তোমার প্রতি দুর্বলতা দেখানো মেয়েদের আত্মসম্মানে আঘাত করতে পারত। হিন্দুশাস্ত্রে বলে আকাট ব্রহ্মচারী।

মাইক মিষ্টি হাসি হেসে মন্তব্য করল, শকুন্তলার জন্মকাহিনী আমি পড়িনি বলে মনে করো না, সোয়াতি। হায়, কোন মেনকা আমার কাছে আসেনি।

ঠাট্টায় হেরে গিয়ে স্বাতী একটা সিগারেট ধরাল খুব ক্ষিপ্র হাতে। যাতে সঙ্গীরা কেউ দেশলাই ধরাবার সুযোগটুকুও না পায়। তারপর নিজের মনে ধোঁয়ার শিকলি তৈরী করে শূন্যে ওড়াতে লাগল। যেন কিছুই হয়নি।

পরাজয় ওকে ছুঁতে পারল না। মিলিটারী অস্ত্র আর পোশাক পরা প্যারাট্রুপ এক্সপিডিশনের দলপতি স্বয়ম্ প্লেনে বসে স্মৃতিচারণ করতে করতে চকিতে ভাবল যুদ্ধের শাস্ত্রে স্ট্রাটেজিক রিট্রিট একেই বলে।

১০

স্বয়ম্ ততক্ষণে মাইকের প্রতি একটা বিচিত্র আকর্ষণ অনুভব করতে আরম্ভ করেছে।

এদেশে পড়ুয়া ভাল ছাত্র শুধু সুশীল ও সুবোধ বালক হয়েই থেকে যায়। তার বাইরের জীবনে পা বাড়ায় না। তার জন্য না পায় সাহস, না উৎসাহ। না সহযোগ। হঠাৎ একটা দিশেহারা অবস্থায় পড়লে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। অসহায় হয়ে যায়।

সে হচ্ছে আজীবন দণ্ডকবনে লক্ষ্মণের গণ্ডী বাঁধা ছকের মধ্যে সীতা।

এদিকে মাইককে দেখ। ওর বুকের ডোরাকাটা রঙীন ফিতে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এরই মধ্যে ও ডিসটিনগুইশড ফ্লাইং ক্রস ডি এফ. সি নামে পুরস্কার পেয়েছে। বিমান বাহিনীতে বিশেষ বীরত্বের জন্য।

কিন্তু সেই পুরস্কার ওর বুকে চড়েছে ; মাথায় নয়।

অথচ জীবনকে ও যে সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পারে তার প্রমাণ এই সন্ধ্যায় ওর হাসিঠাট্টার ব্যবহার। জীবনের সহজ স্বচ্ছ মুহূর্তগুলির উচ্ছলতা আর নিবিড়তা ও দু হাতে অঞ্জলি ভরে পান করছে।

কিন্তু ওর বোমারু বিমানের অন্ধকারে এই সরল হাসিমাখা মুখটি কি সহসা শ্রান্ত বিরক্ত বিবর্ণ মরণের আর মারণের কালো ছায়ায় ভরে ওঠে ? না। তবু সে মাইক রোনাল্ডসই থাকে।

আর আমরা ? বাঙালী ছেলেরা ? পুরুষানুক্রমে থোড় বড়ি খাড়ার চর্চা করে চলেছি। নিশ্চিন্ত না হয়েও নিশ্চেষ্ট হয়ে জানা পথেই আনাগোনা করছি।

যুদ্ধ বেধেছে, তাতে কি যায় আসে ? জিনিসপত্রের দাম আগুন। কিন্তু যাদের সামর্থ্য আছে তারা পাচ্ছে ঠিকই। খাচ্ছে ঠিকই। দুর্ভিক্ষে লোক ঝেঁটিয়ে চলে এসেছে শহরে। মরছে রাস্তার দুধারে।

কিন্তু বাড়ির ভিতরে আমাদের মত লোকের মনের ভিতটা তোলপাড় করছে না। মোটামুটি সইয়ে নিয়ে শান্ত হয়ে আছে।

মাথার উপর শত্রুর আক্রমণের ভয় যখন-তখন। কিন্তু দেশরক্ষা করার জন্য খাটুক অন্য লোক। বিদেশী মনিবের মাইনে করা লোক আছে, মিতারা আছে। তারাই দেশটাকে জমিদারী জ্ঞান করে বাঁচাবে।

আর সবারই কিছু করণীয় আছে। অথবা অন্য কোন আকর্ষণ। শুধু আমাদেরই যেন নেই কিছু।

স্বয়ম্ একবার তাকাল মাইকের দিকে।

আরেক বার রণোর দিকে।

এই তো রণোও বেশ আছে। বিলেতে জার্মানদের বোমার ঠেলায় এত বছর বাদে সে দেশে এসে উঠেছে। কিন্তু ওর মনের অবস্থা আর দিন কাটানোর ব্যবস্থা বোধহয় বিলেতী মহা মডার্ন স্বাধীনা তরুণীদের মত।

একটি বিলেতী তরুণীর বিয়ের খবর হাই সোসাইটির খবরে প্রকাশ পাওয়া মাত্র বাড়ির দালাল চেপে ধরল। কিস্তিবন্দী হারে একটা বাড়ি কিনে বিয়ের উৎসবটা করুন। বড় পত্রিকায় নাম উঠে যাবে।

তরুণী মিঠে হেসে বললেন, আমার বাড়ি? হোমে আমার কি দরকার? নার্সিং হোমে জন্মেছি, কলেজের হোস্টলে থেকেছি, অটোতে সেঁটে বসে কোর্টেড হয়েছি। প্রেম পেয়েছি। খাই আমি টিনের ক্যান আর কাগজের কার্টন থেকে। সকালটা কাটে গলফ কোর্সে, বিকেলটা ব্রিজ টেবিলে আর সন্ধ্যাটা ক্লাবে সিনেমায়। সংসার আর সমাজের ঝামেলা আমার জন্যে নয়। অতএব কেটে পড়, বাছা।

এই বলে তরুণী মিষ্টি হাসিটুকু দালালের দক্ষিণা দিল।

রণোর মুখেও যেন তেমনি একটা মিষ্টি হাসির হরির লুট চলেছে।

বহু লোক জাপানী বোমার ভয়ে গাঁয়ে জঙ্গলে আঘাটায় আস্তানা নিয়েছে। কিন্তু রণোর দল শহরে ঠিক টিঁকে আছে। গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিতে হয়নি। জাপানীকেও রুখতে যেতে হবে না। ওর বিলেতে যাওয়া আর থাকার খরচ কোন হিসাবেই উশুল হবে না।

আবার দেখ মাইককে। অজানা দেশে অচেনা জাতের শত্রুর বিরুদ্ধে সে লড়তে এসেছে। হয়তো জাতির জমিদারী রক্ষা করার নিছক স্বার্থেরই খাতিরে। তবু ওর দিক থেকে সেটাও তো একটা কর্তব্য। বর্মার জঙ্গলে যদি ধরা বা মারা পড়ে নেক্সট অব কিনের কাছে সে খবরটা সময়ে পৌছাবে না পর্যন্ত।

স্বয়ম্ নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করল। এইসব চিন্তা আর বিশ্লেষণ করবার প্রচুর সময় সে পাবে। এখন সে নিমন্ত্রিত অতিথি। অন্য দুজন অতিথির মধ্যে বসেছে। আর এমন একজনের নিমন্ত্রিত যে বলেছে জীবনকে খুঁজে নাও। একটুখানি বাঁচো।

এত বিচার বিশ্লেষণ নিয়ে বাঁচা চলে না।

এমন সময় স্বাতীই তার দিকে তাকাল। তার বাঁকা আঁকা ভুরুর তলায় চোখ দুটি তারার মত দীপ্ত। যেন সুদূর দৃষ্টি দিয়ে বলছে—তুমি একটি শিশু। ওহ্ গড, হোয়াট এ বেবী।

হঠাৎ আলোগুলি কমতে কমতে প্রায় চোখ বুঁজে ফেলল। শুধু ছাদ থেকে একটা প্রকাণ্ড আলোর গোলা কাঁচের অজস্র ফুটোর ভেতর দিয়ে মিটমিট করতে করতে নেমে এল। প্রেমিক প্রেমিকা বা ক্ষণিক ক্ষণিকাদের প্রতি সহানুভূতি দেখ'তে। তাদের সহজ সুযোগ দিতে।

আলোতে খচিত বৃত্তটা ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগল আর মৃদু সন্ধ্যার আলো তৈরী করে তাতে রামধনুর রঙ ছিটোতে লাগল।

যারা শীঘ্রই ফ্রণ্টে চলে যাবে বা ফ্রণ্ট থেকে ক'দিনের ছুটিতে এসেছে তাদের যেন একটু হালকা করে একটু চাঙ্গা করে দিতে পারে। মরবার আগে ওরা যেন একটুখানি বাঁচার সুখ পেয়ে যায়।

স্বয়ম্ বুঝতে পারল যে সামনের অর্কেস্ট্রা একটা ট্যাঙ্গোর মাতাল ঝঙ্কার তুলছে। রক্তে একটা আবেশ জাগছে। এহেন উত্তাপই কি স্বাতী তার সেই হাসিঠাট্টা করে উল্লেখ করা আবেগভরা মুহূর্তে অনুভব করে থাকে ?

এই তো এখানে শুধু উত্তাপভরা সঙ্গীত আর উন্মাদনা জাগানো সুরা নয়, মাতাল করা নাচ আর আদিম আকর্ষণের নেশা সমস্ত আবহাওয়াটাকে জড়িয়ে রেখেছে।

এইজন্যই তো ঝাঁকে ঝাঁকে মিলিটারী আর পসারিণী ভদ্রতার মুখোশ পরে এখানে রাত বাড়লেই হাজির হয়। ততক্ষণে স্বাতী আর রণোর মত নিরামিষ স্ফূর্তির সন্ধানীরা উধাও হয়ে যায়। আউট অব বাউণ্ডস তখন তাদের জন্য।

সেই আলোর ফুটকিগুলি যার মাথার উপর স্থির হয়ে মুকুটের মত ঝুলতে লাগল তার দিকে তখন সবারই দৃষ্টি পড়ল। পেঁয়াজ রঙা ব্লণ্ড চুলের ফাঁপানো চূড়া। তার নীচে গভীর কালো আর ধনুকের মত টানা দুটি চোখের ভুরু।

চোখ দু'খানা বরফের মত হালকা নীল। ঠোঁট দু'খানা পরিপূর্ণ, পরিপক্ক আর বাঁধুলী ফুলের মত রাঙা। চোয়াল উঁচু আর ডালিমভাঙা গাল দুটিতে মাদকতাময় ছায়া পড়েছে। নাকটি যেন লুভর মিউজিয়ামে রাখা কোন মর্মর মূর্তির প্রতিলিপি।

স্বয়ম্ নির্নিমেষে দেখতে লাগল। রূপ, রূপরতন যদি কিছু কবির কল্পনায় থেকে থাকে তা বুঝি এই। যে রূপ লাগি আঁখি ঝুরে তা বুঝি এই।

দেখতে দেখতে স্বয়মের অন্তরিন্দ্রিয় যেন রূপসায়রের গভীরে ডুব দিল। সে খেয়ালও করল না যে কখন সেই বরতনু সব ফ্যাশন আর ছলনা ছেড়ে দিয়ে, বসনের শাসন থেকে বেরিয়ে এসেছে। নিজেকে প্রায় পুরোপুরি খুলে ধরেছে। মেলে দিয়েছে।

কমনীয়া কামনীয়াতে রূপ নিয়েছে।

সাহিত্যের ভিতর দিয়ে স্বয়ম্ সুন্দরের পূজারী হয়েছে। এখন নাচঘরের আঙিনায় রঙীন আলোর রেখায় রেখায় দেহের আরতি দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে ইন্দ্রিয় পরিণত হলো অতীন্দ্রিয়ে, ভোগ প্রণত হলো যোগে তার ব্যাখ্যা সে করতে পারবে না।

নিজের মনকে বোঝাল যে সব জিনিসের তো ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণও খুঁজে পাওয়া যায় না। খোঁজা উচিতও নয়।

হঠাৎ অর্কেস্ট্রার ঝঙ্কার তাকে সচকিত করে তুলল। সে দেখল যে দেহের লাস্য আর বাজনার মাদকতা অনেক যুগলকে পাগল করে তুলেছে। ইন্দ্রিয়-সচেতন হয়ে তালে তালে দুটি করে দেহ মোহভরে কেমন যেন এক হয়ে যাচ্ছে। যারা নাচছিল না তারাও শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।

কামনার কাঁচা রঙে তাদের মন রাঙানো। বাজনা আর নাচের তালে তালে যারা শুধু টেবিলের ধারে ধারে বসে আছে তারাও উত্তাল। কেবল এদের টেবিলে পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখার আনন্দে এরা একটু আত্মস্থ হয়ে আছে।

স্বাতীর অধরোষ্ঠে ধরা জাফরানী রঙের স্বচ্ছ সিগারেট হোল্ডারটা যেন আর সব রঙকে ম্লান করে দিচ্ছে।

সে ব্যাগ থেকে খুলে একটি সিগারেট কেস বের করল। তার এক কোণায় ম্যানিকিওর করে রাঙানো নখের একটু হালকা চাপ দিতেই একটা সিগারেট বের হয়ে এল।

যেন মিলিটারী কম্যাণ্ড শুনে তড়াক করে লাফিয়ে সেলাম করে নিবেদন করছে—অ্যাট ইয়োর সার্ভিস, ইয়োর একসেলেন্সি।

ওরা চারজনই সাময়িকভাবে চুপচাপ। স্বয়ম্ শুধু নীরব নয়, নিমগ্ন নিজের মনে।

সে ভাবতে লাগল, একি অপরূপ ব্যক্তিত্ব এই তরুণীর। সে হাসলে মুক্তা ঝরে, আর সবাই তা কুড়িয়ে নিয়ে ঐশ্বর্যবান হয়। সে নীরব হলে সবাই আত্মস্থ হয়।

হঠাৎ একটা খুব চেনা গানের সুর শুনে স্বাতী খুশী হয়ে উঠল। স্টর্মি ওয়েদার, ঝড়ো আবহাওয়া। অতীতের সুখস্মৃতি আর বর্তমানের বিষাদ মিশিয়ে গায়িকার প্রিয়ের সঙ্গে উৎসব রজনী কাটানোর গান। গায়িকা এখন রিক্তা, পরিত্যক্তা, একাকিনী, বিরহিণী। আজ হচ্ছে ঝড়ো আবহাওয়াতে আশাহতার রাত।

এই গানের ঢেউ আমেরিকা থেকে এদেশেও এসে পৌঁছেছে। এমনকি দেশী মহলেও—যারা সামান্য একটু আধটু ইংরেজি গান আর নাচের বাজনা পছন্দ করে—তাদের মধ্যেও এই হিট মিউজিক প্রচুর সাড়া তুলেছে।

কাজেই স্বয়ম্‌ও এটা শুনে ভাবের গভীরে চলে গেল। তবু সে ভাবতে শুরু করল—সেই বিগত রজনী নয়। আমি, নতুন আমি, ভাবছি আজি যে রজনী যায় তাকে ধরে রাখি কেমন করে?

স্বাতী যে খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে তা মাইকেরও নজরে পড়েছিল। আসলে সে এত নাচগানের মধ্যে এই সময়টুকু চুপ করে থাকার ফলে ভিতর ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছিল। স্বাতীর ঠাট্টাটুকু সে হজম করে গেলে কোন ক্ষতি হতো না। ওর নিজের তো নিশ্চয়ই না। নিক্তিতে ওজন করা ভাল পড়ুয়া ছাত্র হলেও না।

ওর মনে পড়ল যেদিন সে সেনাদলে নাম লেখাল সেদিন এল. এস ই.র সহপাঠীরা ঠাট্টা করে বলেছিল যে মাইক এখন খুব ভাল স্বামী হবার শিক্ষা পেয়ে যাবে।

সেনাদলে নিজের রান্না, বিছানা, সেলাই সব কিছু নিজের হাতে করতে হয়। আর সবচেয়ে বড় কথা, হুকুম নেওয়া আর বিনা বাক্যব্যয়ে তামিল করা অভ্যাস করতে হয়।

বলা বাহুল্য সহপাঠিনীরা সবাই চোখে ঝিলিক আর মুখে হাসি হেনে এই ভবিষ্যদ্বাণী সমর্থন করেছিল।

রণোর ক্ষতির তো কথাই ওঠে না। বরং ও এই আবেগময় মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে তার আরেকটা মহড়া দেওয়া যায় কিনা তার সুযোগ খুঁজত।

আর সামনের ওই ভালোমানুষ মার্কাটি হয়তো একটু শকড হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ওরই বা এমন কি লোকসান হতো? রণো ভাবল সুইটি নিশ্চয়ই ওর সুইটহার্ট নয়। অসম্ভব। সুইটির বয়ফ্রেণ্ড হবার মত, তাকে নিয়মিত নাচঘরে পার্টিতে ক্লাবে সঙ্গী হয়ে নিয়ে যাবার মত ওর না আছে মুরোদ, না মদত।

মনের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে তফাত যোগাড় করবার জন্য সে মাইককে বলল, জান মাইক, তুমি যদি একবার জার্মানীর ডুসেলডর্ফ শহরটা জয় করে আসতে।

মাইক হেসে বলল, ও. কে. বস্। কিন্তু অর্ডার অব দি ডে-তে কারণটা জানাতে হবে। অবশ্য কনফিডেন্সিয়ালি।

রণো বলল, ওখানে টাউন হলের খানা কামরার মাথায় লেখা আছে:—

পুরপিতা, মহানন্দে শুরু কর সুরা।
প্রদীপ জ্বলে না ভাল বিনা তৈলধারা।

এই মহান্ শিক্ষাটা গ্রহণ করে আমরাও প্রদীপ জ্বালাতে চাই।

বলেই সে যেন প্রদীপ জ্বালাতেই উঠে পড়ল। সামনের দিকে ঝুঁকে সে স্বাতীর সঙ্গে এই নাচটা নাচবার অনুমতি চাইল।

সে বলল, তুমি তো জান, হিটলার এই নাচটা জার্মানীতে মানা করে দিয়েছে। স্টর্মি ওয়েদারের বাজনা নাকি লোককে নেতিয়ে দেয়, যুদ্ধ-বিমুখ করে তোলে। কিন্তু আমরা দেখিয়ে দেব যে জার্মানদের চেয়ে বেশী খাঁটি আর্য আমরা নিগ্রোর গাওয়া গানটার সঙ্গে নেচেও চাঙ্গা থাকতে পারি।

একেবারে নাৎসী ধাঁচের হঠাৎ হামলা। ব্লিৎসক্রীগ যাকে বলে।

স্বাতী রাজী না অরাজী তা জানবার আগেই সে উঠে গিয়ে হেসে তার দিকে হাত বাড়াল। এমন ভাবে যে তাকে না করা যায় বারণ, না নিবারণ।

স্বাতী তাই উঠে পড়ল। তার পর—দু'জনে নৃত্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। ঝড়ো আবহাওয়া সুরের হাওয়ায় কিশোর সুন্দর ও মধুর হয়ে উঠল।

স্বয়ম্ দেখতে লাগল। অপরূপার আরতি করবার মত নৈবেদ্য যদি তার নিজের থাকত। যদি…যদি…

দেখতে দেখতে অনুমান করতে লাগল ওরা নাচতে নাচতে কি কথা না

জানি বলছে। পুরানো সহপাঠী সহপাঠিনী। ওই সুদূর বিলেত দেশের স্বাধীন সমাজ। সেখানে যুগ.ল যখন দক্ষিণ দেশের সাম্বা নৃত্য নাচে হৃদয় তখন সামলাতে পারে না।

সেখানে কলেজে বই পড়. .থকে প্রেমে পড়া দুই-ই সমান সহজে সম্ভব।

দূর থেকে একবার স্বয়মের মনে হলো যে স্বাতী ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

কেন হাসছে ? এটা কি হাসি, না উপহাস ? তৃপ্তির হাসি, না তাচ্ছিল্যের ? কেমন যেন বিচিত্র একটা মুখভঙ্গিমা।

মোনালিসার ছবির প্রতিলিপির সামনে স্বয়ম্ অনেক সময় কাটিয়েছে অনেকদিন। সেই হাসির পাঠোদ্ধার করতে পারেনি। পারেনি বলেই বেশী মোহিনী মনে হয়েছে সে হাসিকে। যত সুদূর তত মধুর। যত অধরা তত অসীমা। তত অফুরান।

আজ এই হাসিটুকুর অর্থও তার বোঝবার ক্ষমতাকে এড়িয়ে গেল। কেমন বিচিত্র, বর্ণনার অতীত একটা হাসি। যার একদিকে আছে অনুকম্পা, অন্যদিকে আহ্বান।

মোনালিসার হাসি।

১১

—স্বাতী বলছি…

সুইটি নয়।

কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী মধুর শোনাচ্ছে। স্বয়মের সমস্ত অন্তরাত্মা মধুরে মধুর হয়ে উঠল। মোনালিসা যেন মনোলীনা হয়ে গেল।

—বলছি, ইংলিশ চ্যানেলটা একবার পার হয়ে আসতে পারবে? আমাদের বাড়িতে?

স্বয়মের ইংলিশ চ্যানেল সম্বন্ধে সেই প্রথম সন্ধ্যার কথাটা মনে হলো। বেচারীর পুরানো বন্ধুবান্ধবরা কেউ সেই সাগরবারির বাধা পার হয়ে স্বাতীর সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব জমাতে পারছে না।

কিন্তু বেচারী কে? স্বাতী? না, ওর বন্ধুরা? সেটাই ওর কাছে এখন প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্রাণের উচ্ছ্বাসে আনন্দে উল্লাসে যে এত ভরপুর তাকে নিজেদের মনের দুয়ার খুলে ওরা একবার আবাহন করে দেখতেও তো পারত।

ঠকছে সম্ভবত ওরাই। এবং নিজেদেরই সংকোচ সংশয়ের জন্য।

সে নিজেও তো ঠকে যাচ্ছিল। কেবল দুঃসাহসে ভর করে সীমানার ওপারে নো ম্যান্স ল্যাণ্ডে গিয়ে যে প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করে এল তার তুলনা নিজের চেনা সাধারণ মহলে সে পাচ্ছে কোথায়? স্বাতী যেন প্রতিমার মত ঝলমল করে।

কিন্তু শুধু ডাকের সাজের ঐশ্বর্য দেখেই শক্তিস্বরূপিণীর অন্তরের শক্তিকে কি অবহেলা করা উচিত? দূরে ঠেলে রাখা উচিত?

স্বয়মের হঠাৎ মনে হলো যে নিজের মন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

আবার মনে হলো ম্যাথু আর্নল্ডের একটা কবিতা। আমরা প্রত্যেকেই লবণাক্ত সমুদ্রে ঘেরা এক একটি দ্বীপ! ওই বেচারী সেই নিঃসঙ্গতা, একাকিত্বের বোঝা বহন করে চলেছে। সম্রাজ্ঞীর মত মহীয়সী হিয়া নিয়ে যেন সে এল্‌বা দ্বীপ থেকে নেপোলিয়নের মত নিজের দেশ ফ্রান্সের দিকে ব্যাকুল-ভাবে দৃষ্টিপাত করছে।

কিন্তু ভারতের ফরাসী অর্থাৎ বাঙালীর মন নিজের মধ্যে সংকুচিত হয়ে থাকে।

দূর ছাই। সুইটির বিদেশী আবরণ ছেড়ে স্বদেশিনী স্বাতী টেলিফোন করছে। তার গলার স্বর শুনেই কি সব এলোমেলো ভাবছি। ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়ে বকুল বিছানো পথে আবাহনের স্বপ্ন দেখছি।

—বলি, ওহে সোহং স্বামী, এত চিন্তায় পড়েছ কেন? এদিকে যে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে এসে সত্যি সত্যি এক ইংলিশ ইয়ুথ তোমার মধ্যে সোহং স্বামীর সন্ধান করছে।

এতক্ষণে স্বয়ম্ হেসে ফেলল। এবং অকস্মাৎ দুর্দান্ত একটা দুঃসাহসের কাজ করে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, ওঃ, মাইক বুঝি? তা ও নিজেই তো তোমার কাছে সোহং স্বামী বলে পরিচয় দিয়ে দাঁড়াতে পারে। ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে এতই যখন জেনেছে সোহং আর স্বামী কথা দুটোর মানেও নিশ্চয় জানে।

স্বাতী বেশ চটে গেল। বলল, ইউ আর ইমপসিবল। শুধু বই মুখস্থই করেছ। না হলে জানতে পারতে যে ওদেশে অত সহজে কেউ প্রেমীর ভোল ছেড়ে স্বামী হয় না। যাই হোক, মাইক তোমার খোঁজ করছে আমার এখানে এসে। আমি খবরটা দিয়ে দিলাম। যদি সাঁতার কাটার সাহস না থাকে ওকে তোমার ওখানে উড়ে যেতে বলব। আর-এ-এফ অফিসার স্বচ্ছন্দে গেট ক্র্যাশ করে ক্র্যাশ ল্যাণ্ড করবে তোমাদের বাড়িতে। চাই কি, কো-পাইলট হিসাবে আমিও সহযাত্রী হতে পারি।

স্বয়ম্ এবার রীতিমত ঘাবড়ে গেল। যুদ্ধের বাজারে এই কলকাতার মাথার ওপর দিয়ে ডাকোটাগুলো বোমা নিয়ে গুম-গুম করে প্রায়ই আজকাল আনাগোনা করে।

বাড়ির সবাই বলে ডাকোটা না ডাকাত। সেই ডাকাত চালায় যারা, তাদের মধ্যে একজন লালমুখ আর নীল ইউনিফর্ম পরে হঠাৎ হাজির হবে। সঙ্গে থাকবে টর্পেডো একখানা।

বিনা নোটিসে তাদের কোথায় বসাবে, কি করে যত্ন করবে? একেবারে তোলপাড় পড়ে যাবে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অর্থাৎ আড়ালে আবডালে।

আর ওরা চলে যাবার পর যে চোরা চাহনি আর গুনগুনানির ছোরা শুরু হবে তার ধাক্কা সামলাবে কে? স্বয়মের সাধ্যে কুলাবে না।

মামার আশ্রিত হলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। কিন্তু স্বয়ম্ নিজেই জানে যে ঠিক আসল বাধা সেখানে নয়। সেটা অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

মনের আঙিনায় যেখানে রঙের আনাগোনা সবে শুরু হয়েছে, সেখানে কড়া আলোর চড়া প্রকাশ সহ্য হবে না। শিশুর চোখ কি কড়া রোদের আলো সইতে পারে?

সে তাড়াতাড়ি জবাব দিল, না, না। সে কি হয়? মাইক তোমার বন্ধু। তোমার বাড়িতে এসেছে। আমায় 'মিট' করতে চায়, সে তো আমার সৌভাগ্য। ওকে বল যে, মহম্মদ যখন পাঁচ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছে এবং তুমিও সেই স্বর্ণলঙ্কা একেবারে পারাপার করে এসেছ, আমি সামান্য গন্ধমাদন পর্বত, আমিও পাশের বাড়ি পর্যন্ত পৌছতে পারব।

একটু ইতস্তত করে যোগ করে দিল, কিন্তু আমার বেলা শুধু কফি কিন্তু।

অর্থাৎ ওকে যদি কোন ড্রিঙ্ক করতে অনুরোধ করা হয়, সে কথাটুকুও যেন চাকর-বাকরদের মুখ দিয়ে এ-বাড়িতে এসে না পৌছয়।

সিংহের কেশর দোলানোর মত স্বাতীর কেশের ঝালর দোলে। তার পটভূমিতে মুখে জাফরানী রঙের স্বচ্ছ লম্বা সিগারেট-হোল্ডারে বসানো সিগারেটের আলোর আগুনভরা উজ্জ্বলতাটুকু পর্যন্ত ওর মনকে রাঙিয়ে দিচ্ছে। সে-কথাটুকু যেন আভাসেও কারো কাছে ধরা না পড়ে।

এ কি গহন দহন জ্বালা।

পাশের বাড়িতে পোর্টিকোর তলাতেই সে মাইক আর স্বাতীকে দেখতে পেল। প্রকাণ্ড লম্বা একটি আমেরিকান লিমুজিন মোটর। মিলিটারী নম্বর নেমপ্লেটে আঁকা। কিন্তু চক্ চক্ করছে একেবারে শো-কেস সাজিয়ে দেখানো কারের মত। মাইক সপ্রেমে সেটার গায়ে হাত বুলোচ্ছে। তরুণের মুখে তৃপ্তির অরুণিমা।

স্বয়মের দিকে সে মুগ্ধ চোখে তাকাল। ধোপদুরস্ত সাদা পাঞ্জাবি আর ধুতিতে বলিষ্ঠ এক বাঙালী মূর্তি। তার সাধারণ ইংরেজী ঢঙের স্যুট-পরা চেহারা স্টার ডাস্ট রেস্তোরাঁর চেকনাই আর্মি নেভীর স্যুট বা মিলিটারী ইউনিফর্মের ভিড়ে প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বয়ম্-সম্পূর্ণ বাঙালী।

দুয়েকটা কথার পর মাইকই বলল, তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে মোটরটাকে একটু আদর করে নিচ্ছিলাম। জান তো দেশে সব চালু প্রাইভেট গাড়িই পেট্রল র‍্যাশনের জন্য ছোট আর সবেরই রঙ ক্যামোফ্লাজ করা। এখানে এয়ার হেড কোয়ার্টার-এর দৌলতে আজ এই লম্বা হাডসনটা পেয়ে গেলাম—

মায় তার ফ্যাকটরির প্রথম করা পেন্ট সুদ্ধ। তাই একটু হাত বুলিয়ে আদর করছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন আমিও আমেরিকান হয়ে গেছি।

বলেই মাইক সরলভাবে হাসল।

—তা আমেরিকান কেন? মোটরটা আমেরিকান বলে? না, আমেরিকা বৃহত্তের সাধনার প্রতীক বলে?

—বলতে পার শেষেরটা। তাছাড়া আরেকটা কথা আছে। বছরের পর বছর ধরে আমেরিকানরা তাদের বিরাট বিরাট ঝকমকে মোটরের সঙ্গে যেমন ভাবে রোম্যান্স চালিয়ে এসেছে, তেমন ভাবের লভ এফেয়ার আর কোথাও দেখা যায় না। একেবারে দীর্ঘ, সুদীর্ঘ চড়া গ্রামের প্যাশন বলা যায়।

স্বাতী বলল, ওদের পারিবারিক মোটরটা স্ট্যাটাস, প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা আর স্বাধীনতার প্রতীক বলেই ওরা মনে করে।

—অবশ্য, অবশ্য। আর দেখ না আমারও স্বাধীনতা, ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা এনে দিল এই স্টাফ-কারটা। স্বাতী, তুমি বোধহয় আমার জন্য মনে মনে লাকি চার্ম কিছু ঠিক করে রেখেছ।

বলেই সে আবার সরল মনে হাসল। স্বাতী আর স্বয়ম্ দুজনেই হেসে সায় দিল।

স্বাতী ওদের বসবার ঘরে নিয়ে গেল। ওর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা সহজ আন্তরিকতা ফুটেছিল।

একটা ছোট্ট ল্যাণ্ডিং অর্থাৎ খোলা চত্বর পার হয়ে স্বাতী ঘরের দরজাটি খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যে স্বয়ম্ সত্যিই ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে একটা বসন্ত বাতাসে ভরা সুরভিত দ্বীপে এসে গেল।

সামনেই একটা চুণার পাথরের কাজ-করা ফুলদানীতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ শুভ্র হাসি আর মিষ্টি গন্ধ দিয়ে ওদের অভ্যর্থনা করল।

স্বাতী খুব খুশী ভাব দেখাল, জান স্বয়ম্, এই চমৎকার ফুলের গোছা উপহার এনেছে মাইক।

স্বয়ম্ মুখে বলল না, কিন্তু মনে মনে স্বয়ম্ ভাবল যে, কোন বাঙালী বন্ধু দেখা করতে আসবার সময় তো ফুলের গুচ্ছ নিয়ে আসবে না। যদি বা আসে হয় তার মনে কোন বিশেষ ভাব থাকবে, না হয় আর সবাই সেই ভাবটা আবিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

মাইক মৃদু কিন্তু মিষ্ট ভাবে বলল, কি সুন্দর সুরভি এই ফুলগুলির। আহা,

বিলেতে যদি এমন ফুল ফুটত। লাইলাক আর টিউলিপ ছেড়ে এই ফুলই তাহলে ফোটাতাম।

ততক্ষণে স্বয়ম্ মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘরটা দেখে নিচ্ছিল।

বসবার সোফা সেটের ঢাকনাগুলির নকশা হালকা কিন্তু আধুনিক। তাদের রঙ চড়া নয় অথচ চোখে পড়বার মত। সোফা সেটটি পুরানো অভিজাত যুগের ধারায় তৈরী। ইংরেজীতে যাকে বলে পিরিয়ড ফার্নিচার। কয়েকটি বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর তৈলচিত্রের প্রতিলিপি টাঙানো। এবং প্রত্যেকটিই যাতে ভালভাবে বিশেষ কোণ থেকে দেখা যায় সেরকমভাবে বসবার জায়গাও সাজানো।

অর্থাৎ সেগুলি শুধু দেখাবার জন্য নয়, দেখবার জন্য।

অন্যান্য সাজসরঞ্জামও শুধু নজরে পড়ার জন্য রাখা হয়নি। নজর সেগুলিতে আপনিই পড়বে। কারণ তার প্রত্যেকটিরই পিছনে আছে রুচি আর মমতা, যত্ন আর আদর।

ধনী বাঙালী বাড়ির বড় হলঘরে চীনে মিস্ত্রীর হাতের মিহি কাজের খাঁজে খাঁজে জমানো ধুলো আর তার ইটালিয়ান বা জয়পুরী শ্বেতপাথরের টেবলটপের মলিনতা এ-বাড়িতে যে পাওয়া যাবে না তা স্বয়ম্ এক নজরেই বুঝে নিল।

ধন এখানে জোর গলায় নিজেকে জাহির করছে না। মন মিঠে সুরে জমিয়েছে ঘরোয়া পরিবেশ।

টুক টুক করে দরজায় হালকা আওয়াজ হলো। অন্তরঙ্গ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে যেন বাধা না পড়ে। তাই বিনা জানানিতে, বিনা অনুমতিতে হুট করে উপদ্রব হাজির হবে না এই ধরনের শৃঙ্খলায় সাজানো জীবনে।

স্বয়মের পৃথিবীতে এটা একটা অপ্রত্যাশিত স্বস্তি। যেন এটা অপ্রয়োজনীয় বলেই সবাই মনে করে। বোঝা গেল যে, মাইক এই রকম শৃঙ্খলাতেই অভ্যস্ত। স্বয়ম্ নিজেকে শুধরে নিল। সত্যিই তো, এইটুকু ছন্দের মত শৃঙ্খলা এটা তো বর্তমান সভ্যতারই রীতি।

এই প্রথম সে আশ্চর্য বোধ করল যে, তার পারিপার্শ্বিকে আর চেনা সমাজে এটাকে সবাই ঢঙ বা কৃত্রিমতা বলে নাক উলটে থাকে। এইটুকু নিজস্ব নিরালা ভাবের মূল্যও কেউ দিতে চায় না।

পরিষ্কার কাপড় পরা পরিচ্ছন্ন এক বেয়ারা একটা নীচু দোতলা ট্রলি ঠেলে ঘরে নিয়ে এল। টি-সেটটা মৃদু একরঙা। স্বয়ম্ মনে মনে বুঝে নিল যে, এই ধরনের রঙকেই প্যাস্টেল শেড বলা হয়। কোন জবরজঙ লতাপাতার নকশা-

কাটা নয়। ডিমের খোলসের ভিতরকার স্নিগ্ধ বরফ-নীল রঙের পোর্শিলেন ওকে মুগ্ধ করে ফেলল।

হালকা কটকী ফিলিগ্রি জড়োয়া কাজের রূপার পাত্রে কেক, আরেকটা ওই রকম পাত্রে প্রায় কাগজের মত পাতলা করে কাটা রুটির টুকরো আর শশা দিয়ে বানানো স্যাণ্ডুইচ। আরো একটা পাত্রে বাংলা মিষ্টি।

এক পাশে তিনটে শ্বেতপাথরের গ্লাস।

মাইক ছেলেমানুষের মত হেসে উঠল, কি সর্বনাশ! এ যে একেবারে বাদশাহী বিলাস হয়ে গেল। হায় হায়! প্লেনে বসে দুশমনের হদিশে চোখ দুটো ফিল্ড-গ্লাসে আঠা দিয়ে এঁটে রেখে গ্রীজ-প্রুফ কাগজের মোড়ক থেকে খুলে শুকনো সামগ্রী খাবার অভ্যেস আমার। তোমার এই 'বোন-চায়না' সেট তো আমার হাতে এখনি খান খান হয়ে যাবে।

তারপর স্বয়মের দিকে চোখ টিপে বলল, ঠিক প্রথম প্রণয়ের পরশে কুমারী হৃদয়ের মত।

স্বয়ম্ ছাড়বার পাত্র নয়। এই একটু আগেই শুনে এসেছে যে মাইক তার নতুন নামকরণ করেছে—সোহং স্বামী।

সে মুচকি হেসে বলল, তোমাদের দেশে প্রথম প্রণয়ের পরশটা কি কোন মেয়ে অ্যাট অল পাবার মোকা পায়? বাচ্চা বয়সের ডেটিং জিনিসটার কল্যাণে প্রথম প্রণয়ই বোধ হয় গাছপাকা আপেলের মত স্বাদে ভরা থাকে।

রাগের ভান করে মাইক বলল, ইউ বিব্লিক্যাল প্যাট্রিয়ার্ক, ওহে বাইবেল যুগের দাঠাকুর, পাকা আপেলের স্বাদের মধ্যে তুমি ইভকেও হারিয়ে ফেললে। আর তোমাদের সমাজে তো শুনছি আপেল যেমন দুর্লভ তেমনি দুর্মূল্য। ম্যারেজ ইজ টু হাই এ প্রাইস ফর দি অ্যাপল।

সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফলের দাম দিতে হয় বিয়ে করে? সে যে বড্ড মাগগি দাম হয়ে গেল।

এবার সে স্বাতীর দিকে তাকাল। অর্থাৎ তিন অবিবাহিতের মধ্যে স্বাতীই একমাত্র মেয়ে। এই দেশে, এই সমাজে, এই বাড়িতে যদি এরকম ঠাট্টা ইয়ার্কি করা ঠিক না হয়, সে মোড় ঘুরিয়ে নিক।

সে নিজে বিদেশী সমাজের লোক, তায় মিলিটারী। তাদের মধ্যেকার রসালাপ আর ভাষা হয়তো এদেশে অচল।

স্বাতী সেই চাহনীর প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। মৃদু হেসে চায়ের সরঞ্জামের

গড়ানে ট্রলিটা নিজের দিকে টেনে আনল। ট্রলির চার পায়ার চাকতিগুলি নিঃশব্দে গড়িয়ে গেল ওর দিকে।

সে শ্বেতপাথরের গ্লাস তিনটে দেখিয়ে মাইককে জিজ্ঞেস করল, যদি বলতে পার এর লেসের ঢাকনার তলায় কি আছে, তাহলে একটা বিশেষ পুরস্কার পাবে।

তারপর স্বয়মের দিকে তাকিয়ে হাসল তোমাকেও সেই একই অফার দিচ্ছি।

দু'জনেই ভাবতে লাগল। হঠাৎ দু'জনেই ঘোষণা করল—দুধ।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই প্রতিবাদ করল, না, আমরা দুধ চাই না. আমরা দুগ্ধ-পোষ্য শিশু নই।

স্বাতী বলল, যাই হোক, সরবৎ নয় দুধও নয়। প্রকৃতির দুধ। খেয়ে দেখ, মাইক। যদি কখনো তোমার এয়ার সর্টিতে বিমান হামলায় আঘাটায় নামতে হয় এই ডাবের জল চিনে রাখ। তখন মনে হবে এর চেয়ে মিঠে পানীয়, প্রাণ দেবার মত পানীয় হুইস্কি থেকে ভদকা পর্যন্ত কোন কিছুতেই নেই। আর স্বয়ম্, তুমি চেয়েছিলে কফি। বদলে দিচ্ছি কোকোনাট মিল্ক।

মনে মনে দু'জনেই কৃতজ্ঞ বোধ করল।

অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে সন্ধ্যাটা ভরে উঠল। স্বাতী তারপর চা-পানের মধ্যে মাইককে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বল তো, কলকাতায় কি কি দেখলে?

মাইক একটু ভাল করে নড়ে চড়ে বসল। মুহূর্তে ঠিক করে নিল যে কলকাতার ভাঙা চোরা নোংরা যা দেখেছে, যে জীবন ভাঙছে, যে সমাজ পাল্টাচ্ছে, যে শহর নোংরা সে সম্বন্ধে কিছু বলবে না। সে রয়াল এয়ার ফোর্স ফাইটার কম্যাণ্ডে বেহালার যে বিরাট মার্বলে মোড়া বাড়িটাতে প্রায় রোজই যায়, তার পথে বলতে গেলে গোটা দুঃখী শহরটারই পরিচয় পেয়েছে। যা দেখেছে তার চেয়ে বেশী, অনেক বেশী অদেখা দুঃখও বুঝেছে।

যা বুঝেছে, বেদনা বেজেছে তার চেয়ে আরো, আরো অনেক বেশী।

বেদনার সবচেয়ে বড় কারণ যে, এই শহরে যত জালা যত জঞ্জাল তার প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল তারই নিজের দেশের কর্তাদের অনাদরে, অবহেলায়।

কিন্তু সে কথা এখন আলোচনার মানে হয় না। যুদ্ধটা যদি না জিততে পারে ওরা, তাহলে সবই যাবে ডুবে। যদি জিততে পারে, তবুও শেষ পর্যন্ত নিজেরাই যাবে ভেসে।

কিন্তু এদেশী কর্তারা যে ফুটো নৌকোটা ভাসিয়ে তুলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পালে হাওয়া লাগাতে পারবে তেমন ভরসাও সে এই সামান্য সময়ে পায়নি।

কাজেই সে কথা থাক। বাঙালীরা যে রাস্তাটা নিয়ে বড় গর্ব করে জোর গলায় বিদেশীদের শোনায়, তার কথা বলবে। বাঙালী মনীষার প্রাণকেন্দ্র কলেজ স্ট্রীট।

সে বলল, কলেজ স্ট্রীটে গেলাম। দূরে এই লম্বা মোটর আর সিকিউরিটি গার্ড বা গাইড আড়ালে রইল। দেখলাম একটা আলাদা কলকাতা। দি গ্রেট প্রেসিডেন্সী কলেজ—

স্বয়ম্ বাধা দিয়ে নিজের আনন্দ জানাল, আমার কলেজ, মাইক।

—তোমায় অভিনন্দন জানাই। শুধু সেরা কলেজ নয়, সেরা পরিবেশ তুমি পেয়েছ। কলেজের দেওয়ালের কাজ-করা লোহার রেলিং-এ সাজানো সারি-সারি মর্নিং গ্লোরির বীথি নয়, পুরনো পুঁথি। আগ্রহী আঙুলের স্পর্শে প্রায় ছেঁড়া, কিন্তু ধন্য তাদের পাতা। পাশে পাশে জ্ঞানতপস্বীদের হাতে লেখা টিপ্পনী। আশ্চর্য! লোহার রেলিং-এ ঠেস দিয়ে ঠায় অপেক্ষা করছিল আমারই জন্য হোমারের ওডিসির এক ঐতিহাসিক সংস্করণের কপি। আমার মনের অফুরান অভিযানের সমুদ্রে ঢেউ তুলে দিল।

হাততালি দিয়ে উঠল স্বাতী। কি আশ্চর্য। কি চমৎকার তোমার আবিষ্কার।

মাইক একটু বিষণ্ণ হাসি হাসল। তার মুখটা বেশ করুণ হয়ে উঠেছে। সে বলল, জানো, পাতা ওলটাতে ওলটাতে অনুভব করলাম যে এদেশের মনীষীদের কি সাংঘাতিক অসহায় অবস্থা এসে পড়েছে। তার জন্যই এই সমস্ত অমূল্য বই রাস্তার রেলিং-এ হাজির হয়েছে। কত জ্ঞান, কত স্বপ্ন, কত সাধনা ওদের ঘিরে ছিল। আর এখন····

মাইক আর কিছু বলতে পারল না। শুধু মাথা নেড়ে বলল, আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম—অসহ অসহায়তা মনের মধ্যে বহন করে।

একটু পরে মাইকই আবার শুরু করল, মুখ ফিরিয়ে কলেজের দেবদারু গাছগুলির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ট্রামের ঘড়-ঘড় আওয়াজ আর ফেরিওলার ঘণ্টার টুং-টুং ছাপিয়ে স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দিচ্ছিল দেবদারুর পাতার হিল্লোল। আস্তে আস্তে মনটা শান্ত হয়ে গেল। হিমালয়ের শান্তি। তুমি কি কখনো তা নিজের মনে অনুভব কর, স্বয়ম্? সংস্কৃত কাব্যে শুনেছি এই গাছকে ট্রি অব গডস বা দেবতাদের গাছ বলে।

—আমার কথা থাক মাইক। তোমার কথাই আমরা শুনতে চাই।

১২

মাইক বলতে লাগল, ট্রি অব গডস দেখতে দেখতে ভাবলাম রিভার অব গডস গঙ্গাকে একবার নিজের মনের মধ্যে অনুভব করে দেখবার চেষ্টা করতে হবে। ওই তো ইণ্ডিয়ার প্রাণগঙ্গা।

ওরা দুজন আশ্চর্য হয়ে শুনতে লাগল।

গভীর সুরে মাইক বলে চলল, আমরা এখনো পাইনি এমন একটা জিনিস এদেশে আছে—একটা রহস্যময় আর উপলব্ধিভরা জীবনের সীমানার আভাস। এক হিসাবে একটা করুণ ট্রাজেডির রেশ, যা তোমাদের ঘিরে রেখেছে।

একটু থেমে সে আবার বলল, আর আমাদের মধ্যে আছে একটা জিনিস যা তোমাদেরও প্রয়োজন—জীবনের অসীম সম্ভাবনার আশ্বাস। এক হিসেবে একটা উল্লাসের উন্মাদনা। এ-দুটোকে মিলিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণতার রূপ দেবার মত শক্তিধর আছে কে?

অভিভূত হয়ে, যেন কোন অপার অন্ধকারের ওপার থেকে স্বাতী মৃদুস্বরে বলল, এবারে তোমার গঙ্গার অনুভবের কথা বল মাইক।

—হ্যাঁ বলছি। পোর্টের জাহাজগুলির আরো উত্তরে হেঁটে কয়েকদিন গভীর রাতে ঘোরাঘুরি করলাম। উৎসুক লোকের কোন অভাব হলো না। সবাই সাহায্য করতে চায়।

মুশকিল হলো যে কোন্ লোকটা বদ মতলবে ফিটন গাড়িতে তুলতে চায় আর কোন্ লোকটা সত্যি কোন সাধুর সন্ধানে নিয়ে যাবে তা ধরব কি করে।

শেষে অফিসের একজন বেসামরিক কেরানী খবর আনল যে সোহং স্বামী বলে একজন শিক্ষিত সিদ্ধ মহাপুরুষ হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন আর জগন্নাথ ঘাটের কাছে এক ধর্মশালায় সাময়িক আশ্রম খুলছেন। তিনি অনেক বিভূতি পেয়েছেন আর যৌগিক পন্থাতে শান্তির পথে নিয়ে যেতে পারেন।

আমি তাঁর কাছে যেতে চাইলাম। কিন্তু শুধু নাকি রাতদুপুরেই তিনি যোগনিদ্রা ভেঙে দর্শন দেন। তাই-ই সই।

শুধু সর্ত করা হলো যে, আমি একা আসব এবং আমার পরিচয় তিনি আর কাউকে দেবেন না। এমনিতেই আমি সামরিক নিরাপত্তার অনেক সাধারণ নিয়ম ভাঙছি। তবু তারও একটা সীমা আছে।

কোথায় রাতত্নপুর। একটা অন্ধকার-প্রায় কুঠুরীতে খাটিয়ার পাশে টুলে বসে আছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। স্বামীজীর যোগনিদ্রা আর ভাঙে না। আমিও ভাঙব না বলেই এসেছি।

হঠাৎ শেষ রাতে তিনি যোগের মধ্যেই কেঁদে উঠলেন—মা মা, তুই এতদিনে আমার পুজো গ্রহণ করলি। তুই তোর বাছাই-করা সেবককে আমার কাছে পাঠালি। ধ্বংসময়ী মা, তুই সব সংসার-দুঃখ ধ্বংস করবি বলে এক যোদ্ধাকে তোর শিষ্য বেছে নিলি। এই হচ্ছে এই মহাযুদ্ধের মহান দান। একমাত্র বিভূতি।

এমন আরো কত কথা কান্নাভরা ভাঙা স্বরে নিদ্রার মধ্যেই স্বামী বলে চললেন।

ধ্যানে যোগাসনে বসে তিনি দেখেছেন যে আমার অবস্থার সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে। আমিই মাদার্স চোজেন, মায়ের বাছাই-করা সেই মহান ভক্ত যার মধ্যে দিয়ে মাদার্স মেসেজ, মায়ের বাণী, সোহং স্বামীর মুখ থেকে বেরিয়ে অবিশ্বাসী পশ্চিমকে স্যালভেশন অর্থাৎ বিমুক্তি এনে দেবে। এই মহাযুদ্ধ সেই যোগাযোগ সৃষ্টির জন্যই তৈরী হয়েছে।

স্বামীজী অবশ্য জানতেনই যে আমি তাঁর পায়ের কাছে ভক্তিভরে টুলে বসে অপেক্ষা করছি।

টুলে বসে, কিন্তু ঢুলু ঢুলু আঁখি নয়। কারণ রাতের হাওয়াই হামলার কল্যাণে আঁধারেই আমার অভিসার শুরু হয়। আর রাতেই আমার সব ইন্দ্রিয় আর অন্তদৃষ্টি বেশী সজাগ থাকে।

স্বামীজীর মত আমারও রাতের সাধনা। আঁধারের মধ্যে সন্ধান।

শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে স্বামীজীর সমাধি ভঙ্গ হলো। পুরোপুরি নয়। আধেক ভাঙা আধেক ভরা নিদ্রার মধ্যে তিনি ঠিক আমার ডান হাতখানা তাক করে জড়িয়ে ধরলেন।

আবার যেন ঘুমঘোরেই ডুকরে কেঁদে ফেললেন, বাছা তুই এসেছিস এতদিন পরে। একশো বছরের ওপর তোর জন্য অপেক্ষা করে হিমালয়ে কায়কল্প সমাধিতে মগ্ন ছিলাম। প্রথম যখন এক ইংরেজ মিলিটারী অফিসার সিমলা

শৈলনিবাস আবিষ্কার করে সে তো আমারই আশীর্বাদ নিয়ে সেখানে বসতি বানিয়েছিল।

তখনি আমি বুঝেছিলাম আর জ্ঞাননেত্রে দেখেছিলাম যে তার দেশের এবং সামরিক বৃত্তির একজন ভক্ত আমায় খুঁজে বের করবে। আমার সাধনাকে পূর্ণ রূপ দিতে তার নিজের দেশে নিয়ে যাবে। মায়ের বাণী নিজের দেশে প্রচার করার যন্ত্র হবে। ধন্য হবে সে বিশ্বের সেবায়।

এই পর্যন্ত বলে হেসে মাইক আবার বলল, তোমরা তো জান সবচেয়ে বেশী মদ খাবার অভ্যাসের জন্য সুনাম এয়ার ফোর্সের আছে—স্বামীজীও বোধ হয় হিসাব করে দেখেছিলেন যে একজন শিক্ষিত তরুণ এয়ার ফোর্সের লোক মাঝ রাতে যখন জগন্নাথ ঘাটের ধর্মশালায় তাঁর এবং ভারত-আত্মার সন্ধানে এসেছে সে বেহেড মত্ত অবস্থাতেই এসেছে।

তিনি নিশ্চয়ই আরো হিসাব কষে দেখেছিলেন যে ভগবৎ প্রেমের নেশার চেয়ে ভদকা বা রামের নেশা বেশী রঙিন। বেশী প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে।

এবং আর-এ-এফের লোক যখন, তায় সদ্য বিলেত থেকে আসা—সে রাতের কালো আঁধারে ঢুলু ঢুলু চোখে কবুল করা কথার খেলাপ দিনের সাদা আলোয় সাদা চোখে কখনো করবে না।

দুঃখের বিষয় তার তিনটে হিসাবেই ছিল ভুল। শুধু যে মিস-ফায়ার করল তাই নয়, বড্ড য়্যাডভান্স ফায়ার করে বসল।

অবশ্য আমারও বুদ্ধিতে ছিল গরমিল। আমার আগে থেকেই বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু রাতের পর রাত আমি জার্মান বেলুন ব্যারাজ আর অ্যাক অ্যাক কামানের গোলার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে অভ্যস্ত হয়েছি। আর তার চেয়ে অনেক মোক্ষম মরা বাঁচার খেলায় হিমালয়ের হাম্প অর্থাৎ কুঁজের উপর মেঘ আর ঝড়ঝাপটার লীলাখেলার সঙ্গে মোকাবিলা করেছি। তাই একবার না হয় একজন ওস্তাদ গেরুয়াধারীর সঙ্গে একটু মাতামাতি করে নিই। লোক্সান তো কোন পক্ষেরই হয়নি।

স্বয়মের একটু হল লজ্জা!

আর স্বাতীর লাগল মজা।

মাইক দুজনেরই এই দুরকম মানসিক প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারল।

প্রথমে সে স্বাতীর দিকে উদ্দেশ করে বলল, দেখ সোয়াতি, আমার কিরকম নিরাশা হল। যাকে বলে একেবারে ফ্রাস্ট্রেশন। পুরোপুরি আশাভঙ্গ। কোন

ব্লন্ড আমায় এভাবে ঠকালে হৃদয়টাকে আবার জোড়া লাগাবার মোকা মিলতে পারত। কিন্তু একজন সন্ন্যাসী আমার দোষে ঠকে গেল। প্রেমের ভাষায় বলতে পার 'জিলটেড' হয়ে গেল। আমিই যে তাকে ঠকিয়েছি, তার আশাভঙ্গ করেছি এজন্য আমিই দোষী বোধ করছি মনে মনে। এবং তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে এই মিষ্টি রসোগোল্লাটা। স্বামীজী নিশ্চয়ই পূজোর নৈবেদ্য হিসাবে রসোগোল্লা সমর্থন করেন।

সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে দুটো আঙ্গুল দিয়ে—চামচ দিয়ে নয়, ভারতীয় ভাবে রসোগোল্লা মুখে পুরে দিল।

তারপুর মাইক স্বয়মের মুখের দিকে তাকাল। ওর দিকে একটা রসোগোল্লা এগিয়ে দিল চামচ করে।

মুচকি হেসে বলল, তুমি যেন একটু এমবারাস্‌ড বোধ করছ। কিন্তু বিব্রত হচ্ছ কেন? বরং আমারই উচিত তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া। আমি যদি গঙ্গার কিনারে কিনারে গরুখোঁজা না করে তোমার কাছে আসতাম তাহলে ঠকতাম না। অযথা সময় নষ্ট হতো না। অন্তত তুমি এমন সব বই আমায় পড়তে দিতে যা আমার মত সখের 'সীকার'দের পক্ষে যথেষ্ট। তুমিই হতে পারতে আমার সোহং স্বামী।

মাইক স্বয়ম্‌কে অবাক হয়ে যেতে দেখে বলল, হ্যাঁ; শুধু অহং ভোলের গেরুয়া বসনটা বাদ দিয়ে। সোয়াতির কাছে যে তোমায় সোহং সোয়ামী বলে বর্ণনা করেছি তার মধ্যে ছিটেফোঁটা আন্তরিকতাও আছে একথা বিশ্বাস করো।

পরিবেশ একটু হালকা করে নেওয়া দরকার। স্বাতীই হাল ধরল। আলাপের নৌকার মোড় ঘোরাল।

—মাইক, তুমি গেরুয়া রঙ খুঁজছ তো? তা গঙ্গার উপর সূর্যাস্ত দেখ না কেন? গেরুয়া কেন, তুমি রামধনুর হরেক রঙ পাবে হঠাৎ হঠাৎ। অবশ্য রাইডিং ইন দি স্কাই, আকাশে চড়ে বেড়াবার সময় তো ওদিকে মন দিতে পারবে না।

কিন্তু মাইক এখন মুখর হয়ে উঠেছে। নিজের বাপ-মা বাড়িঘর কলেজ এই সবে ঘেরা পরিচিত সংসার ছেড়ে এয়ার ফোর্সের ব্যারাকে ব্যারাকে তাকে জীবন কাটাতে হচ্ছে। মরণের মুখোমুখি হতে হচ্ছে অন্ধকার অজানা আকাশে।

তার মধ্যে এখন সামান্য কিছুদিনের জন্য সে কলকাতায় আর-এ-এফের ফাইটার কম্যাণ্ডে হেড কোয়ার্টার্স স্টাফে এসে কাজের সঙ্গে বিশ্রামের স্বাদ পাচ্ছে।

আর যে ঘনিষ্ঠ বাঙালীপাড়া বেহালার প্রাসাদে ওদের অফিস সেটা একটা হাসিকান্নায় স্পন্দিত বিরাট অভিজাত পরিবারের বসতবাড়ি। যুদ্ধের প্রয়োজনে সে পরিবারকে ওখান থেকে সরানো হয়েছে। কিন্তু পারিবারিক ঘরোয়া জীবনের সবরকম ছাপ রয়েছে সেখানে। তার ছাপ পড়েছে তার মনে।

স্বাতীদের এই ঘরটুকুও তার বর্তমান রুটিনে একটা মধুর জীবনের স্নিগ্ধ নিষ্কৃতি। তাই সে মুখর হয়ে উঠেছে।

মাইক তার মনের মোড় ঘোরাতে চাইল না। আবার কবে এ বাড়িতে নিজের বাড়ির মত করে বিনা বাধায় বিনা সামরিক হাঁকডাকে নিজের মন নিয়ে বসতে পারবে তার ঠিক নেই। এয়ারফোর্স মেসে মদের পাত্রে বরফের সঙ্গে মিশিয়ে ঝাঁকি মারতে মারতে 'এল প্রেসিডেণ্টে' ককটেল বানিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার কমলা রঙের স্বপ্নে বিভোর হওয়াটাই স্টাইল। তার বদলে আবার কবে মমর পাথরের গ্লাসে মাটি মায়ের তৈরী সাদামাঠা ডাবের জল খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে তার ঠিক নেই।

কাজেই সে যা নিজে থেকে পেয়েছে বা খুঁজে পায়নি তার কথা বলার সুযোগটুকু এখন ছাড়বে কি করে ?

স্বাতী তো শুধু একই কলেজের ছাত্রী নয়। সে একই মনের পথের পথিক।

আর এই স্বয়ম্? সে তো একটা আবিষ্কারের বিস্ময়। নেই কোন রাসায়নিক মিশ্রণ, কোন ভেজাল। একটি খাঁটি পরিশীলিত মনের মানিক।

মাইক বলল, আমি গঙ্গার সূর্যাস্তের কথা বলছি। কলকাতার গঙ্গা নয়। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। রম্যা রোলাঁর বই পড়েছি। মন্দির ছাড়িয়ে পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলাম। একা আর নিরালা। আমার ইউনিফর্মটা সেখানে কোন কৌতূহলী চোখ বা বিস্মিত ছেলেমেয়েকে টেনে আনবে না। আমি সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে ভুলে গেলাম যে খালি চোখে ওদিকে বেশীক্ষণ তাকাতে নেই। চোখে কেমন যেন ঘোর দেখতে শুরু করলাম। তারপর···

ওরা দুজনেই রুদ্ধশ্বাসে বলল, তারপর ?

—হ্যাঁ, সেই কথাটাই তো আমিও ভাবছি। তারপর মনে হলো এক সন্ন্যাসী আপন মনে বটগাছের তলায় বসে আছেন। আমারই প্রত্যাশায় যেন। একটু চমকে উঠলাম।

না মায়া নয়। চোখের ভুল নয়। স্বপ্ন, ভ্রম, হ্যালিউশিনেশন নয়।

সন্ন্যাসী ইংরেজীতে আপন মনে বললেন, বেঁচে থাকো। তুমি তরুণ।

তোমার জীবনে অরুণবর্ণ দেবতার জ্যোতি এসে পড়ুক। বাঁচো। জীবনই সবচেয়ে বড়। সেই জীবনকে তমসার ওপারের আদিত্য বর্ণে উজ্জ্বল করো।

কিন্তু তাঁর আশীর্বাদী কথাগুলির মানে কিছু বুঝলাম কিনা সে সম্বন্ধেও কোন ঔৎসুক্য দেখালেন না।

—তারপর ?

—তারপর আর কিছু নেই। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছিল। এদেশে তো টোয়াইলাইট, মানে দিন আর রাত্রির মিলনসেতু সন্ধ্যা খুব সংক্ষিপ্ত। আমি আত্মস্থ হয়ে দেখলাম অন্ধকার হয়ে গেছে।

কিন্তু সেই সন্ন্যাসীর কথাগুলি স্বর্গ থেকে ঝরা আলোর মত অন্ধকারেও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে মনে হলো।

আচ্ছা, স্বয়ম্, তোমাদের ধর্মগ্রন্থে বোধ হয় এমন তমসা আর আদিত্য বর্ণের বর্ণনা আছে ভগবানের কথা প্রসঙ্গে ?

খুব মৃদু স্বরে স্বয়ম্ জানাল, আছে, উপনিষদে আছে। কিন্তু, মাইক তোমার এই ঘটনা শোনার পর আমার মনে কি রকম একটা অনুভূতি আসছে। তোমাকে তা বোঝাতে পারব না।

একটু থেমে আত্মস্থ হয়ে স্বয়ম্ আবার বলল, কিন্তু এই সন্ন্যাসী স্বপ্ন হোন সত্য হোন বা যাই হোন না কেন, তোমাকে কিসের আহ্বান শুনিয়ে গেলেন ? তমসঃ পরস্তাৎ অন্ধকারের ওপার থেকে কিসের এই ডাক ? অথবা কার ডাক ?

স্বাতী ভয়ে শিউরে উঠল।

মাইক তা লক্ষ্য করল।

না। এই সুখী স্বর্গের ফুলকে ভাবনার মধ্যে ফেলে গেলে অন্যায় হবে। এর আতিথ্যের এর বন্ধুত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হবে। এ চলতে পারে না।

মাইক তাই খুব খুশী খুশী ভাব দেখিয়ে হেসে উঠল।

স্বাতী, তুমি তো জান হঠাৎ এরকম সাধু দর্শন হওয়াটা আমাদের মধ্যে খুব ভাল লক্ষণ ধরা হয়। আমরা মিলিটারীতে এসব মানি না। কিন্তু আমার নিজের জীবনে দেখেছি যে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সব সার্থক আর মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। আমার বাবা মাকে এই ঘটনাটা জানাব। ওঁরা খুব আশ্বস্ত হবেন।

স্বাতীও আশ্বস্ত বোধ করল এবার। এবং নিজের বাবা-মাকে খবর দিল।

ওঁরা অপেক্ষা করছিলেন যে বন্ধুদের চা আর খোসগল্প শেষ হলে ওদের সঙ্গে যোগ দেবেন।

খুব স্নুন্দর একটা পারিবারিক পরিবেশ গড়ে উঠল।

অনেকক্ষণ পর ওরা বিদায় নিয়ে গেল। মাইকের মনে একটা সার্থকতার আনন্দ। সত্য অনেক সময় বিবর্ণ আর বিস্বাদ হয়। কিন্তু সেই গঙ্গাতীরের ঘটনা সত্যিই হোক আর স্বপ্নই হোক তার অনুভূতিটাই তো বেঁচে থাকার রং। জীবনের রং।

মিলিটারী মোটরটা পিছনের দিকে রক্তচক্ষু দেখাতে দেখাতে চলে যাবার পর স্বয়ম্ ঘরে ফিরে নিজের দিকে তাকাল।

সে কে? এদের তুলনায় বলতে গেলে কিছুই না। এই 'কিছু না'র আয়নার ভেতর দিয়েই কি সে পৃথিবীটাকে দেখবে? জীবনটাকে আস্বাদন করবে? অথবা অপচয় করবে?

নিজেকে সে সমঝাল। তুমি একটা রোমান্টিক গঙ্গাফড়িং। জীবনের আনাচে কানাচে উড়ে বেড়াচ্ছ। সেই জীবনের তুমি কেউ নও। গোটা কতক বই আর বুলির ভারে নিজেকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে দেখছ। কিন্তু সেগুলি তো তোমার নিজস্ব অর্জন নয়। পৃথিবীর সকলের সম্পত্তি। তোমার নিজের পরিচয় কি? এবং কি দিয়ে?

হ্যাঁ, তুমি গলার জোরে নিজের সাফাই গাইতে পার যে তুমি ব্যর্থ আর পরাজিতদের দলে থেকে তাদের সঙ্গে তালে তালে এগোবার চেষ্টার মধ্যেই তোমার মহত্ত্ব দেখাবে।

কিন্তু তাদের আশা উদ্দেশ্যহীন, আকাঙ্ক্ষা অর্থহীন। তাদের ভালবাসার মধ্যে মর্যাদা নেই। এমন কি নিরাশার মধ্যেও নেই নীতি। এই অসার্থকের দল হেরে যায়, পিছিয়ে পড়ে, মার খায় মুখ বুজে।

তুমি, তুমিও স্বয়ম্, না-পাওয়ার ওপারে পৌঁছবার জন্য উঠে পড়ে লড়ে যাচ্ছ না। শুধু তোমার অন্তরের পাথরে গভীর অক্ষরে খোদাই করে যাচ্ছ সেই দিন আর সেই রাত্রিগুলিকে যাদের মধ্যে না আছে রং, না আছে রক্ত।

এই কি তোমার জীবন? তাই যদি হয় তার চেয়ে বড় কি কিছু নেই যার জন্য তুমি বসবে অজানা সাধনে?

প্রায় সারা রাত সে জেগে জেগে ভাবল।

স্বাতীদের বাগানের অর্থাৎ ইংলিশ চ্যানেলের ওপারের মর্নিং গ্লোরি লতার ফুলগুলির ততক্ষণ চোখ মেলে তাকাবার সময় হয়ে এসেছে। শিশিরসিক্ত লতাগুলি বীণার তারের মত ঝুলছে। যেন আলোর পরশে এখুনি বেজে উঠবে।

১৩

সেই তার বেজে উঠেছিল। কিন্তু বীণার ঝংকারে নয়। ধনুকের টংকারে। এবং ঠিক তার পরের দিনই। সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে।

আশ্চর্য! স্বয়ম্ বুঝতেই পারল না কোথা থেকে কি হয়ে গেল। মন কি করে নিজেরই অগোচরে এমন করে পরিবর্তিত হয়ে গেল। প্রবল বেগে কিন্তু নীরবে, বিনা প্রতিবাদে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

এত তাড়াতাড়ি যে সে নিজেই তার কোন হিসাব দিতে পারবে না। অথবা কোন হদিস।

বীণার ঝংকারের পরিণতি ধনুকের টংকারে। সে কি রকম রূপান্তর?

অথচ মর্নিং গ্লোরির লতাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সব কিছুকেই মিষ্টি মনে হচ্ছিল। এমন কি ভোর রাতের ঠুলি পড়া মিটিমিটি বাতি নিয়ে চলা ট্রামগাড়ির টুংটাং শব্দটুকুও।

মনে হচ্ছিল ওই সাজানো বাগানটুকু, ওই পাম গাছগুলি ওই মায়াভরা রাত সবই বেঁচে থেকে উপভোগ করার জন্য। এই যুদ্ধ এই হাহাকার এই হানাহানি সত্ত্বেও।

কিন্তু সেই উপভোগের আনন্দ আস্বাদের প্রথম সোপান হচ্ছে বেঁচে থাকা। ভিখারীও বেঁচে থাকে। ভবঘুরেও। কিন্তু সে বাঁচা বাঁচা নয়। বাঁচার আনন্দে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সাধনায় সার্থকতায়।

অস্ট্রিচ পাখীর মত বালিতে মুখ গুঁজে রেখে আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না বলে নিশ্চিন্ত থাকলেও বাঁচা বলে না তাকে। সেটা তো পলায়নের পথ।

অথচ জীবনের রাজপথ তৈরী হয় জয়ের মধ্যে দিয়ে। সেই জয় সে কোথায় পাবে?

ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে সে ভাল করে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। ব্রাহ্মমুহূর্তে বাইরে এসে পূবের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। মন মেলে দিল সেই দিকে যে দিক থেকে আসে আলো। আসে আশা। আসে প্রত্যয়। ভাসা তস্য বিভাতি সর্বমিদম্। তাঁর আলোয় সব কিছু আলো হয়ে ওঠে।

মনের মধ্যে সেই আলো নিয়ে সে বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। তাদের সঙ্গে মেট্রো সিনেমায় গিয়েছিল। তারপর রাস্তায় অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে কি হয়ে গিয়েছিল সেটা বন্ধুরা জানে না।

তার পর কোন খবর না দিয়ে বেশ কয়েক মাস ধরে সে কোথায় আর কেন যে উধাও হয়ে গিয়েছিল তাও তারা জানত না। খবর নিয়ে পরে জেনেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বুঝবে না। এখন সে সেটা বুঝিয়ে বলবে তাদের সঙ্গে দেখা করে।

সে মনে মনে সমস্তটা যেন মহড়া দিয়ে নিল। বন্ধুরা ওকে এই ক'মাস পরে একেবারে ইউনিফর্ম পরা কমিশনড অফিসার হিসাবে দেখবে। একটা বিরাট রূপান্তর।

আরো একজন দেখবে সে রূপান্তর। সে নিশ্চয়ই বুঝবে যে এটা শুধু রূপান্তর নয়। জন্মান্তর।

কি করে সেটা সম্ভব হলো তা সেই বিশেষ ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই বুঝবে।

জার্মান হাওয়াই হামলা ভরা বিলেত থেকে ফিরে আসা মাইকের সহপাঠিনী সে। স্টার ডাস্ট রেস্তোরাঁ বা ওই রকম জায়গায় যেতে অভ্যস্ত সে। কাজেই তার চোখে খুব কিছু একটা পরিবর্তন মনে হবে না। সে মন দিয়ে যাচাই করে। কাজেই স্বাতী বুঝবে স্বয়মের এই বিবর্তন। স্বাতী নিশ্চয়ই বুঝবে।

ফ্রণ্টে যাবার আগে ফার্লো নিয়ে সে এসেছে। সেই আরেক জনের কাছে আর বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে যাবার জন্য।

বন্ধুরা খুশীতে বলে উঠবে—তুই স্বয়ম্ না, শ্যাম—সব বাঙালী রাধার চোখে পীতবসন বনমালী হয়ে উঠেছিস তুই।

হয়তো সরল বাধা দেবে—হায় হায়! সে চান্সটা পাবার আগেই তোকে হয়তো খাকীবসন মরুমালী হয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ খাকী পোশাক পরে মরুভূমিতে চরে বেড়াতে হবে। গোষ্ঠে বিচরণের মত। আফ্রিকায় রোমেলের জার্মান রোলারের ঠেলায় সব মরুসুন্দরীর দল মিশরে জমায়েত হয়েছে শুনেছি। শোন্, সেখানে বাঙালীর থুড়ি ইণ্ডিয়ানের মুখ রক্ষা করিস কিন্তু। মরুতরুণীদের মধ্যে শ্যাম ওয়েসিস।

—হ্যাঁ দেখিস, বসরাই গোলাপদের যেন অবহেলা করিস না। ঝটাপট তোড়া বেঁধে বানিয়ে চলবি। আর তোর সংস্কৃত কাব্যে কিন্তু আর কুলোবে না। এবার শুধু আরেবিয়ান নাইটস।

স্বয়ম্ বাধা দেবে—আঃ কি সব রসিকতা করছিস তোরা। তোদের মুখে দেখি কোন আগলই নেই।

এবার সরল চটে উঠবে।

ভাববে যে বন্ধুর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে বা হবে কি না তারও ঠিক নেই। ওরা এই সময়টুকু হালকাভাবে ওকে খুশীতে ভরিয়ে বিদায় দিতে চায়। আর ও-ই কিনা বাধা দিচ্ছে। ও তো যুদ্ধ নিয়ে থাকবে, আমরা থাকব কি নিয়ে?

সে বলবে—তবে শোন্। আগল আজ কোথাও নেই। না সমাজে, না চরিত্রে, না অর্থসামর্থ্যে। তুই হয়তো কিছুটা শান্তি পাবি, কারণ একটা আদর্শ তৈরী করে দুঃসাহসে জীবনমরণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবি। নিজের মনের উপর আগল চাপাবার পথ পাবি।

আর আমরা? এই বাঁধভাঙা প্লাবনের প্রতিরোধ করবার কোন ক্ষমতা আমাদের আছে? রাজ্যশাসন যারা করছে তারাই দুঃশাসন সেজে সমাজের বস্ত্রহরণ করছে। অন্ন লুণ্ঠন করছে। চরিত্র হনন করছে।

গোপীনাথও যোগ দেবে। চারদিকে বেড়াজালে বাঁধা মন মুক্ত হবার মুহূর্তে এই রকমই হয়ে থাকে।

সে তিক্ততাভরা স্বরে বলবে—প্রশাসন যা করছে সবই শুধু যুদ্ধ-প্রচেষ্টা বাঁচাবার আর বাড়াবার জন্য। বাইরের শত্রুকে ঠেকাবার আর ভিতরের শাসিতকে ঠকাবার জন্য। তুই তো স্বচক্ষে দেখেছিস লক্ষ লক্ষ লোক প্রাসাদনগরীর অন্ধকার পথে ঘাটে একটু ফ্যানের জন্য কান্নায় গলা শুকিয়ে মরল। ওদিকে খেতবাজার উজাড় করে খাবার জড়ো করে যুদ্ধের গুদামে রাখা হচ্ছে। রেসের ঘোড়ার পর্যন্ত র‍্যাশন বেড়ে গেছে। মিলিটারীকে খোস মেজাজে রাখতে হবে যে।

কর্তারা বলে—অন্ধকার? সে তো তোমাদেরই ভালোর জন্য। জান না, জাপানী বোমারু বিমানগুলি বর্মায় কি করেছে?

বুভুক্ষা? সে তো তোমাদেরই ভবিষ্যতের কথা ভেবে। আমাদের সৈন্যরা, অত্যাবশ্যক কাজের কর্মীরা পেট ভরে খেতে পেলে তবেই তো তোমরা বাঁচবে। আর বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ সিপাহী আসছে। তোমাদের বাংলা মুলুকে ঘাঁটি করে তোমাদের সারা ভারতকে বাঁচাবে। তোমরা অতিথি সৎকার করবে না?

নিজে অভুক্ত থেকে অতিথিকে খাওয়ানো সনাতন শাস্ত্রে প্রশস্ত বলে লিখেছে।

বেকারী? তার প্রতিকার তো তোমাদেরই হাতে। জাপানীরা এলে তাদের অগুনতি জনসংখ্যা এদেশে হাজির হয়ে মৌরসী পাট্টা গাড়বে। তার চেয়ে আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কাজ নাও। রেশন পাবে, মাইনে পাবে। আর স্বাধীনতাও পাবে একরকম মোটামুটি।

তবে যুদ্ধটা আগে শেষ হোক। তারপর সব দেখা যাবে।

তোমাদের বাঙালীদের উপর অবশ্য আমাদের বিশেষ ভরসা নেই। সিপাহী হবার বা চালাবার মত না আছে তাকত, না ইতিহাস। বিদ্যা তোমাদের ওই বন্দেমাতরম্ আর বোমার মাতন পর্যন্তই। কিন্তু না পার নিষ্ঠুর হতে, না পার হুকুম মানতে।

অতএব নিজের মুখের অন্নটুকুই আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নৈবেদ্য হিসাবে তুলে দাও।

আর যদি বিশেষ যোগ্যতা প্রমাণ করতে পার তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সক্ষম আর যারা স্বদেশী নও তারা রিক্রুটমেণ্ট অফিসে চান্স লড়ে যাও। অন্তত পক্ষে যদি নন-কমিশণ্ড অফিসার হতে পার, শুরু করবে লান্স-নায়েক থেকে। জাপানী যুদ্ধের যা তোড়জোড় তাতে ধাপে ধাপে নায়েক আর হাবিলদার হতে বেশী সময় লাগবে না।

যদি বরাত নেহাৎ ভাল থাকে আর ভি সি ও অর্থাৎ ভাইসরয়েস কমিশণ্ড অফিসার হবার জন্য নির্বাচিত হও তাহলে তো কথাই নেই। এক তারামার্কা জমাদার থেকে সুবেদার, সুবেদার মেজর হতে কত আর সময় লাগবে?

কিন্তু এসব কথা তো জানা কথা। হাড়ে হাড়ে বোঝা কথা। তাই গোপীনাথ বলবে, শোন্ ভাই, শ্যাম, তবু আজ আমরা খুশী। খুব খুশী।··

কারণ আমাদের বাঙালীদের ভাগ্যে এন সি ও, ভি সি ও হবার যোগ্যতাও প্রায় নেই বলে সবাই বলে। আর আমাদের ছেলে ছোকরারা কোন র‍্যাঙ্কে ঢুকবার জন্যই পাত্তা পায় না। সেখানে আমাদের স্বয়ম্ একেবারে এমার্জেন্সী কমিশনে নির্বাচিত হয়ে গেল।

বন্ধুরা যে কত খুশী হয়েছে তা অনুমান করেই স্বয়ম্ খুব খুশী।

কেন যে স্বয়ম্ হঠাৎ সটকিয়ে গেল আর কোথায় লুকোল তা ওরা জানত না। এতদিন স্বয়মের অবশ্য দেখাই নেই। কোথায় কোন্ ট্রেনিং-এ যাচ্ছে সেসব খবর জানতে চাওয়াও ঠিক নয়।

সরকার হঠাৎ স্পাই বলে সন্দেহ করে বসলে আর রক্ষে নেই।

কাজেই বন্ধুরা ওর সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছিল। এমনিতেই বালিগঞ্জে মামার নতুন বাড়িতে উঠে যাবার পরে দেখা-সাক্ষাৎ কমে গিয়েছিল। আর এখন তো কথাই নেই।

সিঙ্গাপুরে মালয়ে বর্মায় ব্রিটিশের যা দুর্দশা হয়েছে তাতে বন্ধুরা মনে করত যে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার চেয়ে ইটালীয়ান এমনকি জার্মানদের বিরুদ্ধে আফ্রিকায় চালান যাওয়া ভাল।

তাই তারা আফ্রিকার রণাঙ্গনে হয়তো বন্ধুকে পাঠানো হবে একথা ভাববে। এটাও স্বয়ম্ মনে মনে অনুমান করল।

এই কাল্পনিক কথাবার্তা ওর মনকে খুশীতে ভরে তুলল।

তারা তিনজন নিজেদের থ্রি মাস্কেটিয়ার্স নাম দিয়েছিল। তিন ছাত্র অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। ছিল এমন বন্ধুত্ব যা হয়তো পরবর্তী জীবনে নতুন করে গড়া সম্ভব হয় না।

পৃথিবীর পরিধি যাচ্ছে ছড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বের বুনোট যাচ্ছে ছিঁড়ে।

সেই জন্যেই প্রথম যখন স্বয়ম্ বালিগঞ্জে উঠে গেল ওদের যেমন আনন্দ হয়েছিল তেমন দুঃখও। উত্তর কলকাতার বুকচাপা বাতাস আর মাথা ছাপানো আকাশ ওদের কোনদিনই ভাল লাগত না।

কিন্তু দক্ষিণ কলকাতায়-যেটুকু উদার উন্মুক্ত ভাব এখনো আছে মানুষের ভীড়ে প্রয়োজনে তাও শেষ হয়ে যাচ্ছে। তা দেখেও তাদের খারাপ লাগত। তবু তিন বন্ধুর মধ্যে একজন দক্ষিণবাসী হয়ে যে ইটকাঠ নোংরার খাঁচা থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পেয়েছে তাতেই তারা খুশী ছিল।

চৌরঙ্গীপাড়ায় সিনেমা দেখতে গেলেই তাদের মন খারাপ হয়ে যেত। ইয়োরোপ আমেরিকার ছবি দেখে তাদের কেবলই মনে হতো যে ওই সব দেশের লোকরা যে কলকাতাকে প্রাসাদপুরী নাম দিয়েছে এটা একটা মর্মান্তিক নিষ্ঠুর পরিহাস।

ইংরেজী ভাষায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ হাস্য সব অলঙ্কারই আছে প্রচুর। কিন্তু প্রাসাদপুরী কথাটার মধ্যে যে শ্লেষ আছে তার তুলনা নেই।

অল্পে সন্তুষ্ট চোখ বুজে কুঁয়োর মধ্যেই পৃথিবী দেখতে অভ্যস্ত বাঙালী বলে এই তিন বন্ধু নিজেদের উপরই নিজেরা অসন্তুষ্ট ছিল। অথচ এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একটা কিছু করার মত উপায় বা শক্তি কিছুই নেই বলে নিজেদের

অসহায় মনে করত। শুধু মাঝে মাঝে ভাবত, ভগবান করবার হাত যখন দাওনি দেখবার চোখ আর ? ভাববার মন কেন দিয়েছ।

সেই ভাববার মন নিয়ে ওরা যে রাত্রে একসঙ্গে শেষ বার বেরিয়েছিল সেই দৃশ্যটা ওদের মনে পড়ল। মনে মনে সেটা আবার দেখে নিল।

*　　*　　*　　*

স্বয়ম্ হঠাৎ মিলিটারীতে নাম লেখাতে যাবার আগে ওদের তিনজনে শেষ দেখা হয়েছিল একসঙ্গে সিনেমা দেখবার সময়। ওয়াটার্লু ব্রিজ ফিল্ম। পৃথিবীর সব দেশেই অভিজাত বংশের সন্তানের সঙ্গে সাধারণ ঘরের সন্তানের প্রেমের যা সাধারণ পরিণতি হয়ে থাকে তারই স্মৃতি দিয়ে রচিত ছবি। সে ছবিতে লণ্ডনের প্রাসাদপুরীর সঙ্গে কলকাতার বিনাযুদ্ধেই ভাঙাচোরা ছবি দেখতে দেখতে তার চেহারা আর হাহাকারের তুলনা করে ওদের তিনজনেরই মনে অনেক ভাবান্তর হয়েছিল।

মেট্রো. .কে বেরিয়ে ধর্মতলাব ভীড়ে চ্যাপ্টা আর চোরাগোপ্তা গলি মার্কা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা দুই শহরের তুলনা না করে পারেনি।

সরল বলেছিল, ছবি দেখে সুখ পাই না ছাই একটুও। এত বোমার হামলা আর এত সার্চ লাইট দিয়ে আকাশের বুক ছুরি চালানো। তা সত্ত্বেও শহরটি সুন্দর। আমার এই দেশেতে জন্ম—সেটা ঠিক কথা। কিন্তু তা বলে এই দেশেতেই মরি ? কেন ? কেন এই দেশের চেয়ে ভাল পরিবেশে বাঁচব না ?

গোপীনাথ বলল, ঠিক তাই। এমন দেশ আমবা চাই অথবা এমন দেশ তৈরী করতে চাই যা আজকের এই বাংলা নয়। যেখানে নেই ভয়, নেই ভিখিরি। সাইরেনের চিৎকার দিয়ে ফ্যানের জন্য চ্যাঁচানি ঢাকতে হয় না। ওদের অন্ধকাবেও আকাশভরা আলোর নিশানা। আর আমাদের আঁধারে শুধু নোংরা হাহাকার।

আমরা বাঁচি না। শুধু জীবনধারণ করি। শেষ পর্যন্ত দেহরক্ষা করি। ছ্যাঃ! ছ্যাঃ!

বলেই গোপীনাথ রাস্তায় চলতে চলতে আব পাঁচজনের মত থুথু ফেলতে যাচ্ছিল।

কিন্তু হঠাৎ সেই অভ্যাসটা সে দমন করল। মরণের ছড়াছড়ির মধ্যেও যে পরিচ্ছন্ন জীবনের ছবি সে এইমাত্র দেখে এসেছে তার সঙ্গে থুথু ফেলা খাপ খায় না মনে হল।

[illegible] সে টান টান হয়ে মাথাটা উপরের দিকে তুলে ধরল। যেন [illegible] ব্রিজের উপর বেলুন ব্যারাজের বেড়াজাল টাঙিয়ে তাকে বোমারু বিমানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার ভার ওরই উপরে বর্তেছে। যেন সরকারী সাপ্লাই দপ্তরের একজন কনিষ্ঠ কেরানীর মাথা আর চোখ দুটো উপরওলার কড়া নজরের ভয়ে টেবিলের সঙ্গে লেপটিয়ে নেই।

স্বয়ম্ কিন্তু চুপ করে রইল। ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে ওর চোখে একটা আলোর রেখা ফুটে উঠেছে। সার্চলাইটের সন্ধানী আলো ওর আকাশে কি যেন খুঁজছে।

স্নেহশীল মামার টাকায় আর উপদেশে কেনা চাঁদনীর স্যুটটা আজ যেন আর চাকরীর বাজারে ঢুকবার পোশাক নয়। কেমন করে না জানি সেটার ঢং আর কাপড় আর কাট চাঁদনীর মার্কা ছেড়ে দিয়ে আর্মি অ্যাণ্ড নেভীর লেবেল নিয়ে ফেলেছে। সাধারণ অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী না হয়ে জীবনযুদ্ধের সেনানী হয়ে যাচ্ছে স্বয়ম্।

ছেঁড়া মোজার ফুটোগুলো জুতোর ভিতরে আপনা থেকে বুজে গেছে। চকচক করছে জুতোজোড়া—ঠিক ওই নায়কের বুটের মত। সারাদিন চাকরীর সন্ধানে অফিস পাড়ায় ঘোরা সত্ত্বেও।

মাথায় এখনো ক্যাপ নেই। কিন্তু সারাটা আকাশ মানে, ধর্মতলার সরু ট্রামে বাসে আক্রান্ত ভীড়ে চ্যাপ্টা সরু রাস্তাটার উপরে যে আকাশের ফালিটুকু দেখা যায় তার সমস্তটা যেন ওরই মাথার ক্যাপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এমনিতেই সাধারণ বাঙালীর তুলনায় সে একটু লম্বা। এত বছর গ্রামে ঘরের খেয়ে মায়ের যত্নে থাকার ফলে স্বাস্থ্য বেশ ভাল। কলকাতার মাজাঘষা পেয়ে আর ট্রাম বাসের পয়সা বাঁচানোর তাগিদে চলাফেরা করে সে বাঙালীর তুলনায় ক্ষিপ্র। সওদাগরী অফিসে চলনসই ভাল চাকরী পেতে হলেও ছিমছাম স্মার্ট হাবভাব দরকার। নিজেরই খেয়াল ছিল না যে স্বয়ম্ আপনা থেকেই এসব বিশেষত্ব অর্জন করে নিয়েছিল।

খেয়াল হল এতদিনে।

সে বুঝল যে সেও ওইরকম সটান দেহ নিয়ে মাথা উঁচু করে দ্রুতপদে তালে তালে এগিয়ে যেতে পারে।

দেহ তার ঠিক আছে। কাল রাত থেকেই মন কিসের আহ্বান পাচ্ছে। আত্মার মধ্যে একটা অব্যক্ত আকৃতি।

তাহলে বাকী রইল কি? শুধু এই বাইরের খোলস আর পচাজরা পরিবেশ? পরিণতি লাভ করবে সে শুধু এরই মধ্যে? পরিত্রাণ কি নেই কোথাও? কোনরকমে?

লিভ এ লিটল। লিভ এ লিটল! একটুখানি বাঁচো।

সেই বাঁচার জন্য মানুষ তো সব কিছুই করে।

এই যে লক্ষ লক্ষ লোক আজ কলকাতা নামক নরকে এসে ভীড় করেছে সেও তো শুধু বাঁচার তাগিদে। দেশে গাঁয়ে অন্ন নেই, পয়সা উপায়ের পথ নেই, খেটে খাবার মত মাঠ বা কাজ কিছুই নেই। তবু মানুষ বাঁচতে চায়। মাথা গুঁজবার ঠাই নেই শহরে। নেই কাজ পাবাব পাকা আশা। এমনকি দু মুঠো ভিক্ষার ভরসা।

তবু তো ওরা গ্রাম উজাড় করে শহরে চলে আসছে। ফুটপাতে ভিক্ষা করছে। গলিতে ঘুবছে পুলিসের ভয়ে। এয়ার রেড ট্রেঞ্চগুলি শোওয়া থেকে পায়খানা সব কাজে লাগাচ্ছে। নারীর ন্যূনতম লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থাও নেই। কিন্তু মানুষ নামক শকুনের নজর থেকে কুকুর বিড়াল রেহাই পেলেও ওরা রক্ষা পাচ্ছে না।

তবু মানুষ বেঁচে আছে। সরল আর গোপীনাথও বেঁচে আছে। ওরা দুজন তবু সংসারের তাগিদে যা হোক ছোটখাটো কেরানীর চাকরী জুটিয়ে নিয়েছে। সরকারী সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে। নিজেদের চোখ ঠেরে বলে কনিষ্ঠ করণিক। ভাষার ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে ভব্যতাতে নিজেদের ভবিয়ে নিতে চায়।

ওর নিজের জন্যও সে পথ খোলা ছিল। চেষ্টা করলে একটা চাক· জুটে যেত। কিন্তু বন্ধুদের পারিবারিক প্রয়োজন যত প্রবল ওর ততটা নয়। বালিগঞ্জে নতুন উঠে যাওয়া য়্যাটর্নী মামার সংসারে থেকে কনিষ্ঠ করণিক হওয়া মানায় না।

মানায় না জীবনের প্রয়োজনে।

মানায় না মনের প্রসাধনে।

বিশেষ করে একটা বিহ্বল রাতের সেই হাওয়াই হামলার ঝড়ো হাওয়া ওর সবকিছু তোলপাড় করে গিয়েছে। এখন সিনেমা দেখে ফেরার সময় শুধু সেই হাওয়াই দোলা দিচ্ছে।

হাওয়াই হামলা ছাড়া স্বাতীর ওই ব্লিটজ্‌ক্রিগ অর্থাৎ ঝটিতি আক্রমণের আর কোন বর্ণনা দেওয়া যায় না। সাগরের ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের হানা এসে গেছে তার পরে।

না হলে অত্যন্ত নীরক্ত এনেমিক চেহারার ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের মোড়ে তস্য বেশী ওল্ড অর্থাৎ বুড়ো ঝুরঝুরে বাড়িগুলির সামনে স্বাতী ওকে দেখতে পাবে কেন? আর কেনই বা চুপচাপ ওকে অনুসরণ করে মামার অফিসে এসে হাজির হবে?

স্বাতীর অনুরোধ নয়, হুকুম যেন ফিল্ড-মার্শাল গোয়েরিং-এর হামলার মতই। হঠাৎ আর হঠকারী দুই-ই। ব্যাপারটার আকস্মিকতা ওকে যেন সমুদ্রের ভাটার টানে ভাসিয়ে বের করে নিয়ে এল। থোড় বড়ি খাড়ার শুকনো বালুচর থেকে টেনে এনে। কল্লোলিত জীবনের ঢেউয়ে ঢেউয়ে।

আর টেনে নামালো নিজে ড্রাইভ-করা মোটরের ভিতরে নয়, শুধু আলোআঁধারি মায়ায় ঘেরা রেস্তোরাঁয় নয়, এমন একটা জীবনসমুদ্রের কেন্দ্রস্থলে যার আহ্বান কল্লোলের মত ওর কানে বাজছে।

অহরহ বাজছে। মহাসিন্ধুর অন্তর-রহস্য সঙ্গীতের মূর্ছনায় অহরহ মনে বাজছে।

স্বয়ম্‌কে বাঁচতেই হবে। সে বইয়ে পড়েছে, বক্তৃতায় শুনেছে যে তরুণরাই হচ্ছে দেশের আশা জাতির ভরসা। যৌবনই জীবনের সেরা সময়। ফুল ফোটানোর ঋতু। কিন্তু সে এমন রঙীন রোম্যান্টিক নয় যাকে রংয়ের মোহ থেকে সরানো যায় না।

কয়েকটি সন্ধ্যা, দুয়েকটি কথা তাকে প্রেমে মজায়নি। প্রাণে জাগিয়েছে।

সেদিন রাতে চাঁদের আলো তাদের বাড়ির বাগানে অন্যান্য রাত্রির মতই মায়াজাল বুনেছিল। মাঝে মাঝে একটা দুটো মোটরের সামান্য হর্নের ধ্বনিও বাহির বিশ্বের কোন্ প্রেমে ভরা গিরিপ্রান্তরে রাখালিয়া শিঙ্গার আবাহন ধ্বনির মত কানে এসে বেজেছিল।

তার পরেও সেই আবাহন সে পেয়েছিল।

কদিন পরের সন্ধ্যাতে এল মেট্রো সিনেমার এয়ার কণ্ডিশন করা বিলাসে, বেকারী আর বিষণ্ণতা থেকে খানিকক্ষণের জন্য মুক্তি।

সেটাও তো একটা হাওয়াই হামলা বটে।

সিনেমার পর্দায় দেখা বিমান আক্রমণ যেন সমস্তটা নির্বীর্য নীরক্ত অসহায়তার বিরুদ্ধে। যেন ওকে সব সময় প্লেনের গুরু গুরু আওয়াজে আহ্বান করছিল, ভয় করো না, বেঁচে ওঠো। বেঁচে থাকবার চেষ্টা করো। পড়ে পড়ে মার খাওয়া মোটেই বেঁচে থাকা নয়। মৃত্যুর বিরুদ্ধে মাথা তোলো। জীবনকে হাতে তুলে নিয়ে গর্জে ওঠো। তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাও।

সেই ক্ষণিকের মুক্তির আলো থেকে বেরিয়েই ধর্মতলার অন্ধকার। অধর্মের কারবারের হরেক ইসারা। অধর্মের অভিশাপের ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস।

তার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে স্বয়ম্ নীরবে গোপীনাথের দিকে আবার তাকাল।

গোপী, আমাদের গুপী পর্যন্ত মৃত্যুর উপরে জয়ী জীবনের ছোঁয়া পেয়ে গেছে। এক মুহূর্তের জন্য হলেও পেয়েছে। তা না হলে ছেলেবেলা থেকে টনসিলের রোগে ভোগা গুপী যে রাস্তায় চলতে চলতে রাতদিন আর থুতু কাশে ফেলে—বারণ করা সত্ত্বেও ফেলে—সেও এই নোংরা অভ্যাসটা দমন করে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে তাকাচ্ছে।

এই মুহূর্তে সাপ্লাই দপ্তরের থার্ড ডিভিসন কেরানী সে নয়। সে একটা গোটা মানুষ। ছকু খানসামা লেনের পাঁজর বের করা নোনা ইঁটের বাড়ি তাকে ঘিরে রাখতে পারেনি।

যে লণ্ডনের ছবি তারা এইমাত্র দেখে এসেছে সেখানে এক মাসের মধ্যে জার্মানরা দুশো আটষট্টি বার হাওয়াই হামলা করেছে, ছয় হাজার টন বোমা আর নয় হাজার আগুন জ্বালানোর ইনসেনডিয়ারী ঝেড়েছে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আগুনে পুড়ে গেছে।

তবু ওরা রুখে দাঁড়িয়ে আছে; রুদ্ধশ্বাসে লড়ে যাচ্ছে।

এই মুহূর্তে আমাদের গুপীও ওই লণ্ডনের আজকের নাগরিক হবার যোগ্যতা অর্জন করতে চলেছে।

একটা নোংরামি, আজন্ম অভ্যাসের নোংরামির উপর উঠতে পারাও বলিষ্ঠতার লক্ষণ। স্বয়ম্ মাথা টানটান করে উপরের দিকে তুলে চলতে লাগল।

কার দিকে স্বয়ম্ তাকিয়ে আছে তা সে নিজেই জানে না। আকাশের কোন্ নক্ষত্রটির দিকে? কোন্ অজানা অধরা ভবিষ্যতের দিকে?

কোন্ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ আলোর মশালের দিকে সে তাকাবে? আলোর মশাল।

হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আমেরিকার স্বাধীনতার মূর্তির হাতে তুলে ধরা মশাল।

সেই মশালের আগুন যেন দুঃখ থেকে, দারিদ্র্য থেকে মুক্তির রূপ ধরে বিশ্ব নিখিলের সবাইকে আহ্বান করছে। আমেরিকার বন্দরে ঢুকবার প্রবেশপথেই সেই মূর্তি। কিন্তু সেটি সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার জন্য মহান

বিপ্লবী ফরাসীদের সৃষ্টি। তাই সেটি আমেরিকার একলার মুক্তির মূর্তি নয়। বিশ্বের সকলের।

তাই সে পশ্চিমের নতুন পৃথিবী থেকে পূর্বের পুরানো পৃথিবীকে আবাহন করছে।

বিশ্বের সকলের মুক্তি না হলে মুক্তির সার্থকতা নেই।

সেই মূর্তির বেদীমূলে কবি এমা ল্যাজারাসের রচিত যে কবিতাটি খোদাই করা আছে তাও স্বয়মের মনে পড়ল। মূর্তির পায়ের কাছে একটা শিকল ভেঙে পড়ে আছে। আর মাথার উপরে তুলে ধরা বরাভয়ের মশাল।

পরিশ্রান্ত দরিদ্র যারা
পুঞ্জীভূত মানুষের জটলার মধ্য থেকে
যারা মুক্ত বাতাসে
নিঃশ্বাস নেবার জন্য ব্যাকুল
জনভারাক্রান্ত তটপ্রান্তের ভাগ্যহত
পরিত্যক্তের দল,
সেই গৃহহীন জীবন বিড়ম্বিতদের
পাঠাও আমার কাছে।
স্বর্ণ সিংহদ্বারের কাছটিতে আমার
প্রদীপটি তুলে ধরে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

সেই মূর্তি আর সেই কবিতার কথা মনে পড়তে স্বয়মের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার চোখ দুটি নিজের দেশের আকাশে সেই ডাক, সেই মুক্তি খুঁজে বেড়াতে লাগল। আমাদের কবিও তো বলেছেন কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়, আয় তোরা সবে ছুটিয়া। অন্নপূর্ণা মা আমাদের।

এমন সময়ে সে হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল।

কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে স্বয়ম্ দাঁড়িয়ে পড়ল। বন্ধুরাও দাঁড়াল। পায়ের কাছে একটা মৃতদেহ। ওরা থতমত খেয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে অন্ধকার ফুঁড়ে যেন নানা রকম লোক এসে হাজির। নানা মতলবের ধান্ধায়। নানা জগতের জীব।

একজন ফস করে একটা অশ্লীল কথা বলে উঠল। তারপর বলল, কি বাওয়া, মাল-টাল টেনে চলছ বুঝি? আরো চাই নাকি? খাঁটি বিলিতী আছে।

আর একজন মুখে একটা সিটি মারার আওয়াজ করে ফিসফিস করে বলল, হলদে পাখী চলবে? তাজা মাল। এই কাছেই আছে। গোরা-পসন্দ।

পেছন থেকে একজন বলে বসল, সস্তায় পাবেন, মশায়। আনকোরা কুমারী। হিম্মত আছে?

মুখ নীচু করে তিন বন্ধুতে দেখল যে গলির মোড়ে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। কোন ভিখারী হবে। খেতে পায়নি বলে মরেছে।

গোপী ফিসফিস করে বলল, বেচারা বোধহয় বড় রাস্তায় এসে খিদেতে মরতে সাহস পায়নি। গোরাদের নজরে পড়তে পারে বলে পুলিসে খেদিয়ে দিত। তবু শেষ মুহূর্তে বাঁচবার আশায় বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত এসেছিল।

সরল বিষণ্ণভাবে বলল, আলোর মধ্যে মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে যেতেও সাহসের দরকার হয়। সে সাহস আমাদের বাঙালীদের আজ নেই।

স্বচ্ছন্দ জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, স্বাভাবিক মরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মূর্তি হয়ে পড়ে আছে এই মৃতদেহ।

না। ওয়াটার্লু ব্রীজের আশে পাশে কোন গলিতে অনশনে অসহায় ভাবে কেউ মরে পড়ে থাকবে না।

এক ধাক্কাতে স্বয়ম্ সচেতন হয়ে উঠল। সে শুধু অস্ফুট স্বরে ঋগ্‌বেদ থেকে আওড়াল—দেবতারা ক্ষুধাকে আমাদের মৃত্যুর বিধান করে দেননি। আমার মনুষ্যত্ব, দেশের মনুষ্যত্ব ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন করে। বিধাতার অভিপ্রায় এ নয়। ন বা উ দেবাঃ ক্ষুধমিদ্বধম্।

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের একশ সতের সূক্তটি যেন ওর মনে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহের কাজ করল।

ন বা উ দেবাঃ ক্ষুধমিদ্বধং।

উতাশিতমুপ গচ্ছন্তি মৃত্যবঃ॥

স্বয়মের স্বগত উক্তি নিজের মনে মনে বলাটুকু মুখের কথায় সুন্দরভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

একবার বলে যেন তৃপ্তি হয় না। আশ মেটে না। আবার বলল। আবার আবৃত্তি করল। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে থাকল স্বাতী নক্ষত্রের সন্ধানে।

সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের গতি একটু বেড়ে গেল।

খেয় থেকে উপনিষদে এগিয়ে গেল সে। যুগে যুগে মানুষ যে সম্মুখের পথ বেয়ে এগিয়েই চলেছে। পেছিয়ে পড়েনি, থেমে থাকেনি। কারণ পিছু হটা বা থাম্ হওয়াই হচ্ছে মৃত্যু।

জীবনের মধ্যে মৃত্যু যে হমৃক্তির চেয়ে অনেক বেশী দুঃখের। অনেক বেশী দহন করে। সেই মৃত্যুকে সে অতিক্রম করবে।

স্বয়মের মনের আবেগ চরণের বেগে রূপায়িত হয়ে উঠল। চরৈবেতি। চরৈবেতি।

—কি রে? এত জোরে পা চালাচ্ছিস কেন? ব্যাপার কি?

—তাড়া কিসের রে? আমাদের বাড়ি গিয়ে স্নান করে কাপড় ছেড়ে নিবি। তারপর বালিগঞ্জে গেলেই হবে।

কিন্তু কোথায় স্বয়ম্?

অন্ধকারে ওকে আর দেখা গেল না।

১৪

শুধু রূপান্তর নয়। একটা জন্মান্তর।

সেই স্বয়ম্ভু রায়। স্বয়ম্ নয়, শ্যাম নয়, একেবারে শ্যামসুন্দর। ধড়াচূড়া পরা। শুধু মোহন বাঁশীর বদলে মহান অসি।

ক্ষীণদৃষ্টি সরলের চোখে পীতবসন আর খাকী বসনে তফাৎ নেই।

আংকল স্যামের দেশের মার্কিন ধাঁচের স্মার্ট সামরিক পোশাক। বৃটিশ সেনাদলের এমার্জেন্সী কমিশন অফিসার। নিশ্চয়ই ওকে মিলিটারী মেসে স্যামি বলেই ডাকে।

সরল আর গোপীর ক্লান্ত বিকেলটা হঠাৎ বীর বেশে স্বয়ম্‌কে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

একটু ইতস্তত করে, একটু কেশে, একটু হেসে গোপীনাথ বলে ফেলল, হ্যালো স্যামি। এতদিন পরে হঠাৎ দেখা। তোকে কি বলে ডাকব ভেবে পাচ্ছি না। তাই ওরই মধ্যে একটু মিলিটারী কায়দা করে নিলাম। বন্দুকধারী বন্ধুর বর্ণনা তো বৈষ্ণব পদাবলীতে নেই।

ওই সহজ ভাবটুকু স্বয়মের মনের বাঁধ খুলে দিল। এতক্ষণ কোথায় যেন একটু বাধা ছিল মনের ভেতরে। সেটাও উড়ে গেল। সহজ হয়ে স্বয়ম্ ওদের দুজনকেই জড়িয়ে ধরল।

বলল, ওরে স্যামের খোলস ছেড়েই তোদের কাছে এসেছি। যা খুশি ডাক্ আমাকে। আমি সেই স্বয়ম্‌ই আছি। ফ্রণ্টে যাবার আগে সেটুকু জানিয়ে যেতে এলাম।

সরল খুশি হয়ে বলল, তা তো নিশ্চয়ই আছিস। কিন্তু সেই রাতের আঁধারে যে সটকালি, আর তো দেখাও দিলি না, চিঠিও দিলি না। তোর মামার বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানলাম, হঠাৎ মিলিটারীতে যাবার জন্য দরখাস্ত করেছিলি। আর তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তোকে নিয়েও নিয়েছে।

গোপী বলল, জানিস শ্যাম, এত খুশি হয়েছিলাম যে তুই না জানিয়ে পালিয়েছিস বলে রাগ পর্যন্ত করতে পারিনি। এমন কি খোঁজ-খবরও করিনি

পাছে কর্তারা আমাদের বাউণ্ডুলে ব্যাকগ্রাউণ্ডের রিপোর্ট পেলে সেটা তোর বিরুদ্ধে যায়।

স্বয়ম্ হেসে ফেলল। আজ তার হাসার অধিকার হয়ে গেছে। সাফল্যের হাসি। সার্থকতার হাসি।

সে বলল, তা মিথ্যে বলিসনি, ভাই। প্রথমে ফিল্ড টেস্টগুলোতে বেশ ভাল করেই তরে গেলাম। তবুও আমি ভেবেছিলাম যে 'ভাইভা'তেই ভেস্তে যাব। কিন্তু একটা নতুন ধারা সবে চালু হয়েছে। খাস বিলেতের ওয়ার অফিসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চালানো নিয়ম। তাতে শুধু ব্যাকগ্রাউণ্ডই দেখে না, সাইকলজিস্ট, সাইকিয়াট্রিস্ট এরাও সব থাকে। এমন কি খাস মেমসাহেব ওয়াক-আই পর্যন্ত। সবার হাত দিয়ে যেতে হয়।

তার পর গভীরভাবে যেন নিজের মনে বলল, বাহুর বলই শুধু নয়, মাথার বুদ্ধি আর মানুষ চালানোর ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব সব যাচাই করে সবাই মিলে। এই যুগের যুদ্ধে নাম লেখাতে হলে অনেক কিছুই চাই।

গোপী ব্যাপারটার গাম্ভীর্য হালকা করে তোলার জন্য একটু ঠোঁট চেটে নিল, অ্যাঁ, খাস মেমসাহেব? তোকে দেখেই বোধহয় বিরহিণীর মন নরম হয়ে গেল।

—না রে, না। ওরা শুধুই ব্যথা জাগানিয়া। বিরহের বোঝা বইবার জন্য সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে এই পোড়া দেশে আসেনি। মিলন বিরহ এসব শিকেয় তুলে রেখে রিক্রুটদের ঠিকুজী কোষ্ঠী নিয়ে বসেছে। আমায় কি জিজ্ঞেস করল জানিস?

আমার ডোসিয়ের (খবরে ভরা কাগজপত্র) দেখে জিজ্ঞেস করলে—স্যানসক্রিট পণ্ডিটের ছেলে টোল ছেড়ে গুলী চালাবার কাজে নামতে চাও কেন?

শুনে থ হয়ে সুন্দরীর চোখের দিকে তাকালাম।

—কি দেখলি? কটাক্ষই শুধু, না আর কিছু?

—সযত্নে প্রসাধন করা মুখে শোভা পাচ্ছে দুটো বন্দুকের নল। ডি বি বি এল যাকে বলে। ডাবল ব্যারেল ব্রিচ লোডিং।

—হায় হায়। আমি হলে তখনি নল দুটোর সামনে এই বুভুক্ষু বুকখানা সটান খুলে দিতাম। তা নসীবে তো সে সুখ নেই।

সরল এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার তার পালা। সে বলল, শিবেরও অসাধ্য সে সুখ আমাদের দেওয়া।

গোপী ক্ষেপে গেল, কেন, কেন? শিবঠাকুর নিজে তো তপস্যা পর্যন্ত ভেঙে উমার শ্রীচরণে নিজেকে উৎসর্গ করে ফেললেন। আর আমাদের বেলা শুধু বিলাপ? অবশ্য বিলাপ করতেও রাজী আছি, তার আগে মদনের দয়া যদি ছিটেফোঁটা পাই।

সরল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, কোথায় পাবি মদনের দয়া? পুষ্পধনুর পথ এই বাঙালী পট্টীতে এই চল্লিশের দশকে কোথায় খোলা পাবি বল্? যদি বা খোলা থাকে অলিখিত বাধাতে ভরা সে পথ। মেঠো চোরকাঁটার মত ছেয়ে আছে।

এতক্ষণে স্বয়ম্ হেসে ফেলল, অবশ্য আমাদের প্রভুদের দেশে ওরা মেঠো চোরকাঁটায় ঘাবড়ায় না।

—অ্যাঁ, তুই জানলি কি করে? তোদের ট্রেনিং ক্যাম্পেই বুঝি··· ?

—না রে, না। ওদেশে স্পাইরা কি করে গোপন খবর বের করে আনে, কি করে চালাকি না বুঝে মিলিটারীরা খবর ফাঁস করে দেয় তার ছবিতে দেখিয়েছে লণ্ডনের হ্যাম্পস্টেড হীথের লীলাভূমি। ভাগ্যিস বাঙালী ছোকরারা সে সব ছবি দেখেনি।

মাথা নেড়ে সরল বলল, দেখলে ভালই হত রে, ভাই। এই পোড়া দেশের ন্যাড়া মাঠে শুধু বেলতলাই সার।

একটু কেশে সে আবার শুরু করল, তা শ্যাম, তোর সেই স্যানস্ক্রিট মার্কা সুন্দরীকে 'হলা পিয়সহি' বলে গলাগলি করে নিয়েছিস আশা করি।

স্বয়ম্ হালকা ভাবে বলল, ওদের বৃন্দাবনের গোচারণভূমি খুব ছড়ানো জায়গা। পাড়ার মধ্যে খুঁটির রশিতে বাঁধা গরুর মত ওদের অবস্থা নয়। কাজেই স্যানস্ক্রিট সুন্দরীর দিকে নজর দেওয়া ঠিক হতো না।

হেসে সে বলল, অবশ্য ওকে ঘায়েল করলাম ওরই প্রশ্ন দিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম—আপনি যখন স্যানস্ক্রিটের কথা তুললেন, জানেন কি যে আমাদের প্রথম মহাকাব্য রামায়ণে বলেছে যে জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী? সেই জন্মভূমির রক্ষার জন্য অস্ত্র ধরতে আমার ধর্মই শিখিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেক খাঁটি ইণ্ডিয়ানের উচিত যুদ্ধ করতে শেখা।

একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল দুই বন্ধু। সাবাস। বন্দুকের গরম নল কেমন নরম হয়ে গেল তারপর?

—নরম হয়ে সে এক ভারী ওজনের হোৎকা কর্ণেলের দিকে তাকাল।

—অ্যাঁ, তোর দিকে নয়?

—না। বলেছি তো কাজের বেলা ওদের রসকষ থাকে না। কড়ায় গণ্ডায় ডিউটি পুষিয়ে দেয়। তায় দেশরক্ষা করতে বিদেশে এসেছে।

—এবার কর্ণেলের কাহিনী বল্।

—ঝানু কর্ণেল এতক্ষণ যেন রাইফেল তাক করেছিল আমার দিকে। বুলেটের মত হেঁকে বলল যে তোমাদের বেঙ্গলে এত চালের অভাব, এত অশান্তি। তবু সেখানে মিলিটারী 'বেস' ঘাঁটি বসানো হয়েছে এটা কি তুমি ভাল মনে কর? এমন সব কাজ তোমায় করতে হতে পারে সেখানেই, তোমার কলকাতাতেই, যা করতে তোমার মন চাইবে না। তুমি তখন কি করবে?

—এমন সব প্রশ্ন? একেবারে হিটিং বিলো দি বেল্ট?

—না, সোজা ফ্রণ্ট্যাল অ্যাটাক। সোজাসুজি খোলাখুলি প্রশ্ন করাই ঠিক এসব ব্যাপারে। আমি বেশ টান টান করে ঘাড় তুলে বলেছিলাম যে আপনারা যখন জানেন আমার ব্যাকগ্রাউণ্ড, তখন আপনারা এটাও বুঝবেন যে আমি শাস্ত্র মেনে চলি। আমাদের রামায়ণে আছে যে প্রজারক্ষণের জন্য নিষ্ঠুর হওয়াও চলে। এটাই সনাতন কর্তব্য। কর্তব্যং রক্ষতা সদা। গোটা শ্লোকখানার অনুবাদ করে শুনিয়ে দিলাম।

—অ্যাঁ—তুই বললি একথা? তার মানে ওরা যে যুদ্ধ চালাবার জন্য সব খাবার কেড়েকুড়ে নিচ্ছে, শত্রুকে বঞ্চিত করবার জন্য আমাদেরও ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা নষ্ট করে দিচ্ছে সে সব সমর্থন করবার মত মাল-মশলা তুই ওদের হাতে তুলে দিচ্ছিস? এই তোর ধর্ম?

—না, আমার ধর্ম আমাদের দেশ আমাদের দেশবাসীকে রক্ষা করা। নির্বীর্য নিঃসহায় লোকেরা সে ধর্ম পালন করতে পারে না। আমরা নিজেদের স্বাধীনতার যুগের শাস্ত্র ভুলে গেছি বলেই আজ এই অবস্থা।

একটু চুপ করে থেকে স্বয়ম্ আবার বলল, ভুল বুঝিস না তোরা। আমি কেবল রাইস সোলজার হবার মতলবে যুদ্ধে যোগ দিইনি। ভেবে দেখ্ শাস্ত্রের বাণী—ন্যায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। মনে কর স্বামীজীর বাণী—খালি পেটে ধর্ম হয় না। ম্যয় ভুখা হুঁ কোন্ ধর্মের মন্ত্র? না খেয়ে না খেটে বসে শুয়ে মরা কোন্ ধর্ম?

—তা বলে তুই ইংরেজের দোষ ঢাকবি? গুণ গাইবি?

—ইংরেজের নুন তোরা খাচ্ছিস না? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কি তোরা ইংরেজকে ভবিষ্যতে হঠাবার বা জাপানীকে বর্তমানে রুখবার কোন বিদ্যা অর্জন করছিল? বরং আমি যা শিখেছি তা—যদি বেঁচে ফিরে আসি…

বলতে বলতে স্বয়ম্ দেখল যে বন্ধু দুজনেরই মুখ ম্লান হয়ে এসেছে।

তাই সে মৃদুভাবে বলল, যদি বেঁচে ফিরে আসি আমি আর্মিতেই থাকব। আরো বাঙালী যাতে যুদ্ধবিদ্যা শেখে, অন্তত অবাঙালীর উপর বাংলা দেশ রক্ষার ভার সঁপে দিয়ে নিজেরা গলিতে গলাবাজি আর রকে রকবাজি না করে সেই ব্রত নেব। তখন তোরা আমার পাশে এসে দাঁড়াবি? আমার পলিটিক্স নেই। কিন্তু আমার দেশ আর আমি আছি।

ঘরের আবহাওয়া বড় ভারী হয়ে উঠল। এটার জন্য স্বয়ম্ ছুটতে ছুটতে বন্ধুদের কাছে আসেনি। আজ সে একটি বড় কাজ পেয়েছে। আজ তার ভবিষ্যৎ যেমন অনিশ্চিত তেমনি অসীম। তাকেই হাওয়াটা হালকা করে বন্ধুদের হাসিমুখ দেখে যেতে হবে।

তা না হলে মিলিটারী জীবনে সে কি ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে? মিলিটারী সেজে কি সামাজিক গুণ শিখেছে?

তাই স্বয়ম্ সকালে খাওয়া খালি চায়ের কাপ দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, তখন কিন্তু শুধু চায়ে চলবে না। আমরা সবাই ফ্লাইং টাইগার হয়ে যাব। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেশে আমরা হব উড়ন্ত বাঘের দল। হাসিতে হৈ-হল্লাতে জীবন উপছিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে—যেমন দেখেছি বর্মা ফেরৎ 'এ ভি জি' আমেরিকান ভলান্টিয়ার গ্রুপ পাইলটদের।

গোপী বলল, আমরাও হঠাৎ এমন একটা উড়ুক্কু এয়ারম্যানের ঝাঁক দেখেছিলাম চৌরঙ্গীতে। যেন সদ্য কোন হলিউডের সেট থেকে নেমে এসেছে। গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, জিপ ফ্যাসনার লাগানো। হরেক রঙের হাওয়াই হাওয়া শার্ট। পায়ের গুলি পর্যন্ত উঁচু বুট। গলায় চকরা-বকরা বংদার রুমাল বাঁধা। ওরাই বোধহয়?

—বাঃ! তোর তো দেখছি দিব্যি জ্ঞাননেত্র খুলে গিয়েছে। রতনদের ঠিক চিনে নিয়েছিস। তোর হবে। দেখিস ঠিক হবে।

স্বয়মের মুখে রহস্যের আভাস দেখে সরল বলল, কেন, আরো কিছু আছে নাকি?

—আছে বলে আছে? আঁটোসাঁটো হিপ পকেটে আছে বুর্বন মদের চ্যাপ্টা ফ্লাস্ক আর দিল নামক খোলামেলা দরিয়াতে ফুর্তির লাল ডিঙা। আর, আর নয়ন ভরিয়া হেরে নেশা।

—তার মানে?

—মানে বোঝা সবার কর্ম নয়। ওরা অনেকেই চোখ বুজে নিট ড্রিঙ্ক করে। বলে যে খাঁটি জিনিস জলো করলেই ভেজাল হয়ে যাবে।

—কেন? সোডা?

—সোডাও জলই হল। ওরা বলে যে গ্লাসের দিকে তাকালেই জিভে জল এসে যায়। তাই জল মিশিয়ে ভেজাল না করে খাঁটি খাওয়াই ভাল।

—সাবাস।

—আরো আছে। চোখ বুজে ওরা দিব্যচোখে দেখতে পায় যে ওরা সব মোল্লা পুরুত আর পাদ্রীর চেয়ে অনেক অনেক আগে স্বর্গারোহণ করতে পারবে। কারণ ওই সব মহাত্মাদের চেয়ে ওদের পুণ্যের জোর বেশী।

—এত সব দুষ্কর্মের পরেও?

—ওরে, তোরা শুধু দুষ্কর্মই দেখছিস। কিন্তু এরা যে ওনাদের চেয়ে অনেক বেশী ভগবানের নাম স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে। বুঝলি কিছু?

—ওদের বোমা বাজির সংকীর্তনের ঠেলায়।

—ওদের তাহলে কোন দুঃখ ভাবনাই নেই বল্।

—ছিল প্রথম প্রথম। রেঙ্গুনে এসে লড়াইয়ের কোন মোকা মিলল না। জাপানী জিরো ফাইটারের বদলে মশার এয়ার স্কোয়াড্রন আর আরশোলার ট্রেঞ্চ ওয়ারফেয়ার। অবশ্য অন্য দিকে ওরা পুষিয়ে নিয়েছিল।

—ওহো—সেটাই তো আসল খবর। বল্ না খুলে।

—ওদের রোজনামচা শুরু হতো বরফে ঢাকা বিয়ার দিয়ে সকাল নটায় আর শেষ হতো মাঝরাতের পর জ্যাম আর ডিম দিয়ে। তার আগে তরোয়ালের ধারের মত তেজী পিংক জিন আর কারী।

—আমেরিকান কিনা।

—শুধু তা বললেই চলবে না। ওরা তো শুধু লক্কা পায়রা 'প্লে বয়' নয়। ওদের টোমাহক বিমানগুলোর নাকে আঁকা থাকে হাঙরের লাল মুখ ঝকঝকে দাঁতের সারি আর তীক্ষ্ণ চোখ। আর প্লেনের বডিতে আঁকা উদ্ধত ঘাড় আর উদ্যত দাঁত দেখানো বেঙ্গল টাইগার। তার পাশে দুটো পাখনা আঁকা—যেন

ভি ফর ভিকটরি। কিন্তু মনে রেখো, কত সম্মান বাংলাদেশের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। মহীয়সী নেত্রী ম্যাডাম চ্যাঙ্গ-কাই-শেক বলেন—ওদের ডানা থাকুক আর নাই থাকুক, ওরাই আমার দেবদূত।

একটু চুপ করে থেকে স্বয়ম্ আবার বলল, ভেবে দেখ্ ভাই, বেঙ্গল টাইগার।

বেঙ্গল টাইগার!

ওদের তিনজনেরই মনে কথা দুটো অদ্ভুত ঝঙ্কার তুলল। অনেক আলোড়ন। একসঙ্গে ওরা তিনজনেই স্বপ্ন দেখত মানুষের মত মানুষ হবে। তার বদলে দুজন হল গিয়ে কেরানী। দিনগত পাপক্ষয় করে দেহকে বাঁচাবে থোড়বড়ি খাড়া দিয়ে—দেহরক্ষা না করা পর্যন্ত।

আর তৃতীয়জন অনির্দিষ্ট অজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই পাপক্ষয়ব গ্লানি এড়াতে গিয়ে। হয়তো ও একদিন বেঙ্গল টাইগার হয়ে বেরিয়ে আসবে মাথা উঁচু করে।

ইতিমধ্যে বেঙ্গল ঘোর জঙ্গলে পরিণত হতে চলেছে। সে জঙ্গলে শকুনি আর হায়েনা শিকার করে বেড়াচ্ছে। ভালুকরা নাচছে। গণ্ডাররা গা বাঁচিয়ে সরে যাচ্ছে। কিন্তু টাইগার কোথায়?

—সে তো শুধু স্বপ্ন।

দুই বন্ধুই পরস্পরের অজান্তে বলে উঠল, সে তো শুধু স্বপ্ন। যে স্বপ্ন যুদ্ধের বন্যায় নৌকাডুবি হয়ে গেছে। সে ডুবে যাওয়া নৌকো আর উদ্ধার হবে না।

স্বয়ম্ বলল, না, উদ্ধার করতেই হবে। বিশ্বাস রাখ্, তোরা নিজেদের ওপর। স্বপ্নগুলো নিজে থেকেই নতুন রূপ নিয়ে ফিরে আসে।

—আশ্চর্য! শ্যাম, তুই এখনো কত ছেলেমানুষ আছিস।

—তোদেরও তাই থাকতে হবে, ভাই। সব সময় মনে রাখিস মরণ সর্বদাই খুব তাড়াতাড়ি হাজির হয়। এমন কি নব্বই বছর বয়সেও যখন আসে তখনো। তাই তোরা ছেলেমানুষ থাকবার সাধনা কর মনে মনে।

সরলের হঠাৎ মনে হলো যে বন্ধুকে একটু সাবধান করে দেওয়া উচিত। আজ নতুন চাকরীতে ঢুকে সাহেবসুবোদের সঙ্গে তালে তাল ঠুকে সে চলেছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে বেঁচে ফিরে এলেও পুনর্মূষিক হতে হবে। এমার্জেন্সী কমিশন তো স্থায়ী নয়। যুদ্ধও স্থায়ী নয়।

কিন্তু এই নতুন উচ্ছ্বাসের মুখে সে কথাটা উল্লেখ করবে কোন্ মুখে?

শেষ পর্যন্ত সে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবি কিপলিং থেকে একটা কবিতা আওড়াল। বলল, মনে আছে সেই কবিতাটা ?

ওরে কলনা টমি তসকা টমি ;
নিকালো উসকো জন্তু।
দেশের রক্ষাকর্তা ও সে
লড়াই বাধলে কিন্তু।

আজ কর্তারা তোদের মাথায় তুলে রাখছে, কিন্তু ওরা নিজেদের জাতভাই সাদা টমিগুলোকে পর্যন্ত কি চোখে দেখে এই কবিতাই তার প্রমাণ। কাজেই যা মাইনে দেবে আর যে সব কর্তাব্যক্তির সঙ্গে চেনা পরিচয় হবে সে সব ঠিক করে রাখিস। আখেরে কাজে লাগবে।

স্বয়ম্ বলল, সে কথা ঠিক বলেছিস ভাই। টমিরাও আমারই মত বেকার থাকত বলেই সৈন্য হত। প্রাথমিক ট্রেনিং-এর পর বছর ছয়েক বিদেশে থাকত। হয় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠানদের ছুরি বা গুলী থেকে গা বাঁচিয়ে চলা আর ভাগ্যবান হলে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে বা মিলিটারী রাম মদে সাঁতার কাটা। সারা দিন-রাত্রি প্যারেড আর খানাপিনা, বিউগিলের মিঠে আওয়াজে ঘুম আর সস্তা বিয়ারে আরামে কেটে যেত। তবে এখন আর ঠিক সে আর্মি নেই। আমাদের সঙ্গে বহু শিক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্য। ন্যাশনাল সার্ভিস করতে এসেছে। আমার ইণ্টারভিয়্যুতে যে কর্ণেল ছিল সে অক্সফোর্ডের পাস। আমি তরে যাবার পরে নিজে থেকে দেখা করতে এল। আর কি বলল জানিস ? শুনে আবাক হয়ে যাবি।

ওরা দুজনেই আগ্রহ দেখাল।

—কর্ণেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করতে এসেছে। সেই সাম্রাজ্য আমাদের দেশে যে তৈরী করল সেই ওয়ারেন হেস্টিংসের ১৭৮৬ সালে লেখা গীতার ভূমিকা থেকে আমায় শুনিয়ে দিল যে ভারতের বৃটিশ রাজত্ব যখন বহুদিন শেষ হয়ে যাবে আর তার ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার উৎস সবাই বেমালুম ভুলে যাবে তখনো ভারতীয় দর্শনের সৃষ্টিকর্তারা বেঁচে থাকবেন।

সে আমায় আরো বলল, আজকের বৃটিশ শাসন আর বেশীদিন নয়। কিন্তু তোমাদের চিরদিনের সম্পদগুলি গোলাগুলি আর সামরিক পোশাকের আড়ালে যেন ভুলে যেয়ো না।

এমন কথা এক আমার মা-ই আমায় বলতে পারতেন। আর কেউ নয়।

সরল বলল, আশ্চর্য তোর এই অভিজ্ঞতা, শ্যাম। তোর ভাগ্য ভাল। আমরা খুব সুখী। তবু, তবু একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে থেকে যাচ্ছে। যে ইংরেজ আমাদের বুটের তলায় রেখেছে, দেশটা দেড়শ বছর ধরে লুঠ করেছে আর এখন ছারখার করে দিচ্ছে বলে গান্ধীজী···

—থাক থাক। আমি সংক্ষেপে তার জবাব দিচ্ছি। তোরা নিজেরাও সে উত্তর জানিস। কিন্তু মানিস না। বা মানতে সাহস নেই। গান্ধীজী বলেছেন যে জানা শয়তানের চেয়ে অজানা শয়তান ভাল। কিন্তু সেকথা কি ঠিক?

একটু থেমে সে আবার বলল, অজানা শয়তান যদি বেশী খারাপ নাও হয় তার নতুন উৎসাহে সাম্রাজ্য শাসনের ঠেলা এখনকার চেয়ে বেশী সাংঘাতিক হবে। স্বাধীনতা সংগ্রাম যতটা এগিয়েছে, ইংরেজ যতটা নরম হয়েছে আমাদের অবস্থা তার চেয়ে বেশী খারাপ হবেই—যদি নতুন প্রভু এসে গেড়ে বসে। আমাদের আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। সে কি সাংঘাতিক সম্ভাবনা ভেবে দেখ্। তাছাড়া স্বামীজী কি বলেছিলেন তাও ভুলিস না।

ওরা দুজনেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

—স্বামীজী বলেছিলেন যে ইংলণ্ডের মাটিতে তাঁর মত এত ঘৃণা নিয়ে আর কেউ কখনো পা নামায়নি। অথচ তিনি ইংরেজকে যত ভালবেসেছিলেন তেমন আর কেউ করেনি।

তিনি বলেছিলেন, ওরা সত্যিকারের ক্ষত্রিয় জাত। ক্রীতদাসের মনোভাব না জাগিয়ে হুকুম তামিল করানো, ডিসিপ্লিন শেখানোর রহস্য ওরা সমাধান করেছে। মহা স্বাধীনতার সঙ্গে মহা আইন মেনে চলা মিলিয়ে নিয়েছে। ওদের অন্তরের মধ্যে উনি আদর্শের বীজ বপনের যোগ্য ভূমি দেখেছিলেন।

তোরা দেখিস ওদের যে সব শিক্ষিত লোক এদেশে যুদ্ধের কল্যাণে এসেছে তারাই যুদ্ধের পরে আমাদের স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভোট দেবে।

দুই বন্ধুই স্বয়মের এই উচ্ছ্বাসে সায় দিতে ইতস্তত করল।

ওরা জানত যে স্বয়ম্ও ওদের চেয়ে কম স্বদেশী নয়। বরং একটু বেশীই। কলকাতা কংগ্রেসের সময় সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস বাহিনীর জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং ছিলেন তখন সে বালসেনা হয়ে কাজ করেছিল। এবং ওর স্বাদেশিকতার ভিত্তি অন্ধ দেশপ্রেমে নয়, চোখখোলা বাস্তব বুদ্ধিতে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অগাধ বিদ্যা দিয়ে দেশের স্বাধীন হওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে কারণ দেখাতে পারে।

কিন্তু বন্ধুদের মনের দ্বিধা ওর নজর এড়ায়নি।

ও তাই বলল, তোরা জানিস না। আমি এত তরুণ ইংরেজ সেনার সঙ্গে মিশেছি। তারা যখন কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টের বিরুদ্ধে জোর গলায় কথা বলে তখনো সঙ্গে সঙ্গে এদেশ শীঘ্রই স্বাধীন হওয়া উচিত সে কথাও স্বীকার করে। হোয়াইট ম্যান্‌স বার্ডেন, কালো লোক যে সাদা লোকের দায়দায়িত্ব সে কথা কোন তরুণ শিক্ষিত ইংরেজকেই আমি বলতে শুনিনি রেজিমেণ্টাল ব্যারাকে।

অবশ্য একথাও ঠিক যে অনেকেই মনে মনে সাম্রাজ্যবাদী। তারাও মুখে ওর সামনে সে ভাব প্রকাশ করবে না। ওদের সামনে এখন যুদ্ধ জেতাই সব চেয়ে বড় কথা। কাজেই এ দেশকে সঙ্গে আর হাতে রাখতে হবে ছলে বলে কৌশলে। মিষ্টি বুলি আর ভদ্র ভোলে। যাদের মাইকের মত মন খাঁটি নয় তারাও বাইরে ব্যবহারে মাটির মানুষ।

তবে স্বয়ম্‌ও সেকথা বোঝে আর ইতিহাসের আলোয় তা যাচাই করে নিয়েছে। প্রাচীন ঐতিহাসিক প্লুটার্কের মহৎ লোকদের জীবনীতে সে পড়েছে যে তিনি পুরুকে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বাহাদুরি দিয়েছেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তকে অনেক বেশী শ্রদ্ধা করেছেন গ্রীকের কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিখে গ্রীককেই দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য। সে কথা সে সব সময় মনে রেখেছে।

গোপী কি যেন ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়াল। স্বয়মের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

খুব নরম স্বরে বলল, শ্যাম, সত্যি কথা বল্ তো? এই যুদ্ধে নাম লেখানো, তার জন্য এত সাফাই গাওয়া—এ কি শুধু অন্নচিন্তা? না, কোন কাঁকনপরা হাতের ধাক্কা?

বলেই পাছে স্বয়ম্ ব্যথা পায় সেজন্য হেসে বলল, আরে দূর ছাই। আজকাল আবার ওরা কাঁকন পরেই না।

স্বয়ম্ অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

অবস্থাটা সামলিয়ে নেবার জন্য গোপী আবার বলল, টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'এ পড়েছি যে সেনাপতিরা মনে করে যে ওরাই যুদ্ধ জিতেছে। কিন্তু হয়তো সে জয়ের পিছনে আছে যুদ্ধে যাবার পথে সৈন্যদলকে ছুঁড়ে দেওয়া কোন মিষ্টি মেয়ের মিঠে হাসি। সে কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল। তাই···

স্বয়ম্ মনে মনে কৃতজ্ঞ হল যে গোপী ওকে স্বাতীর কথাটা এড়িয়ে যাবার একটা সুযোগ দিয়েছে।

সে বলল, এই কথাটা আমিও মিলিটারী মেসে বর্মা থেকে রক্ষা পাওয়া একজন ছোকরা অফিসারকে বলেছিলাম। তার ইউনিটও দারুণ লড়েছিল সেখানে। সে নিজে মিলিটারী ক্রস পেয়েছে। কিন্তু সে বলেছিল যে ওসব স্রেফ কবিকল্পনা। ওর সবচেয়ে উজ্জ্বল ক্ষণটুকুর, মোস্ট শাইনিং আওয়ারের, পিছনে কোন মিষ্টি মেয়ে ছিল না। ও ভুলেই গিয়েছিল মিষ্টি মেয়েরা কেমন দেখতে।

সরল কিন্তু অত গভীরে তলিয়ে দেখল না।

ফস করে বলে বসল, আচ্ছা, সত্যি বল্ তো, তুই কি তোদের পাশের বাড়ির মেমসাহেবের প্রেমে পড়ে ফৌজে মরতে গেলি না কি?

গোপী প্রাণপণে চোখের ইসারায় সরলকে চুপ করতে অনুরোধ করছিল। সেটা স্বয়মের নজর এড়ায়নি।

সে পরিহাস করে বলল, খুব কল্পনাশক্তি তোর। এবার বোধহয় বলবি— মত্তার্ণ তরুণী হইতে সাবধান। তারা প্রেমকে ভালবাসে কিন্তু প্রেমাস্পদকে বিপদে ঠেলে দেয়। অতএব কেটে পড়, কেটে পড় বাছা।

গোপী হেসে বলল, তুই ফৌজে গিয়ে মৌজে মেতেছিস যেভাবে তাতে মনে হচ্ছে যে সঙ্গীনটাই তোর প্রেমের সঙ্গিনী। না হলে কি আর এত সাফাই গাইলি। তবে ভেবে দেখলাম যে সঙ্গীন আর সঙ্গিনী দুটিই বুকে চেপে ধরার ধন।

১৫

সীমার হাতে নীরেন তুলে দিয়েছিল একটি রক্তগোলাপের স্তবক। রক্তিম আভায় তার মন ছিল ভরে।

এই বিশ্বযুদ্ধের বাজারে সেই ড্রয়িং রুমটাও একটা যুদ্ধক্ষেত্র। সময়টাও ছিল রাত্রি। তবে মনের উচ্ছ্বাসে ঝলমল। আঁধার বা হতাশা যা ছিল তা শুধু শত্রু নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদের মনে।

কলকাতায়। মালয়ে নয়। মনোভূমিতে সেই যুদ্ধ। বন্যভূমিতে [illegible]

সেই মনোভূমিতে সীমাদের বাড়িতে মহাসমারোহ। সীমার [illegible]ন। বহু নিমন্ত্রিত। বিশেষ করে যারা পাত্র, একেবারে সুপাত্র হিসাবে গণ্য হতে পারে তারা অনেকেই এসেছে। তারা প্রায় সবাই নীরেন চৌধুরীর বন্ধু। এবং বন্ধু হলেও প্রতিদ্বন্দ্বী বললেই ঠিক বলা হয়।

সীমার মত মেয়েকে লাভ করার জন্য কলকাতায় যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে ভিতরে ভিতরে রেষারেষির অন্ত নেই।

অথচ মুখ ফুটে সে-কথা বলতে ভদ্রতায় বাধবে। এত যোগ্য যুবকের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজেকে যোগ্যতম বলে ভাবছে। সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা, বংশের কৌলীন্য, রোজগারের জোর, এটিকেটের চমক—সব কিছু অস্ত্রশস্ত্রই সীমাকে পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা চলছিল।

হায় রে আজকালকার কাল। একেবারে ঘোর কলিকাল। না হলে সে-ই তো স্বয়ংবর প্রথা দিব্যি চালু রয়েছে। সীমা নিজে যাকে পছন্দ করবে, তাকে জামাই রূপে বরণ করতে ওর আধুনিক বাবা-মা এমন কিছু আপত্তি করবেন না।

যাদের ওরা তেমন সুপাত্র বলে মনে করবেন না, তারা তো আগে থেকেই ওদের বৈঠকখানা থেকে বাতিল। একেবারে সেই সংযুক্তার স্বয়ংবর সভার মত। সেই সুযোগে অনেকগুলো যাকে বলে লোফার, অর্থাৎ লুফে ফেলে দেওয়ার মত পাত্র, আগে ভাগেই বাতিল হয়েছিল।

আজকের জন্মদিনের পার্টিতে যারা আমন্ত্রিত, তারা এতে খুশী।

অ-খুশী কেবল এজন্য যে পৃথ্বীরাজের মত সীমাকে নিয়ে উধাও হয়ে যাবার একটা সম্ভাবনা রয়েছে।

একেবারে জঙ্গী। থুড়ি, জঙ্গলী। চৌধুরীটা আবার হিটলারের কল্যাণে এমার্জেন্সী কমিশন পেয়ে অফিসার হয়ে ঢুকেছিল এবং দেখ-না-দেখ সদ্য সদ্য মেজর হয়ে গেছে। নরাধমকে কর্তারা আগে-ভাগে নরওয়েতে চালান করে দিলে বেশ হতো।

তবে মাত্র মেজর। এবং মুরুব্বি নেই কেউ। তায় যুদ্ধটা বেশ জোরে বেধে উঠেছে। নরওয়ের বরফ আর আফ্রিকার মরুভূমি যে-কোন জায়গাতেই ওকে চালান করে দিতে পারে। তাহলে এই রাইফেলধারী রাইভ্যালটি বাতিল হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

সেদিনই সকালে সীমার মা আর বাবাতে এ নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়ে গিয়েছিল।

মা মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, হ্যাঁ, খুব কম ইণ্ডিয়ানই একাল পর্যন্ত মেজর হয়ে প্রমোশন পেয়েছে। মানলাম। কিন্তু মর্যাদা দিয়ে কি মেয়ে ধুয়ে খাবে? থাকবে কোন মিলিটারী ওয়াইভ্‌স্ মেসে। সধবা হয়েও বিধবার মত। না হলে উড়নচণ্ডীর মত। মিলিটারীর মাইনে কতটুকু? জিনিসপত্তরের কি আক্রা দাম হচ্ছে তার খবর রাখ?

বাবা শান্ত কণ্ঠে সবদিকটা যাচাই করে দেখছিলেন। আর্মি সাপ্লাই এত ভাল আর এত সস্তা যে মিলিটারীতে যারা কাজ করে, আজকাল লোকে তাদের সঙ্গে ভাব করবার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে।

—হ্যাঁ, তা ছুটছে বটে। কিন্তু ওটা তো ইংরেজদেরই চালাকি। দেশের সবাইকে আধপেটা রেখে মিলিটারীকে দুনোপেটা রাখার ব্যবস্থা। দুনো লাভ তাতে। ইংরেজ রাজের গুণগান আর মেশিনগান সমান তোড়ে চলবে।

—আহা, আর্মি র‍্যাশন আর আর্মি অ্যালাউয়েন্স তো পাকাপাকি ব্যবস্থা। চিরকালই চলবে। ওদের দেখাদেখি রেল প্রভৃতি সব জরুরী এসেনশিয়াল প্রতিষ্ঠানেও চালু হচ্ছে র‍্যাশন, সস্তা দাম ইত্যাদি। কাজেই মাইনে দিয়ে নীরেনের ওজন করলে পুরো ঠিক হবে না। পশ্চিমে তো রাশিয়াও এখন ইংরেজের পক্ষে। কাজেই ওদিকটা ওরা সামলে নেবে। সে-অবস্থায় পূর্বেও আর কোন গণ্ডগোল পাকাবে বলে মনে হয় না। নীরেন দেশেই থেকে যাবে—যা দেখছি। হয়তো কোন ভাল ক্যাণ্টনমেণ্ট বা চাই কি হিল স্টেশনে।

—হ্যাঁ, হিল স্টেশনে। যেখানে মিলিটারী মেসে সবচেয়ে বেশী আলোচনা হয় কে কার বৌয়ের সঙ্গে রাত কাটায়। ছ্যাঃ!

মা অনেক বেশী রিয়েলিস্ট। এসব ব্যাপারে বিশেষ করে। যেখানে মেয়ের ভবিষ্যৎ জড়িত, সেখানে সব দিক খতিয়ে দেখে তবেই তিনি সিদ্ধান্ত করবেন।

স্যাণ্ডহার্স্টের রয়্যাল মিলিটারী কলেজের ছাপমারা মিলিটারী অফিসাররা যে ইংরেজ জঙ্গীদের মধ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আর তাদের তালে তালে মার্চ করে ভারতীয়রাও যে ক্রমে ক্রমে সেই জাতে উন্নতি পাবে সে ভরসা তিনি রাখেন। সেজন্যেই নীরেনকে প্রথম থেকেই বাতিল করেননি। হাতে রেখেছেন।

কেবল এই যুদ্ধটা ছড়িয়ে পড়েই ওঁর সব হিসাব গোলমাল করে দিচ্ছে।

তাই উনি অনেক খোঁজখবর নিয়েছেন। বইয়ে পড়েছেন কেমন করে পঁচিশ বছর আগে বিলেতে সবাই মুখ বুজে ঠোঁট চেপে জপ করত যে যুদ্ধটা কোন রকমে চালিয়ে যেতে হবে। মনে প্রাণে ঘৃণা করত যুদ্ধকে। অথচ যুদ্ধ না করে উপায়ও ছিল না। সব কটি ছেলে বেঁচে আছে এমন ঘর বিলেতে ফ্রান্সে জার্মানীতে মেলা শক্ত ছিল।

অথচ পেট্রিয়টিজমের এমন মাদকতা ভরা নেশা জন্মিয়ে গিয়েছিল যে যাদের তেমন ভাল ভাগ্য ছিল তারা অন্যের সামনে লজ্জাই পেত। ভাগ্য ভেঙে যাওয়াটা গৌরবের জিনিস বলে বীরের জাত মেনে নিতে শিখেছিল। এবং মুখে প্রচার করত।

তোমার কোন ছেলে যুদ্ধে যায়নি? যায়নি ফ্রন্টে? মারা যায়নি? মা গো।

প্রথম প্রথম যুদ্ধের মধ্যে বীরত্ব আর মৃত্যুর মধ্যে মহিমা খুঁজে পেতো সবাই। যাদের শোকে সান্ত্বনা দিতে হবে, মনে জোর দিতে হবে তাদের কাছে স্বদেশ আর স্বাধীনতার বড় বড় গৎ আওড়ানো যেতো। কিন্তু শেষের দিকে আর সহানুভূতিতে কুলোতো না।

সীমার মা তাই মনে করিয়ে দিলেন, আর আমাদের বাছারা যে সৈন্যদলে নাম লেখাচ্ছে তাতে স্বদেশই বা কোথায়? আর কোথায় বা স্বাধীনতা?

মোট কথা যে কোন দিক দিয়ে দেখা যাক না নীরেন চৌধুরী আজকের দিনে পরিচিত হিসাবে ভাল, কিন্তু পাত্র হিসাবে বাতিল।

আরও জোর দিয়ে তিনি বললেন, মেয়েকে মনে করিয়ে দাও যে ইংরেজের ছাতার তলায়, সাদা ছাতার তলায় ওই ঝকমকে পোশাক বেশ স্মার্ট, বেশ

চটকদার। কিন্তু জার্মান ঈগলের ছোঁ অথবা পরে জাপানী সূর্যের তেজ থেকে সে ছাতা হয়তো এই পোশাককে বাঁচাতে পারবে না। মনে করিয়ে দাও।

মনে করিয়ে দিয়েছিল এই পার্টির অন্যান্য নিমন্ত্রিতরাও।

বড় এটর্নি আফসের ছোট পার্টনার সুবীর কম তুঃখাড় নয়। নীরেনের মিলিটারী ইউনিফর্মে ঢাকা সুঠাম দেহের সঙ্গে পাল্লায় নিজে অনেকখানি পিছিয়ে আছে সেটা সে হাড়ে হাড়ে বুঝত। সে জন্যই সে নীরেনের নাম দিয়েছিল নীরো।

সুবীর বলত যে মানুষের পরিচয় কাজে, না হয় তার মর্গেজে। নীরো বন্দুক চালায়নি, বন্ধকও দেয়নি। তবে কি করছে সে?

সুবীর বলেছিল, ব্রাদার আমার একমাত্র ছেলে বাপ-মায়ের। তবু সাধ হয়েছিল হতে হিরো। আরে বাবা, আফ্রিকার মরুতে হঠাৎ হিটলারী হামলায় ওই ইউনিফর্ম ছেড়ছুড় চোঁ চোঁ দৌড়তে হবে বলে রাখলাম। হতে চান হিরো, কিন্তু হবেন জিরো। নীরেন দি হিরো, এক কথায় নীরো। হিপ হিপ হুররো।

পুরুষানুক্রমে খাস কলকাতার বাসিন্দা বড়লোকের দুলাল সুশোভনও প্রার্থী। সেও উল্লাসে হিপহিপ হুররে, থ্রি চিয়ার্স ফর নীরো বলে চেঁচিয়ে উঠল।

সবাই তাতে যোগ দিয়ে হো হো করে হেসে নিল।

দূর থেকে নীরেনকে আসতে দেখেই সে আরো টিপ্পনী কাটল, ওই যে আসছেন আমাদের মেজর। একেবারে প্রেমে জরজর। তাই আর্মি থেকে ওকে প্রমোশন দিয়েছে মেজর।

সুবীর দূর থেকেই নীরেনকে দেখে বলে উঠল, আরে ব্রাদার, এ যে একেবারে স্ক্যাণ্ডাল হয়ে গেল।

সুশোভন প্রতিবাদ করল, না, মোটেই স্ক্যাণ্ডাল নয়। একেবারে গসিপ। মিলিটারী মহলের চালু মস্করা।

ইংরেজীর অধ্যাপক তমালকান্ত সম্প্রতি বিলেত থেকে ফিরেছে হিটলারী হাওয়াই হামলার ধাক্কায়। এসেই বিলেতী তরুণীদের বিকল্প খুঁজে পাওয়ার জন্য বিবাহযোগ্যা তরুণীদের সার্কিটে নাম লিখিয়েছে।

এ ছাড়া তো এ ছাই দেশে আর কোন ওপেনিং নেই। একমাত্র ওপেন সিসেম হচ্ছে বিয়ের সম্ভাবনা, গাজরের মত সামনে ঝুলিয়ে মেয়ে মহলে এগিয়ে যাওয়া।

সেই তমালকান্ত ফোড়ন কাটল, ও দুই-ই এক। গসিপ হচ্ছে জনপ্রবাদ। লোকের মুখে মুখে ফেরে। ওটাতে একটু রংয়ের ছোপ লাগালেই হয়ে ওঠে স্ক্যাণ্ডাল। ওই দেখ না, মেজরের মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

হাঃ। হাঃ। সেই লাল হওয়াটাই স্ক্যাণ্ডাল। উনি জঙ্গী কিনা। শত্রু সৈন্য দেখছেন স্বপ্নে।

তা—ও-ই যুদ্ধটা করুক গিয়ে সত্যি সত্যি। আর এই যুদ্ধটা স্বপ্নের মধ্যে সেরে সরে পড়লেই সব দিক দিয়ে ভাল মানাবে।

সুশোভনের এই মন্তব্যে খুশী হল তমাল। সে বলল, মেজরের উচিত শুধু সেই সব মেয়েদের পেছনে ধাওয়া করা যারা পোশাক নিয়ে ইশাক করে। থুড়ি, সাজগোজের সঙ্গে প্রেমে মজে আছে।

—সর্বনাশ ব্রাদার, এমন সব সুন্দরীর মেলায় নিশ্চয়ই তুমি বিলেতে অনেক ঘুরেছ। তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে দেখছি আমায় ছুটতে হবে 'রাম ফ্লিপ' পান করবার জন্য। গঙ্গাজলে তৈরী চা'পান করলে তো পেরে উঠব না।

সুশোভন 'রাম ফ্লিপে'র রহস্যটা জানতে চাইল।

তমাল খুব মুরুব্বিয়ানা করে বলল, রেসিপি অর্থাৎ অনুপানটা আমার পেটেণ্ট করা। এতে রামের সঙ্গে চিনি আর দুধ মেশাতে হয়। চিনি দেয় তাকত, এনার্জি আর দুধ দেয় বল, হিম্মৎ। বাকি রইল তোমার কিসমত।

—সেটা তো জানা কথা, রাম তবে দেয় কি বস্তু?

—রাম দেয় প্রেরণা। ওই উৎসাহ আর শক্তি নিয়ে কোন্ কাজে লাগাতে হবে তার হদিস।

বটে। তাহলে 'রাম ফ্লিপ' খেয়ে এই রামচন্দ্রটিকে একটু কড়কে দিয়ে বনবাসে ঠেলে দেওয়া যাক।

—অবশ্য, অবশ্য। তা ভায়া, তোমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে খুব তাড়াতাড়ি।

সুশোভন মদের ধারকাছ দিয়ে যায়নি কখনো। তাই বলল, কিন্তু শুনেছি ড্রিঙ্ক করলে আয়ু কমে যায়।

—লোকসান কি। ড্রিঙ্ক করলে যে একই সময়ের মধ্যে দ্বিগুণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন আপনার দিব্যদৃষ্টি এইমাত্র শুধু ড্রিঙ্কের নামেই খুলে গেল।

সুবীর বলল, আমাদের প্রফেসার হচ্ছে সত্যিকারের দার্শনিক।

—তার মানে?

—মানে খুব সহজ। যে সবগুলি সমস্যারই সমাধান জানে অথচ সমস্যাগুলি যে কি তা-ই জানে না সে হচ্ছে দার্শনিক। প্রফেসার জানেই না যে আমাদের সমস্যাটা কি।

—কেন? কে না জানে যে সমস্যা হচ্ছে আমাদের ড্রয়িংরুম নীরো। ওর হাতে যা সাজবে ভাল তা বন্দুক নয়, বেহালা।

—বেহালা নয় ব্রাদার, ব্যায়লা ভাঙা ব্যায়লা। সেই জন্যই তো ভেবেচিন্তে নাম দিয়েছিলাম নীরো। রোমের রাজা নীরো আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ব্যায়লা বাজাতে বসেছিল।

নীরেন ততক্ষণে কাছে এসে গেছে। তার দীর্ঘ সবল দেহ আজ ইউনিফর্মে আরো বেশী চোস্ত দেখাচ্ছে। তার মধ্যে উচ্চতা আছে, কিন্তু উদ্ধত নয়। সংযম আছে সচেতনতা নেই।

সীমার মা এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। অন্যান্য যুবকদের মত কথাবার্তায় সুর বা বংশে সম্পদে অগ্রসর নয়, তবু ভাল ছেলে।

আর্মিতে এখন ভারতীয় অফিসারদের পার্সেন্টেজ মাত্র সতের। কিন্তু ক্রমে বাড়তে বাধ্য। কেবল এই যুদ্ধটাই বাগড়া দিয়েছে। পদবৃদ্ধি হবে, কিন্তু বিপদ বৃদ্ধি যে অনেক বেশী। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও দেশেই যে ওকে রাখবে তার ভরসা কি?

অতএব কুশল প্রশ্ন করার পরই মা সোজাসুজি যুদ্ধের কথা তুললেন। এদেশ থেকে অনেক সৈন্য শুনছি আফ্রিকায় চালান যাচ্ছে। তবে ইণ্ডিয়ায় কোন আক্রমণ হবে না। তা বাবা, তুমি তো এদেশেই পাকাপাকি পোস্টেড থাকবে? দিল্লীতে? সাউথ ব্লকে?

মায়ের উৎকণ্ঠা খুব প্রকট হয়ে উঠল।

একটু চুপ করে থেকে, তারপর গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে নীরেন বলল সেই কথাটাই জানাতে এসেছিলাম। হঠাৎ···কালই···

একবার দূরে অন্য কোথায় দাঁড়ানো সীমার দিকে সে তাকাল। সীমার সঙ্গে ওর কয়েকটি বান্ধবী কথা কইছিল। ওর দিকে তাকিয়ে যেন ওকেই জানাচ্ছে এমন ভাবে বলল, কালই আমায় রওনা হয়ে যেতে হবে। এমার্জেন্সী অর্ডার।

অ্যাঁ! সীমার মা একবার দূরে মেয়ের দিকে তাকালেন। আজকের সন্ধ্যাটা বড় লম্বা ঠেকছে। তাড়াতাড়ি রাত হয়ে গেলে বাঁচা যায়। পার্টিটা চটপট ভাঙতে শুরু হলেই যেন ভাল হয়।

ঘড়িগুলো বড় বেয়াড়া। কাঁটাগুলো কারো সুবিধা-অসুবিধার দিকে তাকায় না।

ঘরে সাজানো রয়েছে জন্মদিন উপলক্ষ্যে দেওয়া ছোট ছোট সুন্দর উপহার নিমন্ত্রিত বন্ধু-বান্ধবীরা সবাই প্রথমে সীমাকে তাদের উপহার হাতে তুলে দিয়ে এসেছে। কিন্তু নীরেন কি সীমাকে দেবে শুধু দুটি ব্যাকুল চোখের নীরব দৃষ্টি? ওর হাতে ফিনফিনে কাগজে মোড়া রক্তগোলাপের স্তবকটা নিয়ে এগোতে পারছে না কেন?

ওর ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক তমালকান্তের চোখ এড়াল না। খাস কালিদাসের কাব্যে এ হেন দোলায়মান মনের বর্ণনা ওর মনে পড়ল। কিন্তু সেই উপমা তুলে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মর্যাদা বাড়াবে না। হালকা ঠাট্টায় প্রেমের গুরুত্বকে তুলো ধোনা করে উড়িয়ে দিতে হবে।

চোখ ঠেরে সে বন্ধুদের বলল, দেখেছ, দেখেছ মেজরের জড়সড় ভাব। ঘড়ির চেয়ে বেশী তড়িঘড়ি প্রেমিকরা প্রেমিকার দিকে দৌড়োয়। আর উনি ভাবছেন যে উনি যখন প্রেমে পড়লেন ঘড়িই তখন বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এগোচ্ছেন না।

সুবীর ছাড়ল না। সে-ও তো বীর বটে।

ব্রাদার সুশোভনকে কানে কানে বলল, আমাদের প্রেমে জরজর মেজর এখনই জড়সড়। অবশ্য খরচার বেলায়। দেখ না, বিয়ের আগে দিচ্ছে শুধু ফুল। অর্থাৎ পরে দেবে শুধু কাঁটা। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, হে ব্রাদার। দিব্যচক্ষে।

দু' চোখ কপালে তুলে চাদরটা ঘাড়ে ভাল করে চাপিয়ে নিয়ে সুশোভন বলল, কেন ব্রাদার, এমন আর কি সর্বনাশ হবে?

—হবে না? ওই চরিত্রবান জঙ্গী একেবারে জঙ্গলী। সিগারেটটা পর্যন্ত খায় না। নেহাৎ খরচার ভয়ে। ওরকম লোকের বিয়ে করা মানেই সর্বনাশ। সিগারেটের মতই ডিমর‍্যালাইজিং। প্লাস অঢেল খরচান্তের ব্যাপার।

সবাই সীমার প্রতি দরদে বিগলিত হয়ে গেল। সত্যই সীমা ওদের প্রতি অবিচার করে নিজেরই বিপদ ডেকে আনছে।

তমাল বলল, সত্যিই তো। মেজর যে ডুবেছে তা তো জানি।

একটু থেমে সে নিজেই প্রশ্ন করল, কখন ব্যাচিলাররা ডোবে? যখন প্রেম সায়রে ঝাঁপ দিতে শেখে। কিন্তু মেজর আবার হুঁশিয়ার আদমী। তাই হাতে করে এনেছে শুধু ফুল। দুটো মিষ্টি কথা ছাড়া আর কিছু দিতে গেলেই যেন দেউলে হয়ে যাবে।

এদিকে ততক্ষণে নীরেন সীমার কাছে এসে পৌছেছে। দুয়েকটি সম্ভাষণের পর বান্ধবীরা এদিক-ওদিক সরে পড়ল। পার্টিতে তরুণ বন্ধুরা যখন উপহার নিয়ে সীমার সামনে দাঁড়াবে, তখন হয়তো একটু অন্তরঙ্গ কোন কথা বলবে, সেই সুযোগ দেওয়ার জন্যই এই সুবিবেচনা।

নীরেন ধীরে ধীরে গোলাপস্তবকের মোড়ক খুলে টকটকে লাল ফুলগুলি সীমার হাতে তুলে দিল। আসন্ন শীতে মুকুলিত ফুলের উষ্ণ সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল ওকে ঘিরে। একটা অদৃশ্য, মৃদু অনুভব যেন একটি অবগুণ্ঠন রচনা করে দিল।

নীরেন ওর মুখের দিকে তাকাল। ওর হাতের দিকে। ওর মাথার সিঁথির দিকে।

নীরেনের ভীরু চাহনি আজ ভরে উঠেছে সাহসে, বিশ্বাসে, বলিষ্ঠতায়। মুখ যেন হয়ে উঠতে চাইছে মুখর। অধরেতে লাজুক ভাব আর ধরে রাখতে পারছে না। বার বার সে তাকাচ্ছে সীমার সিঁথির দিকে।

সীমা অবশেষে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে বল তো? আমার চুলে কিছু গোলমাল দেখছ না কি?

—না। তোমার সিঁথিতে দেখছি আমার পথ। আশা ছিল একদিন সেখানে তুমি আমার জন্য রাঙা রেখা রচনা করবে। তাই তো আজ এনেছিলাম রক্তগোলাপ।

বিব্রত হয়ে সীমা মৃদু স্বরে বলল, তুমি কেন খালি খালি রক্ত আর রাঙা এ সব কথা মনে আনছো। আমি তো জানি শীঘ্রই এই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। আর তুমিও স্বাভাবিক ভাবে ফিরে আসবে। তখন দেখা যাবে।

ধীর কিন্তু দৃঢ় স্বরে নীরেন বলল, না, অত সহজে শেষ হবে বলে মনে হয় না। আর এদেশে যা তোড়জোড় চলছে তাতে পরিষ্কার যে আরো অনেক ছড়িয়ে পড়বে এই যুদ্ধ। যাই হোক, অনেক দিন যুদ্ধ চললে বোধ হয় আমার কোন আশা থাকবে না।

অসহায়ভাবে সীমা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

নিজের মন আর নিজের মা একইভাবে দেখছে না এই ব্যাপারটাকে।

এবং নিজেই যে ঠিক মানুষটি বেছে নিতে পেরেছে সে সিদ্ধান্তও পুরোপুরি হয়নি এখনো।

এ যুগের মেয়েদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। অথচ বাপ-মাও তাদের দায়

সম্ব পরিমাণে কমে গেছে বলে মনে করে না। তারই ফলে আসে কিছু সংঘাত, কিছু সংশয়।

কিন্তু বিফলতা যদি আসে, ব্যথা যদি বাজে তাতে ভুগবে তো সেই নারী নিজেই। সে কি ভাবতে পারবে 'রক্তে মোর বাজে রুদ্র বীণা' আর দুর্ভাগ্যকে উপেক্ষা করতে পারবে?

অথচ যে বীর আজ বিদায় নিতে এসেছে তাকে হতাশ করে ফিরিয়ে দেবে কি করে? একটা অনির্দিষ্ট আশার সম্ভাবনা দেখিয়ে ছেড়ে দেওয়াও াক সততা হবে? এদিকে যে মনকে এখনো পরিপূর্ণভাবে তৈরী করতে পারেনি তাকে কি করে এখনই বাক্য দিয়ে আবদ্ধ করবে?

অসহায়ের মত সীমা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

অনেক কাহিনী সে জানে যেখানে ঝট করে মত দিয়ে হঠাকারিতার জন্য পরে পস্তাতে হয়েছে। মিথ্যা আশার কুহক সে দেখাবে না। আবার অযথা নিরাশ করে তার বীরের উঁচু মাথা নীচু করে বিদায় নিয়েও যেতে দিতে পারে না।

চারদিকে পৃথিবী একটা প্রলয়োচ্ছ্বাসে মত্ত হয়ে উঠছে। ইয়োরোপে এমনভাবে ঝটিতি বিয়ে আর ত্বরিত বিচ্ছেদ নিশ্চয়ই বহু হচ্ছে। কিন্তু আমাদের সমাজ, পরিবেশ, দেশ কিছুই তো এর জন্য তৈরী হয়ে ওঠেনি— এখনো নয়।

শুধু কথা দেওয়া। শুধু আশ্বাস দেওয়া। শুধু বিশ্বাসকে বাঁচতে দেওয়া। তার পর যদি সংসারের চাপে মনের রঙ বদলিয়ে যায় তখন কি হবে?

কিন্তু শুধু তো আশ্বাস দেওয়া নয়, আশ্বাস পাওয়াও তো বটে। কুমারীর নব নীরব প্রীতি হচ্ছে মৃদু আর মধুর। তাকে নির্ভর করতে হবে সবল আর কঠোরের উপর। তরুণীরা হয় মনোহারিণী, নয়নাভিরাম নানা রঙের প্রজাপতি, জোনাকির মত ক্ষণদীপ্তিতে উজ্জ্বল।

কিন্তু যে তরুণদের তারা বরণ করবে তাদের মধ্যে যদি ঋজু বলিষ্ঠতা না থাকে, তাহলে তাদের কাছ থেকে প্রেমের স্বীকৃতির সার্থকতা কোথায়?

ওই যে সুশোভনের দল, তমালকান্তির দল ওদের মধ্যে সে বীর্য কোথায়? ধৈর্য কোথায়? ওরা তো মিষ্টি কথা বলে। ফুলঝুরির মত ভাব ও ভাষা ওড়ায়। তার মধ্যে যদি বা মাধুর্য থাকে, মর্যাদা কোথায়?

ওরা কিন্তু সবই লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। এবং কথার বাঁধুনী ও টিপ্পনীতে নিজেদের শূন্যতাকে ভরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল।

সুবীর বলল, বাঃ, বেড়ে জমিয়ে নিয়েছে দেখছি ব্রাদার। তবে কি জান, এখনই এসব পালা সেরে রাখা ভাল। আমাদের পোড়া চোখের সামনে আগুন জ্বালানো এত প্রেম পরে তো জাহির করা চলবে না।

—কেন, তাতে আপত্তিটা কি? বরং আরও বেশীই চলবে হয়তো। কারণ তখন তো অল রাইটস রিজার্ভড। সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত।

—সে জন্যই চলবে না। স্বত্ব পাওয়া মানেই হারানো। কারণ লোকে ভাববে যে সামনে ঢলাঢলি করছে পেছনে ঠেঙাঠেঙি করে বলে। তায় আবার মেজর। ওরে বাবা! লড়াইটা ঘরের মধ্যেই চালাবে আমাদের ড্রয়িংরুম হিরো।

—আশ্চর্য! এমন হিরো দেখিনি বাবা সাতজন্মে। জঙ্গীতে যখন ঢুকেছিস রঙ্গে ভরিয়ে নে জীবনটা। নেহাৎ যদি রোমান্টিকই হয়ে থাকিস গঙ্গাফড়িঙের মত উড়ে বেড়া। কানা ফুলের তো অভাব নেই মিলিটারীর বালুচরে।

বালুচর নয় হে ভায়া। ময়নামতীর দ্বীপ। জলের মত পয়সা খরচ করে সে দ্বীপের ঘাটগুলো বাঁধানো।

—একটু তফাৎ আছে ব্রাদার। মেজরের চোখে বোধহয় সব মেয়েই হচ্ছে স্যালাড। যে রকম সস আর ড্রেসিং দেবে সেরকমই সাজবে। সীমাকে বানাতে চায় একেবারে নিজস্ব রেসিপি। প্রাইভেট পাক প্রণালীতে।

এদিকে নীরেনের মনে প্রত্যাশার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে নিরাশা। সে যেন একটা ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মাটিতে শেকড় গেড়ে থাকতে চায়। প্রেম সেই পৃথিবী, সেই জমি যেখানে তার জীবনের মূল সজীব রেখে সে ঝড়ের অভিসারে বেরিয়ে যাবে।

সীমা যে কেন প্রত্যাশা দিতে পারছে না তা সে ভাল করেই বুঝতে পারছে। তবুও অবুঝ মন। নীরবতার কারণটাকে স্বীকার করলেই মাথার উপর পাগলা ঝড় ভেঙে পড়বে। সে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

কারো কাছে ব্যক্তিবিশেষ হয়ে বেঁচে থাকার কি বিরাট অর্থ, কি মহান তাৎপর্য তা সে জানে। শুধু সে আছে বলে, কাছে আছে বলে যে একজন সুখী হয় সেই অনুভবের কি বিপুল মহিমা। কি অনন্ত আনন্দ। এরই স্পর্শে মানুষ পরিবর্তিত হয়ে যায়, পরিবর্ধিত হয়ে যায়। যেমন সে হয়ে যাচ্ছে।

মানুষ এরই জন্য বাঁচে, এগিয়ে চলে, তাঁবু বাঁধে। মানুষ বাঁচে শুধু অশরীরী প্রেম বা শরীরী প্রয়োজনের জন্য নয়। পরিপূর্ণ একজন মানুষের জন্য।

সীমাও জানে যে পৃথিবীটা এক জায়গায় ঠেকে থাকে না। যদি একটা দেশ বা একটা যোদ্ধা দল হেরে যায় বা হারিয়ে যায়, তবু হাল ছাড়লে চলে না।

কিন্তু একজন মানুষই জীবনের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করে। মনের মধ্যে সে-ই থাকে রাজা। সাময়িকভাবে দুঃখ, বিচ্ছেদ এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত আসতে পারে। সূর্যগ্রহণ হয়, চন্দ্রগ্রহণ হয়। কিন্তু পৃথিবীতে আশা ছেড়ে দেয় না কেউ সেজন্য।

সীমার মনে পড়ল আজ ভোরবেলা বাবা প্রত্যেক ভোরের মতই উপনিষদ পাঠ করছিলেন। যুদ্ধ অশান্তি অনিশ্চয়তার মধ্যেও এই পাঠ কখনো বাদ দেন না। আজই পড়ছিলেন :

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে

সোনার পাত্র দিয়ে সত্যের মুখ আবৃত। হে পূষণ, হে স্বর্গীয় জ্যোতিস্বরূপ, মুখের আবরণ সরাও, যাতে সত্যকে দর্শন করতে পারি।

সেই সত্য, মনের সত্যকে তুমি এখন খুলে দেখাও। আমি জীবনে জেগে উঠতে চাই।

এদিকে সীমার মা ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে পেরেছেন। মেয়েকে এমন একটা জটিল অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া মায়ের অবশ্য কর্তব্য। উনি হাতে মিষ্টির প্লেট তুলে নিয়ে এগোতে লাগলেন।

তা লক্ষ্য করে নীরেন শান্তভাবে বলল, সীমা, সীমা তুমি বল। একটুখানি হেসে প্রসন্ন মনে বল, আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

সীমা হাসল। হ্যাঁ, হাসল।

যে হাসি পৃথিবীর সব কান্নার চেয়ে বেশী গভীর সেই হাসি হেসে নিজের সীমন্তের উপর রক্তগোলাপের স্তবকটা বুলিয়ে দিল।

হঠাৎ নীরেনের মনে হোল যে সীমা এখন হয়ে গেল অসীমা। পৃথিবীর সবগুলি নাম নিয়ে একটি মহিম্ন স্তোত্রের শ্লোক হয়ে গেল। নিমেষে সহসা বিদ্যুৎচ্ছটার মত একটা অসহ আলোকে ওর মন ভরে গেল। বিরহ মিলন গমন প্রত্যাগমন জীবন মরণ সংসারের সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে একটা অনন্তের সৃষ্টি করল যা লোপ করে দেওয়া যাবে না।

তাই তো চোখের সামনে রক্তগোলাপে আর সিঁদুরে সব একাকার লাল রং হয়ে গেল।

১৩

যেন 'নিশি'তে পেয়েছে ওদের।

দলকে দল যে নিশির খপ্পরে পড়ে এমন কথা কেউ কোন কালে বলতে পারবে না। সবচেয়ে দুর্গম অশিক্ষিত অঞ্চলের বুনো লোকদের মধ্যেও এমন জনপ্রবাদ কোনদিন ছিল না।

কিন্তু এদের বেলা সেই অবিশ্বাস্য ব্যাপারই হয়েছে। সাধারণ লোকের দলও নয়। একেবারে শিক্ষিত সুশৃঙ্খল সৈন্যদল। সৈন্য অর্থাৎ জওয়ান। কুসংস্কারে নয়, শৃঙ্খলাতে যাদের শিক্ষা। সর্বাধুনিক অস্ত্রে রণকৌশলে যাদের দীক্ষা।

পাহাড়ের গা বেয়ে লুকিয়ে ঘন জঙ্গল ঘেঁষে ওরা পিছু হটে চলেছে। গভীর গাছপালা ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে। দক্ষিণ মালয়ের শেষ প্রান্তটুকু থেকে সিঙ্গাপুরে পৌঁছোবার পথে। কোনমতে আপাতত প্রাণ বাঁচাবার তাগিদ। ওদের পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

ওদের চারপাশে পিলপিল করছে ওদেরই নিজেদের দীর্ঘায়িত ছায়া। কিল-বিল করছে যেন ভয় আর নির্ভরসা। রবারের জঙ্গলে ভয় আর বিপদ যেন রবারেরই মত টানে টানে বড় হয়ে ওদের ধাওয়া করে চলেছে।

কিন্তু ওদের পদক্ষেপে নেই প্রাণ, নেই কুচকাওয়াজ বা মার্চ করে চলার টান। এমনকি নেই একটুও শব্দ। কারণ মিহি ধুলোর রাশি রবারের মত সব শব্দকে শুষে নিচ্ছে।

আর সেই ধুলো পায়ের তলায় মথিত হতে হতে উপরে উঠে এই পলায়মান সৈন্যদলের মাথার উপর চাঁদোয়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু স্থাণু হয়ে থাকছে না। ওদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

প্রত্যেকেরই মনে একটা লুকিয়ে ঢেকে রাখা প্রশ্ন। এই চাঁদোয়ার ওপর দিয়ে যদি জাপানী বোমারুর দল উড়ে আসে আর পরম নিশ্চিন্তে বোমা ঝরিয়ে যায়? তাক করতে হবে না। পালটা হামলারও ভয় নেই।

অথচ সে সম্বন্ধে কিছু করারও নেই। শুধু মনকে অপেক্ষা করতে দাও। আর চরণকে দাও চলতে।

মেজর নীরেন চৌধুরী মাঝে মাঝে নিজের কাঁধে হাত দিয়ে দেখছে। যেন যে ঝকঝকে রাজমুকুটটা মেজরের পদমর্যাদার প্রতীক হয়ে কাঁধে বিরাজ করছে সেটা কোন ভরসা এনে দিচ্ছে।

তার চেয়ে বড় কথা—কোন বেতার বাণী, 'এস ও এস'।

শিগ্‌গির এসো তোমরা মিত্র বাহিনী। মাথায় মেলে ধর এরোপ্লেনের ঝাঁক ঝাঁক চাঁদোয়া। সামনে এনে দাও ট্রান্সপোর্ট আর অ্যাম্বুলান্স আর আরো সৈন্যদল। যাতে এই খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসার পথটা জাপানীরা বন্ধ করে দিতে না পারে।

দ্রুত পাশ কাটিয়ে পিছন থেকে অবরোধ করার রণকৌশলে জাপানীদের জুড়ি নেই।

একবার পাশে চোরা চাহনি মেরে চৌধুরী দেখল লেফটেন্যান্ট বেচারা তার শুকনো ঠোঁট চাটছে। তার জিভও বারবার যেন চাটার জন্য নয়, শুধু অভ্যাসবশতঃ বেরিয়ে আসছে। চৌধুরী আশা করল যেন নিজের মুখমণ্ডল স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু একথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ হলো যেন চোখের ভুরু দুটো কপালের দিকে উঠে গেছে।

আরেকজন লেফটেন্যান্টের চোখ মিট-মিট করছে। আকাশের তারা যেন মেঘে ঢেকে যাবার ভয়ে আগে থেকেই ঘোমটার আড়ালে চলে যেতে চাইছে।

কিন্তু না। এসব কল্পনা বা উপমার স্থান এখানে নয়। সময়ও এখন নয়। কর্ণেল অনেক আগেই জাপানী শেলের আঘাতে শেষ হয়ে গিয়েছিলেন।

এত বিরাট সৈন্যদল, এই ব্যাটেলিয়নগুলির কর্তৃত্ব এখন মেজর চৌধুরীর দায়িত্ব। তাদের সবাইকে যতটা সম্ভব নিরাপদে পিছু হটে 'বেস এরিয়া'তে নিদেনপক্ষে খোলা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসতে হবে।

কাজেই মেজর আর সকলের মতই মুখ বুজিয়ে রেখেছে। জোরে চেপে।

এখন সে মনকেও জোর করে চেপে রাখতে চাইল। মনে মনে নিজেকে সমঝাল মনের বালাই থাকলে যুদ্ধ করা চলে না। তুমি এখন শুধু একটি মেসিন, মন নও। তুমি যন্ত্র। যন্ত্রের বালাই এখন নেই। কারণ মনই নেই।

কিন্তু চোখ খুলে রা'তেই হবে। তাও অনেক কষ্টে। নাকেরও সেই অবস্থা। সব ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে চলতে হবে। পরম যোগীদের মত। আর খোলা রাখলেই ধুলো খেতে হবে।

যোগীরা বায়ু গ্রহণ করেই নাকি যোগ সাধনা করতে পারেন। কিন্তু এরা যা খেতে পারে তা হচ্ছে শুধু ধুলো।

ধুলো-ভূক যোগীদের কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে?

মেজর নিজেকেই নিজে এই প্রশ্ন করল।

কিন্তু নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। না খোলা যায় নাক, না মুখ। অথচ শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। যেটুকু হাওয়া ভিতরে টেনে নেওয়া যায় সেটুকুও ভেজাল গ্যাসের মত। অর্থাৎ হালকা হাওয়া। ফুসফুস তাতে ভরে না। এত হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ীয়া জঙ্গলে কোন কিছুতেই কিছু ভরে না।

কোন কিছুই ভরে না। অবসন্ন মন ভরে যায় এলোমেলো পাগলা হাওয়ার মত রাশি রাশি চিন্তায়। চৌধুরী এক পলক উপরে নজর দিয়ে ধুলোর কুণ্ডলীর দৃশ্য দেখে যেন হঠাৎ দিশাহারা হয়ে গেল।

কোথায় আকাশ? আকাশ ভরে তাদের সৈন্যদলের লাইন ঘিরে এ যেন ধোঁয়ার কুণ্ডলী নয়। এ যেন সমুদ্রের মধ্যে হঠাৎ ফুঁসে ওঠা জলস্তম্ভ। অসীম জলরাশি কোন অজানা টানে ফুলে উঠে আকাশে লাফ দিয়ে উঠেছে আর চার-দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

জলস্তম্ভের কথায় মনে তৃষ্ণা নতুন করে জেগে উঠল। পলায়মান সৈন্যদল যতদূর সম্ভব ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে, পিছনে ফেলে রেখে সামনে পালিয়ে যেতে চায়। আগে তো পৈতৃক প্রাণটা—যেটা আপাততঃ সরকারের জিম্মায়—বাঁচুক। তারপর অন্য কথা।

হঠাৎ যেন গলা শুকিয়ে গেল। আর জন্মের প্রথম দিন থেকে জমানো তৃষ্ণা বুক ঠেলে উপরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে যেন মাথার পিছনে ধড়াস করে একটা ধাক্কা। মানসিক সেই আঘাতে তার চৈতন্য ফিরে এল। নিজেকে সামলে সে বুকটা আবার একটু টান করে মাথা তুলে নিল। না, মেজর চৌধুরীর উপর আজ অনেক অনেক দায়িত্ব।

ট্রেনিং ক্যাম্পে সাইকলজিক্যাল ওয়ার-ফেয়ার ক্লাসে বোঝানো হয়েছিল যে মৃত্যুর বাস্তবতা সব সময়ই তোমার মনে উপস্থিত থাকবে এবং তার হাত এড়াতে চেষ্টা করো না। এইভাবে নিজেকে বাঁচানোর সবচেয়ে জরুরী তাগিদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার কৌশলগুলিও ভুলে যেতে পারবে না—যতই হঠাৎ চাপ আসুক।

যারা খুব বেশী মনকে বাঁচার দিকে আর চোখকে বিপদের দিকে খোলা

রাখে তারা ক্রমে পাগলামি করতে শুরু করে। ফলে হয়ে যায় শত্রুর সামনে ভীরু এবং সহজে শত্রুর শিকার।

নতুন আমদানী ট্রেনিং পর্যায়ে ইংরেজ মেয়ে সাইকলজিস্ট আর সাইকিয়াট্রিস্ট পর্যন্ত ঝাঁকে ঝাঁকে আমদানী করা হয়েছিল। ট্রেনিং-এর ফল কেমন হচ্ছে তা যাচাই করার জন্য। মিষ্টি জীবনের মজাদার আমেজ হয়তো একটু বয়ে গেল ক্যাম্পে। কিন্তু কর্তব্যে ভরা দিন ও সন্ধ্যাগুলোতে তারা ইস্পাতের মত কঠোর আর সীসার মত রংহীন হয়ে থাকত। নেহাতই মরীচিকা। মরুভূমি ভরা জীবনে। সেও ছিল এক রকমের আকণ্ঠ তৃষ্ণা। ভাগ্যবানরা অবশ্য সে তৃষ্ণা লুকিয়ে চুরিয়ে মেটাত।

প্রকাশ্যে অবশ্য নীরেনের সহকর্মী তরুণ অফিসাররা ওরই মধ্যে কিছু আনন্দ আমদানী করেছিল। আমেজে আবেশে ওরা এই তরুণী বা মাঝবয়সী সুবেশা ইউনিফর্ম-ধারিণীদের লক্ষ্য করে গান গাইতো দল বেঁধে।

এখন গরম সীসা আর আগুনে ইস্পাতের খেলা। মরণের সঙ্গে খেলা। গভীর রাতে ঘন জঙ্গলে উপায়হীন ভাবে পালাতে অর্থাৎ মাথা ঠিক রেখে পিছু হটতে হটতে নীরেনের ব্যাটেলিয়নকে ক্রমাগত জাপানীদের ওড়ানো আলোর হাত থেকে লুকোতে চেষ্টা করতে হতো।

একদিকে হঠাৎ রঙীন আলো। অন্যদিকে কোথাও বিজলীর মত আলো। পিছনে হয়তো কামানের সগর্জন সেলাম। বাতাস চিরে মেশিনগানের বাঁশ ফাটানো বাঁশী। আকাশ ভরে স্টার শেলের ফুলঝুরি।

প্রত্যেকটা দিনমানকেই মনে হতো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী। সামনের আগামী দিনটাই বা রেহাই দেবে কেন?

তবু পিছু হটে কোনক্রমে সিঙ্গাপুর 'কজওয়ে' সামুদ্রিক সাঁকোটার ওপার পর্যন্ত না পৌছুলে রক্ষা নেই।

রাইফেলধারী কোম্পানীগুলির সঙ্গে এলোমেলোভাবে মিশে গিয়েছে আরো অন্যান্য কোম্পানী। যারা খচ্চর আর গাধার পিঠে মাল চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারাও। মাল আর অস্ত্র দুই-ই চলেছে একসঙ্গে।

খচ্চরদের গতি সৃষ্টির আদিকাল থেকে সেই চিরন্তন দু মাইল ঘণ্টায়। ইনফানট্রির পায়ে হেঁটে পলায়মান দলগুলির গতিও প্রাণের দায় সত্ত্বেও তার চেয়ে বেশী নয়। তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে ভয়ে আর হতাশায় সৈন্যদের পাগুলি পাথর হয়ে গেছে।

অথচ জাপানীরা তেড়ে ফুঁড়ে আসে। যেন পায়ে তাদের মোটরের ইঞ্জিন আর নতুন কাঁটা বা সন্থ ধসে যাওয়া পাহাড়িয়া পথগুলি যেন মন্টিকার্লোর রেসিং ট্র্যাক।

জাপানী আগুয়ান বাহিনীর জন্য। বৃটিশের পলায়নী সেনার জন্য নয়।

এদিকে জাপানীদের অস্ত্রের চেয়ে বেশী ভয়ের কথা ওদের তৈরী রোড ব্লক। অর্থাৎ লুকোনো অ:ঘাটা দিয়ে এগিয়ে এসে আগে থেকে মুক্তির পথ অবরোধ করে দেওয়া। তারপর ইঁদুরকে যাঁতাকলের মধ্যে পুরে বন্দী করে···তারপর?

তার পরের খবর ওরা জানে না। ভ:বতেও চায় না। কারণ ভাবলেই ভয়। ভয় মানেই অসহায় আত্মসমর্পণ। ভয় মানেই পলায়নী মনটাকে পঙ্গু করে তোলা। গোটা মালয় জুড়েই এমনি করে বৃটিশ সৈন্য বিনা যুদ্ধে বন্দী হয়ে যাচ্ছে।

এগোতে এগোতে একটা চড়াইয়ের সামনে ওরা এসে পড়ল। অতএব চড়তেই হবে। যদিও বেশী উঁচু নয়। পাশ কাটিয়ে যেতে গেলে কতদূর বেশী ঘুরতে হবে তার ঠিক নেই। শুধু তাই নয়। যদি ওরা কোন খোলা জায়গায় এসে পড়ে জঙ্গলের সামান্য আবরণ আর বাঁচোয়াটুকুও থাকবে না। অতএব চড়াই পার হতেই হবে।

পিছন থেকে হু হু করে পাহাড়ী বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওদের সামনের দিকে ঠেলে দিতে লাগল। জওয়ানদের ভারী শ্বাস-প্রশ্বাস তার সঙ্গে মিশে একটা অদ্ভুত আওয়াজের মত প্রত্যেকের কানে লাগতে লাগল।

না, এর চেয়ে নীরবতাও ভাল।

না, এর চেয়ে নীরবতাও ভাল। এমনকি শত্রুপক্ষের ছরর ছরর মেশিনগানের গুলি বা মর্টারের চাপা শব্দের আগমনী। এমনকি আর্টিলারীর কামান-গর্জনও।

প্রত্যেকেরই মনে একমাত্র ও শেষ কামনা—বাঁচতে হবে। বাঁচার জন্য যুঝতে হবে। অবশ্য যুদ্ধ করার কোন সুযোগ নেই।

ওরা নিজেরাই শত্রু সৈন্যদের সমুদ্র থেকে মালয়ের তীরে তীরে নেমে পড়া আটকাতে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জাপানীদের কৌশলী এনসার্কলমেণ্ট ব্যূহের ফলে প্রায় বিনা যুদ্ধেই ওরা পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়েছে। যা কিছু হতাহত নিজেদেরই দলের। মায় দলপতি পর্যন্ত।

উলটে এখন জাপানীরাই এগিয়ে আসছে শমনের মত। কামানও চালাতে হচ্ছে না। ধাক্কা না-দেওয়া (রিকয়েল-লেস) রাইফেলের ধাক্কাই যথেষ্ট। এমন

বেধড়ক পালাতে হয়েছে যে কারো কারো হাতে নেই হাতিয়ার, পায়ে নেই বুট, গায়ে নেই শার্ট।

কিছু হয়নি নেওয়া। প্রায় সবই গেছে খোয়া।

যা বাকি আছে তা হচ্ছে দুশমনের ধেয়ে আসা। সেটাই সত্য। আর সব মায়া। উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়ার উপরের মেঘলা রং মাখা আকাশের মতই মায়া।

চৌধুরী প্রাণপণে ভাবতে লাগল কি করে সবার মনোবল অক্ষুণ্ণ রেখে এদের এই ঘেরাও অবস্থা থেকে নিরাপদে বের করে আনা যায়। এই নিরেট অন্ধকারে নীরবতাই সব চেয়ে বড় ভয়ের কথা।

ওদের মধ্যে কথাবার্তা চালু করালে কি কোন ফল হবে? কিন্তু তার বিপদ আছে। প্রত্যেকের মনেই ভয় ও অসহায়তা জমাট বেঁধে আছে। যদি তা একবার ভাষার স্রোতে বেরিয়ে আসে তাহলে শৃঙ্খলা বা সাহস কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

তখন কোন হুকুমই আর হুকুম বলে কেউ মানবে না। সেনাদলের সব চেয়ে বড় সর্বনাশ হচ্ছে সেই অবস্থা।

তাছাড়া ওই বুভুক্ষু দলের ক্ষুধার্ত পদক্ষেপ আর তৃষ্ণার্ত মুখ দেখে কথা কওয়ানোর কথাই ভাবা যায় না।

তার চেয়েও বড় কথা আছে। যত বেশী দিন মানুষ যুদ্ধের মধ্যে থাকে ততই সে অন্যের প্রতি সহানুভূতিহীন হয়ে উঠতে থাকে। নিজে যদি সে একটুও নিরাপদে থাকে তাহলে যারা বেঘোরে মারা যেতে পারে বা সামনের সারিতে শত্রুপক্ষের প্রথম খদ্দের হয়ে আছে তাদের জন্য মাথাব্যথা থাকে না। এমন কি বিপদ ও নিরাপদের মধ্যে মাত্র কয়েক গজের তফাত থাকলেও। যত দিন যায় ততই সে নিজে যে সময়টুকু মৃত্যুর মুখোমুখি আছে তার বাইরে ভয় দয়া মায়া কিছুই থাকে না।

তাই সেনাপতির কঠোর হুকুম অত সহজে, অস্বাভাবিক আর অসাধ্য হলেও অত অম্লান ভাবে বেরিয়ে আসে।

কিন্তু চৌধুরী নিজেকে মনে মনে সমঝে নিল—সাবধান চৌধুরী, তুমি পেশাদার যোদ্ধা নও। তুমি শুধু হাড়শক্ত ঝাঁঝাপোড়া নিরেট একটি অস্তিত্ব নও। তোমার অন্য পরিচয় আছে। কিন্তু সবার ওপরে তুমি যোদ্ধা। কর্মের নিষ্ঠায় নিষ্ঠুর।

সে খুব বেশী দিন আগে সৈন্যদলে আসেনি। কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যেই তার অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। অতি অল্প সময়ে অনেক খানি।

জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে যে বিরাট একটা দেওয়াল ছিল সেটা আজ তার কাছে ফানুসের কাগজের চেয়েও পাতলা, স্বচ্ছ। এদিক থেকে ওদিক সবই যেন দেখতে পাওয়া যায়। তবে এত ভয় কেন? কেন এত মায়া?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজে সমস্ত নীরবতা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। একটি রাইফেলের আওয়াজ। অনেক দূরে। কিন্তু নিঃসন্দেহ রাইফেলের আওয়াজ। এবং নিজেদের নয়।

হঠাৎ যেন এক বালতি ঠাণ্ডা জল কে তার গায়ে ঢেলে দিল। নিজের চারপাশে যেটুকু নির্মম কঠোরতা বা নিঃসহায় উদাসীনতা ছিল তা সাপের খোলসের মত খসে পড়ল। ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল।

সে যদি শুধুই সেনানী হয়—নিষ্ঠায় নিষ্ঠুর, উদ্দেশ্য পালনে হৃদয়হীন হয় তাহলে কেমন লোকটিকে সে সীমার সামনে এনে হাজির করবে? তার যোগ্য প্রণয়ী, তার জীবনসঙ্গী, তার সহধর্মী স্বামী হিসাবে নিজেকে ভবিষ্যতে দাঁড় করাবে?

চৌধুরী নিজেকে সামলে নিল। সে এখন পেশাদার যোদ্ধা। তার ইউনিফর্মের মর্যাদা দিতে হবে। এতগুলি প্রাণ নিয়ে যার দায়িত্ব, প্রণয়িনীর কথা সে ভাববে না।

সামনে আছে একটা দলং অর্থাৎ পোল। আগে পিছনে রাস্তা হিসাবে ম্যাপে দেখানো আছে একটা সরু মাটির লাইন। তার দুটো টুকরোকে জুড়ে দিয়েছে কাঠের গুঁড়ি আর পাটাতনে সাজানো একটা দলং।

শত্রু নিশ্চয়ই দলংয়ের খবর আগে থেকেই রেখেছে আর একজন সৈন্যই একটা কাঠের পোল লোপাট করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

তাহলে এই দলংয়ের উত্তর পারে দলের সব সৈন্য ইঁদুরের মত আটকে পড়বে। তাহলে জাপানীদের আর কষ্ট করে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে এসে এই সৈন্যদের পাশ কাটিয়ে অর্থাৎ আউট ফ্ল্যাঙ্ক করে আটকে ফেলার কোন দরকারই হবে না।

অন্ধকার নেমে আসছে। আশাও তাই বাড়ছে।

রাস্তাঘাট তৈরী করার স্যাপার দল পোলটা যাচাই করে দেখে নিল। নাঃ। ঠিকই আছে। এবং তার নিচে কোন ফিউজ লাগানো নেই। যেখানে যেটুকু দরকার ঠেকা দিয়ে আরো মজবুত করে নিল।

নীরো একবার চারপাশে ভাল করে দেখে নিয়ে কজন সৈন্যকে দূরে দূরে ঘাঁটি পাহারায় মোতায়েন করল। পাহারা দিতে হবে—যাতে হঠাৎ কোন শত্রুর হামলা বা স্নাইপিং না শুরু হয়। বিনা হুঁশিয়ারীতে।

অন্ধকার হয়ে গেছে। অতএব দুশমন অন্ধকারে আক্রমণের জন্য কোন বড় দল নামাবে না। কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে পাহাড়ের আড়াল থেকে হঠাৎ ভেরি লাইট ফেলে সবুজ আলোর ফোয়ারা ছড়িয়ে দিতে পারে। সবুজ আলোয় বহুদূর থেকে রাইফেলের গুলির লালচে বিদ্যুৎ কেমন দেখাবে তা কল্পনা করার সময় কেউ পাবে না।

অথবা ঠিক মাথার উপরের চূড়া থেকে তাক করে লাট্টুর মত বোঁ বোঁ করে গ্রেনেডও ছুটে আসতে পারে।

অথবা কালীপূজোর সময়ে ছুঁচো বাজীর মত হিসহিস আওয়াজ করে মর্টার।

অথবা হালকা মেশিন গান।

জাপানী সৈন্যরা নিজেদের পিঠের উপরে মেশিন গান বেঁধে চার হাত পা দিয়ে ভারবাহী খচ্চর সেজে যায় আর ডাইনে বাঁয়ে গা হেলাতে থাকে। সে অবস্থায় মেশিন গানের গুলি যে কী সাংঘাতিক কার্যকরী হয় তার প্রমাণ ব্রিটিশ সৈন্যরা হাতে হাতে পেয়েছে।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ রাইফেল ছোঁড়ার আওয়াজ। একেবারে পাশে। একজন টহলদার পাহারা দিতে দিতে লুটিয়ে পড়ল।

নীরেন ছুটে গিয়ে তাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করল। পর মুহূর্তেই এ অবস্থায় কি করা উচিত সে শিক্ষা মনে হলো। সে তার পাশে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে ক্যান্টিনের জল একটু মুখে দিল।

এই ক' নিমেষেই বেচারা জোয়ানের চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। সেজন্য কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ফিসফিস করে সে বলল হিন্দীতে, আমি মরছি, মেজর সাহেব। মরছি। আমি। আমি।

বলতে বলতে জোয়ান চোখ বুজল। ঢোঁক গিলল। তারপর আবার বলল, সাব, আমি মরছি। দাঁড়িয়ে ছিলাম অন্ধকারে। হঠাৎ কি যেন একটা ধাক্কা খেলাম। সাব, আমি কি বাঁচব?

নীরেন ওর কপালে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল—একটু সহ্য কর, এখনি স্ট্রেচার পাঠাচ্ছি। মেডিক (ডাক্তার) এসে তোমার গুলি বের করে দিলেই তুমি আরাম পাবে।

কিন্তু বলতে বলতে একথা বলার অর্থশূন্যতাও যেন একটা বুলেটের মত নীরেনকে ধাক্কা দিল।

সে আর মুমূর্ষু জোয়ানের দিকে তাকাতে চাইছে না। তার বুকের ঠিক মোক্ষম জায়গায় রাইফেলের গুলি লেগেছিল। তাই মাথায় কপালে হাত বুলিয়েছিল। কিন্তু চোখ না বুলিয়ে নীরেন যাবে কোথায়?

জোয়ান হঠাৎ বলে উঠল—সাব, আমার বাড়িতে খবর পাঠাবে তো? ওরা যেন কষ্ট না পায়। ওদের লিখো···আমার···বেশী কষ্ট হয়নি।

নীরেন মুহূর্তের জন্য বাকি সৈন্যদলের ব্যবস্থার কথা মন থেকে সরিয়ে দিল। জোয়ানের ঘাড়ের তলায় হাত দিয়ে ওকে কষ্ট একটু কমাবার মত ভঙ্গিতে শোয়াবার চেষ্টা করল।

কিন্তু ততক্ষণে বেচারার চোখ আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। যদিও চোখ বোজেনি।

না; এখন নীরেনকে এত বড় একটা ব্যাটেলিয়নের গতিবিধি, নিরাপদে মুক্তির ব্যবস্থা দেখতে হবে। এই জোয়ান শুধু একজন। ব্যাটেলিয়নে আছে বহু জন।

আর যুদ্ধ জগৎ জুড়ে।

বাকী সৈন্যরা যেন স্রোতে ভেসে এগিয়ে অর্থাৎ পেছিয়ে চলল। অর্ডার দেবার দরকার নেই। ওরা জানে যে সাঁকো মানেই মুক্তি। অন্তত এ যাত্রার মত প্রাণে বেঁচে যাবার প্রথম সোপান।

ওরা ধুঁকতে ধুঁকতে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে চলল। যেন গড্ডালিকা। কিন্তু প্রবাহ নয়। নিশিতে পাওয়া অবসন্ন আত্মবিস্মৃতের দল।

একটু ক্ষণ নিঃশ্বাস নিয়ে নীরেন ভাবল তার ট্রেনিংয়ের কথা। এরকম সময়ে কি কি মাল হাতের কাছে থাকে আর কি কি অস্ত্র ব্যবহার করতে হয় সে সম্বন্ধে ট্রেনিং সেণ্টারে বক্তৃতার কথা।

ক্যামেরণ হাইল্যাণ্ডাররা একবার গ্রাণ্ট ট্যাঙ্ক আর মাউণ্টেন ব্যাটারী নিয়ে জাপানীদের রোড ব্লক ভেঙে দিয়েছিল। তারপর তারা একলা পড়ে যাওয়া ছত্রভঙ্গ ব্রিগেডকে উদ্ধার করেছিল। কিন্তু এখন কোথায় গ্রা-ট্যাঙ্ক আর কোথায় মাউণ্টেন ব্যাটারী?

রোড ব্লকের দরকারই হবে না। শত্রুরা এমনিতেই ওদের গ্রাস করতে পারবে এখন।

আর একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরেন বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভাবতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার সমস্ত চৈতন্য হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠল। ও নিজের সঙ্গে রেখেছিল শুধু রিয়ার সেকশনের সৈন্যদের। অন্য সকলকে পার করে দিয়ে তবেই সে এদের পার করাবে। সবার শেষে সে নিজে দাঁড়িয়ে এই পোলটা ভাঙিয়ে চলে যাবে। মুক্তির পথে। সীমার পথে।

যে ওর কাছে অসীমা সেই সীমার পথে।

কিন্তু গোটা পঞ্চাশ গজের মধ্যেই কোন কোণা থেকে জাপানী সাবমেশিন গান চলতে শুরু করেছে? পোলটা মেশিন গানের তাকের ঠিক মাঝখানে।

এখনো অনেক জোয়ান পার হতে বাকি। নিজের সঙ্গের রিয়ার প্ল্যাটুন আর নিজে পার হবে সবার শেষে। নিজস্ব দায়িত্বের মহিমা তাকে যেন সীমার কাছে, অতি কাছে এনে দিল।

অর্থাৎ পিছনে। স্মৃতির উজানে পিছু টানে।

শুধু নিমেষের জন্য।

কিন্তু এখন তাকে পিছনে ঘুরে শত্রুসৈন্যের মেশিন গানের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাতে হবে। অন্ধকারে কোন্ টেরে পাখীর বাসার মত ডালপালায় ছাওয়া মেশিন গানের বাসা পাতা হয়েছে তার হদিস মিলবে কি করে?

সে নিজের প্ল্যাটুন থেকে একটা স্কোয়াড—ছোট্ট দল বেছে নিল। অর্থাৎ প্ল্যাটুনের বাকি সৈন্যরাও হয়তো এদের খরচের খাতায় রেখে নিজেদের বাঁচিয়ে সরে যেতে পারবে।

এই স্কোয়াড শুধু এলোপাথাড়ি সামনে হামলা দিয়ে চার্জ করবে না। যতদূর সম্ভব হামাগুড়ি দিয়ে আড়ালে আবডালে এগিয়ে যাবে। তারপর করবে গ্রেনেড বৃষ্টি। তার পরেই সরে আসবে। সেই সময়টুকু প্ল্যাটুনের বাকি লোকরা পিছন থেকে মেশিন গানের গুলির ধারা দিয়ে রক্ষাকারী ছাতা সৃষ্টি করবে।

নীরেন যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না যে নিজে সে এমন একটা অভিযানে চলেছে। কেমন করে না জানি তাঁর ধারণা ছিল যে এমন একটা অভিজ্ঞতা তার নিজের হবে না। কোনরকমে এমন কিছু হবে যাতে জাপানীদের সঙ্গে বেয়নেট বা বন্দুক নিয়ে মুখোমুখি মোকাবিলা করতে হবে না।

না। এসব চিন্তা মনে আসাও এখন অন্যায়। বাঙালী হয়ে জন্মেছে বলে, ইচ্ছামত চিন্তা করতে শিখেছে বলে সে তো কর্তব্যচ্যুত হতে পারে না।

সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে জেনেও তার ব্রিগেডের কম্যাণ্ডার একটা ব্যাটেলিয়নকে মালয়ের উপকূলের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সামরিক শিক্ষার আগের পর্বে হলে সে তর্ক না করলেও নিজের বক্তব্য অন্তত রাখত। অন্তত চেষ্টা করত।

কিন্তু এখন সে সামরিক শৃঙ্খলার কাছে উৎসর্গীকৃত। হঁ্যা, উৎসর্গীকৃত—স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়। বীর সন্ন্যাসীর বাণী বীর সৈনিক উপেক্ষা করে কি করে?

যুদ্ধক্ষেত্রে তর্ক অচল, অসহ্য। বিতণ্ডা মানেই ঠাণ্ডা।

খরচার খাতায় তোলা সে আর তার নির্বাচিত স্কোয়াড ঠিক মতই কাজ করল। কিন্তু তাতে যে শেষ রক্ষা হবে না তাও পুরোপুরি জানা ছিল। প্ল্যাটুনের বেশীর ভাগ লোক পোল পার হয়ে গিয়েছে। এবার নিজেদের পালা।

সঙ্গের সবাইকে সে সোজা লাইনে নয়—এঁকেবেঁকে দৌড়ে পোলটা পার হতে হুকুম দিল। হুকুম না দিলেও হয়তো ওরা এখন দৌড়াতো। কিন্তু সর্বদাই নিজের উদাহরণ দিয়ে সে ওদের শিখিয়েছে।

সে নিজে রইল সবার পিছনে। অর্থাৎ শত্রুর সবচেয়ে কাছে, সবচেয়ে সামনে। একা।

ঠিকই তো। জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি সে হয়েছিল একা। মরণের সঙ্গেও তাই। চুপিচুপি হামাগুড়ি দিয়ে সে এগিয়ে গেল।

তার শেষ হ্যাণ্ড গ্রেনেড সে তুলে নিল। চার সেকেণ্ডের গ্রেনেড। তার লেভার-কলের মুখটা খুলে নিয়ে নিজের হাতেই দু সেকেণ্ড গ্রেনেড ধরে রাখল। এতে বেশী মোক্ষম ফল পাওয়া যাবে। তাই দু সেকেণ্ড পরে সেটা মেশিন-গানের লুকানো কুঞ্জের উপর ছুঁড়ে মারল। দুড়ুম দুড়ুম দুম্। সব চুপচাপ।

ওদিকে পিঁপড়ের মত সারি দিয়ে নিঃশব্দে ওর শেষ সৈন্যগুলি সাঁকোটা পার হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মেশিনগান কুঞ্জের কাছাকাছি আরো শত্রু সৈন্য লুকিয়ে মোতায়েন ছিল। তারা গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল।

মরীয়া হয়ে নীরেন সেই লুকোনো ঘাঁটির উপর ফিকস্‌ড বেয়নেট নিয়ে তাড়া করল। দুজনকে বিঁধে ফেলল। তৃতীয় জনের বুকে বেয়নেট এমনভাবে বিঁধে রইল যে সে সেটা টেনে ছাড়িয়ে নিতে পারল না। ইতিমধ্যে কি যে হয়ে গেল নীরেন তা জানতে পারল না।

যখন জানতে পারল তখন তার সামনে একজন অতি উচ্চপদের জাপানী সামরিক অফিসার। সামুরাই তরোয়ালেই তার পদের পরিচয়।

সোনা আর হাতির দাঁতের কাজ করা কালো কাঠের কারুকার্যে ভরা ঢাকনা রয়েছে হাতলের উপর। ইস্পাতের উপর কুচো কুচো চুনী আর পান্না বসানো। চামড়ার খাপখানাই বা কি সুন্দর।

মনে পড়ল, মিলিটারী মেসে জাপানী জেনারেলদের সামুরাই সোর্ড নিয়ে ওরা কত আলোচনা করত। বলাবলি করত যে ড্রয়িং রুমে সাজিয়ে না রেখে বনেদী বংশের এই উত্তরাধিকারগুলি যে জাপানীরা রণক্ষেত্রে নিয়ে আসে তা নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ অফিসারদেরই উপহার দেবার জন্য। 'রামে'র গ্লাস মাথার উপরে তুলে জাপানীদের এরকম সদিচ্ছার জন্য ওরা 'টোস্ট' করত। এই সামুরাই তরোয়াল একদিন তাদের ব্রাইটন বা সাউথ এণ্ডের সাগরপারের কুটিরগুলির শোভা বাড়াবে।

সে কথা মনে পড়ানোর ভার অবশ্য এখন জেনারেলের। উৎসাহ করে তিনি নিজেই বন্দী ভারতীয় অফিসারের ইনটারোগেশন চালাচ্ছেন। ইংরেজী জানেন তিনি। এবং বন্দী তার পদমর্যাদায় অভিভূত হয়ে জাপানী সাম্রাজ্যের সৎ উদ্দেশ্য সহজে বুঝে নিতে পারবে।

বোঝাতে পারলেন না কিন্তু কিছুই তিনি। আহাম্মক না হলে কি সে 'স্লেভ আর্মিতে' যুদ্ধ করতে এসেছিল? এবং আহাম্মক না হলে এহেন সুযোগ কেউ ছেড়ে দেয়? কত সৈন্যদল পিছনে আছে, সিঙ্গাপুর 'কজওয়ে'র এপারে কত আর ওপারেই বা কত, তাদের মধ্যে ভারতীয় কত—কিছুই মিষ্টি কথায় বের করা গেল না।

বহু তর্জন গর্জন অত্যাচারেও কিছু ফল হোল না। সর্বাঙ্গে যত রক্তধারা ছুটল তাতে সামান্য একটু খবর দিলেই ওষুধের প্রলেপ পড়বে এ প্রলোভনেও কিছু হলো না। দেহ বিবশ। মাথা প্রায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। তবুও না।

নীরেনের এমনভাবে আহত আর প্রহৃত হবার কোনরকম সম্ভাবনাও নিশ্চয়ই সীমার মনে আসবে না। তবু সে এই অত্যাচারের কাছে নতি স্বীকার করবে না। সামরিক শপথকে সবল করে তুলল সংসারাতীত প্রেমের স্বীকার। না, নীরেন চৌধুরী সব কিছুর উপরে। সব কিছু ছাপিয়ে যাবে।

অন্ধকার জঙ্গলের বেড়াজাল এড়িয়ে তার প্ল্যাটুন পোল পার হয়ে দক্ষিণে মুক্তির দুয়ারে পৌঁছে গেছে কি? দেশ, দেশের ডাক কত মহান, দেশের

ভালবাসা কত সবল, কত সর্বব্যাপী। এই মালয়ের জঙ্গলে বিদেশের অন্ধকারে দেশ আর যার জন্য দেশ এত আকাঙ্ক্ষিত এত মনোরম সেই সীমা নীরেনের রক্তমাখা মুখের ছুটি মুদে-আসা চোখের সামনে জেগে উঠল।

হঠাৎ লাট্টুর মত ঘুরপাক খেয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল মেজর নীরেন চৌধুরী। নিজেরই রক্তে তার মুখ রক্তরাঙা হয়ে গেল। রক্তে চোখদুটিও ভরে গেল।

জাপানীরা আর ওর উপর সময় নষ্ট করবে না। এখনি ধেয়ে যেতে হবে সিঙ্গাপুরের দিকে।

একজন অর্ডার দিল—বানজাই, বানজাই। বেয়নেট প্র্যাকটিশ।

অর্থাৎ বন্দীকে তুলে ধর, গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হাত-পা বাঁধ। তারপর আনকোরা নতুন সৈন্যরা জ্যান্ত বন্দীর উপর বেয়নেট বেঁধানো প্র্যাকটিশ করবে। বন্দীকে কাজে লাগাতে হবে তো।

বন্দীকে বাঁচিয়ে রাখার হাজারো ল্যাঠা। প্রিজনার অব ওয়ার কনভেনশন নিয়মটা একটা বেজায় রকম অসভ্য অসুবিধা।

হঠাৎ বেয়নেটধারীর দল বোধহয় থমকে দাঁড়াল। একটা জীপের মত গাড়ির মোটর গর্জন করে উঠল। তার উপর থেকে সম্ভবত সেই জেনারেলই হুকুম দিলেন, না, বেয়নেট নয়। ওকে বাঁচিয়ে রাখ। শিগগিরই অন্য কাজে লাগতে পারে।

শক্ত রশির বাঁধন খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অচেতন দেহ মাটিতে ঢলে পড়ল।

রক্তগোলাপের স্তবকের মত দেখাচ্ছিল নীরেনের মুখ। সেই স্তবক যা সীমার হাতে স্তব্ধের মত নীরবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল একদিন।

রক্তগোলাপের স্তবক।

১৭

নারী না হয়ে যদি ঘোড়া হয়ে জন্মাতাম।

প্রায় মনে মনেই কথাটা বলেছিল মেখলা।

স্বয়ম্ কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সুশিক্ষিত অস্ট্রেলিয়ান ওয়েলার ঘোড়া দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ এমনিভাবেই চমকে গেলে থমকে দাড়ায়।

এই তরুণ রূপসী মেখলার স্বামী ফিল্ড রেজিমেণ্টে সদ্য প্রমোশন পাওয়া ক্যাপ্টেন। সুন্দর বাংলো বাড়ি ; মিলিটারী কেতায় ছিমছাম। আসবাবপত্র ফিটফাট। প্রকাণ্ড একটা পুরনো ওল্ডস্‌মোবিল আমেরিকান মোটর। একটা খোলা ঘোড়ার গাড়ি, তার মিলিটারী নাম ট্র্যাপ।

আর অন্তত পুরো এক ডজন চাকর-বাকর। কিন্তু চাকর বললে তাদেরও মর্যাদাহানি হবে। আর মনিবের তো হবেই। কারণ তাদের পরিচয় হচ্ছে বাটলার, খানসামা, খিদমতগার ইত্যাদি ইত্যাদি। পিরামিডের মত ধাপে ধাপে পদের মর্যাদা আর মাইনে।

এই ধরনের বাংলো বাড়ির চৌহদ্দি আর চটক, ঠাট আর জমজমাট বাইরের বাকী দেশটার কাছে হিংসা আর কল্পনার খোরাক।

কিন্তু মজার কথা হচ্ছে এই যে সেখানকার সেরা ঘর হচ্ছে বুটখানা। বৈঠকখানা নয়, বুটখানা। গোটা একখানা কামরা শুধু শ্রীচরণের সেবায় উৎসর্গ। হরেক রকমের আর ফ্যাশনের জুতো সেখানে।

নতুন প্রমোশন পেয়েছে স্বয়মের সিনিয়র বন্ধু মনোহর শর্মা। রাঁচি এরিয়াতে এই ফিল্ড রেজিমেণ্টে সে নতুন এসেছে। ট্রেনিংয়ের সময়ে পরিচয় হয়েছিল। শর্মা তখন খবর পেয়েছে যে সে প্রমোশন পেয়েছে। আর খুব ভাল বাংলো পাচ্ছে রাঁচি এলাকায়।

আর্টিলারী অর্থাৎ গোলন্দাজ বাহিনীর তখন খুব নামডাক। রয়্যাল আর্টিলারীর খাস ব্রিটিশ অফিসাররা এই রকম রেজিমেণ্টে সগৌরবে ডেপুটেশনে আসে। বড় খাতিরের পেয়ারের বাহিনী।

তার উপর মনোহরের মত গো-য়্যাহেড, আগুয়ান চালু অফিসার ইণ্ডিয়ানদের

মধ্যে খুব বেশী হয় না। ব্রিটিশ 'বস'রা তো এত সন্তুষ্ট যে, ওরা মনোহরকে ম্যানর বলে ডাকতে অজ্ঞান।

সেই ম্যানর স্বয়ম্‌কে নিমন্ত্রণ করেছিল একটা সপ্তাহান্তে ছুটি নিয়ে ওর বাংলোতে অতিথি হতে। এবং সে সময় গেস্ট-নাইট আছে। স্ট্যাগ পার্টি অর্থাৎ বল্লাবিহীন হরিণদের পার্টি আর তার পরে একই রাতে হরিণীদের আগমন। রস আর রোম্যান্স, রঙীন সুরা আর রঙ্গিণী নারী দুইয়েরই ব্যবস্থা।

অবশ্য নারী মানে প্রিয়া আর প্রেয়সী। তার বাইরে কিছু নয়। পোশাকী জীবনে পিছনের জানলা দিয়ে ছিটেফোঁটা কাদাও চালান করা চলবে না। অর্থাৎ অসামাজিক নারীর স্থান নেই।

যে কোন দিন যুদ্ধে যাবার অর্ডার আসতে পারে। তাই উর্ধ্বশ্বাসে জীবনটা নিংড়ে আস্বাদন করে নিতে হবে।

আজকের দিনটাই সত্য। গত দিন হয়ে গেছে বিগত। আগামী দিন অজ্ঞাত। তাই যেটা সত্য, যেটা মুঠোর মধ্যে সেটাকেই আঁকড়ে ধরতে হবে।

জঙ্গী জীবনে ওমর খৈয়ামের দর্শন হচ্ছে একমাত্র মন্ত্র! আজকের মাধুরীই একমাত্র মধু।

সেই সত্যে দীক্ষা দিতে হবে এই রসহীন গম্ভীর প্রকৃতির সুইট বয়কে। সিনিয়ার অফিসাররা জুনিয়ার ছোট ভায়াদের এমন করেই ছোট থেকে মানুষ করে তোলে। সিভিল আর মিলিটারী দুই প্রশাসনেই।

অতএব স্বয়মের মত একটি আনকোরা ছেলেকে ম্যানর সপ্তাহান্তে একটু পালিশ করে দিতে চায়। একেই বলে ক্যামারাডেরি।

তার উপর বাড়িতে একা থাকে মেখলা। নতুন বিয়ের পর এসেছে। সবে বাংলোটা সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে। এখন থেকে বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপারে হাত পাকাতে হবে।

সে হিসাবে স্বয়মের মত গেস্ট মেখলার শিক্ষার পক্ষে সুবিধাজনক হবে। স্বামীত্বের ডিপ্লোম্যাসী পরীক্ষাতেও সে সসম্মানে প্রমোশন পেত। এ কথা ভেবে মনোহর নিজের বুরুশ মার্কা গোঁফে একটু তা দিয়ে নিয়েছিল।

সেই গোঁফজোড়া আর তাতে মোম মাখানো মোচড় স্বয়মের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সেই দরদ-ভরা দৃষ্টির অপেক্ষায় রয়েছে এই ঘরে ঝকঝকে গ্রীনলি নামের রাইডিং বুট, যোধপুর, ওয়েলিংটন হান্টিং বুট, ইউনিফর্ম বুট, পি টি বুট, ছুঁচোলো

অক্সফোর্ড সু। শুধু জঙ্গী বুটের জোড়াগুলিই নয়, বেসামরিক নিজস্ব জীবনেও জুতি শাহি ছোড়তা। নটবর ধাঁচে ড্রেসিং গাউন পরে আরাম করবার জন্য পাম্প সু, ঘরে ঘরে ঘোরার জন্য কোলাপুরী চপ্পল, বাগানে বেড়াবার জন্য পাঠানী চপ্পল আর ঋতু অনুসারে পরবার জন্য লোমশ ফারের আর মখমলের বেভরুম স্লিপার।

দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে ড্রিলের পোশাকে বাঁধবার শ্যাম ব্রাউন বেল্ট। প্রকাণ্ড কাঠের আলনাতে ঝকমক করছে ঘোড়াকে পরানোর জিন আর রেকাব—যে ঘোড়া হয়ে জন্মালে এই পরমা রূপসী নারী সুখী হতেন।

তার অন্তরের ব্যথার অন্তরঙ্গ স্বীকারোক্তি।

মেখলা মিথিলার প্রাচীন জমিদার বংশের ধনী জমিদারের মেয়ে। স্বয়মের মনে পড়ল—জনমদুখিনী সীতা। মনে মনে প্রার্থনা করল যে এই মৈথিলীও যেন সীতার দুঃখ না পান।

ম্যানরকে যে খুব তাড়াতাড়িই মিথিলার মেয়ে নতুন বিয়ে করা স্ত্রীকে ছেড়ে যুদ্ধের দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভবত এই প্রমোশনটা তারই একটা মোলায়েম প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। আজকের সুখে মশগুল ম্যানরের নজরে তা হয়তো পড়েনি এখনো।

কিন্তু সে কথা ঘুণাক্ষরেও বলা চলবে না। সে যে মেখলার মনের দুঃখের একটুও আঁচ পেয়েছে সে কথাও প্রকাশ করা চলবে না। আবার এত বড় গভীর একটা আক্ষেপকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে গেলেই সেটা আরো বেশী প্রকট হয়ে উঠবে।

হায়! অনুভূতিময় অন্তরে যন্ত্রণাময় অনুভবের অন্ত নেই—

তাই স্বয়ম্ বলল, জানেন মেখলা দেবী, আমাদের মেসগুলিতে যা মাতামাতি হয় ঘোড়ার আলোচনা নিয়ে। চামড়ার কি গুণ, কি মান, কি করে তার জেল্লা বাড়ানো যায়, এসব নিয়ে তর্কাতর্কি চলে হরদম। সম্ভবত তাতে আমাদের মর‍্যাল 'বুস্ট' করা হয়। মনের জোর বাড়ানো হয়। এই ধরুন না, আজকাল আমার মেসে প্যারাশুট সিল্ক নিয়ে যাচাই শুরু হয়েছে। যে রেশমের কাপড় আপনাদের শ্রীঅঙ্গে মানাতো তা নিয়ে আমরা হনুমানরা নাচানাচি করছি। হাওয়ার মাতনে।

গৃহকর্ত্রীকে মিসেস শর্মা বলে ডাকতে স্বয়মের বাধল। তাতে আন্তরিকতা আসতে দেরী হবে। মৈথিলী বলে ডাকতে ওর খুব লোভ হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিনই অতটা এগোলে বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

অথচ জঙ্গী জীবনে পরমায়ুর শ্বাস যে হুস হুস করে বয়ে যায়। তার উপর এয়ার বোর্ন প্যারা রেজিমেণ্টে। আকাশী ঝাঁপের সময় হয়তো ছাতি খুলবে না। হয়তো শুটের বা নিজের ছাতিই শত্রুর চাঁদমারীতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।

তাই তো সামরিক জীবনের সবাইকে এত ভালবাসি। এত তাড়াতাড়ি বুঝতে, আপনার করে নিতে চাই। রবীন্দ্রনাথের শাজাহান কবিতার লাইনগুলি স্বয়মের সব সময় মনে পড়ে। সময় যে নাই।

আর স্বয়মের যে দৌড়াবারও সময় নেই। উড়ে চলছে ওর জীবন। ঝড়ের রাতেও বিরাম নেই। সেটাই তো মস্ত কথা। কিন্তু সমস্ত কথা নয়।

জঙ্গী জীবনে স্বয়ম্ সকলকে আপনার মত করে নেবার, একসঙ্গে গেঁথে নেবার অদৃশ্য মাল-মশলার স্বাদ অনুভব করেছিল। কোন দিন নিজের পরিচিত অসামরিক জীবনে এই জিনিস সে পায়নি।

একটা মিলিটারী ঘাঁটিতে দেশের ছত্রিশ জাতের লোক। নানা ভাষার নানা পরিবেশের নানা ভাবধারার লোক কেমন যেন এক ছাঁচে গড়ে ওঠে। তাদের বাংলো আর ব্যারাক, প্যারেড আর পি. টি. অর্থাৎ ফিজিক্যাল ট্রেনিং, খানা আর পিনা সবই যেন এক সূত্রে সহস্রটি মন গেঁথে রাখার মন্ত্র।

সবই যেন জীবনের এক বৃন্তে এসে কেন্দ্র নিয়ে বসেছে। সেই কেন্দ্রটি হচ্ছে মরণের আমন্ত্রণ।

স্বয়ম্ মনে মনে ভেবেছে যে, মনের গহনে সেই অনুচ্চারিত অঘোষিত মন্ত্রটি আছে বলেই বোধ হয় মিলিটারীরা যেখানে যে অবস্থাতেই যায় মানুষ প্রকৃতি আর প্রাণীকে নিয়ে নিজেদের সংসার গড়ে তোলে। পাহাড় জঙ্গল মরুভূমি কিছুতেই এর ব্যতিক্রম হয় না।

সেই এক হয়ে যাবার মন্ত্রে যারা দীক্ষা নিয়েছে তারা আর তাদের স্ত্রীরাও তো সেই নিটোলভাবে এক হয়ে যাবার কথা। বরং আরো বেশী করে, অনেক বেশী নিবিড়ভাবে। নিজেদের নিঃশেষ করে।

কারণ যে কোন বিচ্ছেদই তো শেষ বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে!

তবে?

স্বয়ম্ ভাবল যে এই রূপসী তরুণী নববিবাহিতার সঙ্গে একটু রসালাপ করলে শাস্ত্র অশুদ্ধ হবে না। সহকর্মীর সহধর্মিণী।

জঙ্গী জীবনে যে রঙীন নেশা মানুষকে মাতিয়ে রাখে তা সঙ্গীন মুহূর্তগুলিতেও বাঁচবার দিশা দেয়। তাই তো সেনাদল মরবার জন্য, মারবার জন্য সাহস পায়।

এই সহজ কথাটা আমরা বুঝি না বলেই তো সামরিক বৃত্তি থেকে সরে থাকি। মুখ ফিরিয়ে থাকি।

কিন্তু এই মহিলা অকস্মাৎ নিজের মনে যে কথা বলে ফেলেছেন তার পর আর কি করে হালকা হাসি-ঠাট্টা করা যায়?

অন্যপক্ষে ওর মনকে যদি একটু হালকা করে তুলতে পারি তাহলে বরং মনে করব যে আতিথ্যের একটুখানি প্রতিদান দিয়ে গেলাম। কিন্তু কি করে আরম্ভ করব?

আরম্ভ করার পথ শ্রীমতী শর্মাই খুলে দিলেন। বললেন, চলুন, বারান্দায় বসে কফি খাওয়া যাক।

স্বয়ম্ শর্মার জন্য অপেক্ষা করতে চাইল। কিন্তু মেখলা বলল, না শ্যাম, ওর জন্য অপেক্ষা করার মানে হয় না। ও ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে তোমার আসার আগে। কাল রাতেও ঘোড়ার তদারকেই বেরিয়েছিল।

—কেন? রাতে তো অর্ডারলি অফিসার আচমকা তদারকি করতে যায়।

—তবু মনোহর নিজেই গেল। শেষ রাতে। একেবারে পুরোপুরি ধড়াচূড়া পরে। ব্লু প্যাট্রল আর জ্যাকেট, ক্যাপ আর তলোয়ার। যেন পটে আঁকা ছবি।

স্বয়ম্ লক্ষ্য করল যে রক্ষণশীল ঘরের নববিবাহিতা বধূ স্বামীর নাম কোনরকমে সলজ্জভাবে উচ্চারণ করল। না হলে অন্যান্য রেজিমেণ্টাল ঘরণীরা ঠাট্টা করে প্রাণ বের করে দেবে। অবশ্য ম্যানর নামটি এখনো মুখে ফুটছে না।

আহা, যতদিন এই আধো ঢাকা আধো ফোটা লজ্জা ওর স্বপ্নকে জড়িয়ে রাখে ততদিনই তো রোম্যান্স।

হালকা হেসে স্বয়ম্ বলে উঠল, আমি কিন্তু আরেকটা ছবিও দেখতে পাচ্ছি, মেখলা দেবী। বিলেতী মায়েরা তাদের মিলিটারীর স্ত্রী মেয়েদের শিখিয়ে দেয়: স্বামীর সঙ্গে কুকুরের মত ব্যবহার করো। বিলেতী মিলিটারীর বরদের বাপরা পরামর্শ দেয়: স্ত্রীকে ঘোড়ার মত যত্ন করো।

ওস্তাদ ক্যাভালরীম্যান আমাদের ম্যানর শিভ্যালরীম্যান হিসাবে নিশ্চয় কম যায় না—বলেই সে হাসল।

মৈথিলীর মুখে লজ্জার অরুণিমা ফুটে উঠতে দেখে স্বয়ম্ খুশী হল।

তবু মেখলা অনুযোগ করল—আমি বললাম, এমন আঁটোসাঁটো পোশাকে শীতের রাতে কি যন্ত্রণা!

মুখ ঘুরিয়ে সে তেড়ে এল, তুমি এসব বুঝবে কি? শেষ রাতই হোক আর শেষ দিনই হোক, আমায় যেতেই হবে। গার্ডদের পুরো কায়দায় টার্ন আউট করতেই হবে। শুধু সিপাহী নয়, সোয়ারদেরও দেখতে হবে। ঘোড়াই হচ্ছে ব্যাটারী কম্যাণ্ডারের প্রথম প্রেয়সী।

মেখলা বলে চলল, শ্যাম, তুমি জান না। কি গম্ভীর হয়ে উঠল ওর মুখ। সে বলল—মেয়েদের যৌবনের চেয়ে ঘোড়ার কণ্ডিশন বেশী দামী। তার চিকণ ত্বকের জেল্লা মেয়েদের ত্বকের কমনীয়তার চেয়ে বেশী সাধনার ধন। সংসারে সবচেয়ে বড় বিউটির প্রতিযোগিতা হচ্ছে সেরিমোনিয়্যাল প্যারেডে চামড়া আর পিতলের ঝলমলানির মধ্যে মাথা উঁচিয়ে থাকা চার্জারের দল।

তার পর—তার পর সে মুখ ঘুরিয়ে শুনিয়ে গেল—মাই মাউণ্ট ইজ মাই শেরী। আমার ঘোটকীই আমার প্রিয়া।

বলেই স্বামী আমার শূন্যে একটা চুমু ছুঁড়ে দিল।

—ওহ্ ওহ্ ভাবীজি, তোমাকে বাচ্চা মেয়ে পেয়ে ম্যানরদা একটি মোক্ষম লেগ পুল করে গেল। তুমি বুঝলে না সে কথা?

অভিমানিনীর মনের ব্যথা মুছিয়ে দেবার জন্য ভাবের আবেগে স্বয়ম্ মেখলাকে বৌদি বানিয়ে নিল।

কিন্তু বৌদি সীতার দেশের মেয়ে। স্বামীর সবটুকু তার চাই, সর্বস্ব, সব সুখদুঃখ। কিবা রাজপাটে কিবা বনবাসে।

ঘোড়াশালে অশ্বশালার সইস এবং অন্যান্যরা যা যত্ন-তদারক করে অভিজাত ঘোড়দৌড়ের বা ক্যাভালরির ঘোড়ার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। সায়ার সেনানী নিজে হাতে অশ্বকে দলাই-মলাই করে। স্পর্শনে আর ঘর্ষণে পেষণে আর পোষণে যেন ফুটে ওঠে প্রেমস্পর্শ। আর অশ্বও সে সবই বুঝতে পারে। শুধু হাতের তালুকে পেয়ালার মত করে নিয়ে চাপড়ে দেবার আদরটুকুও সে বুঝতে ভুল করে না।

সারাদিন কাজ শিক্ষা আর ব্যায়ামের পর সোয়ার যখন তার মুখে নিজের হাতে গাজর, গুড় কিংবা ঘাস গুঁজে দেয় কোন্ প্রেমিকের চুম্বনের চেয়ে কম প্রত্যাশিত সেই প্রেম?

মেখলাও তেমনি করে স্বামীর সব আদর যত্নই চায়।

মেখলা বলল, জান শ্যাম, শুধু এই নয়। বাইরের জগতে লোকে দেখে এদের পোশাকের বাহার। ভোরে প্যারেডের জন্য খাকি শার্ট আর ট্রাউজার্স, পি. টি-র জন্য সাদা শর্ট আর শার্ট, ডিনারের জন্য ডিনার জ্যাকেট, রাতের

ইনসপেকশনের জন্য ব্লু প্যাট্রল গাঢ় নীলের উপর লাল ডোরা। তার উপর ওয়েলিংটন আর তাতে সাঁটা ঝকমকে নিকেল প্লেটেড স্পারস্। আর টুপির বাহারই বা কম কি? সিঁদুরে নীলে মেশানো গ্লেনগেরী ক্যাপের উপর সোনালী ঝুলসী ঝালরের মত ঝলমল করছে।

কোন্ সুইট সেভেনটিন, কোন্ মিষ্টি সপ্তদশীর মন তা দেখে না গলে যাবে, ঢলে পড়বে? প্রশ্ন করে বসল মেখলা।

স্বয়ম্ ভাবল—এইবার পথে এস, ভাবীজী। এ যুগে বিবাহ হচ্ছে প্রেম আর প্রেম হচ্ছে অন্ধ। তাই বিয়ে হচ্ছে অন্ধদের প্রতিষ্ঠান।

তোমার চোখ তখন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল মিলিটারীর চটকে। এখন মনকে মজিয়ে রাখো তার পোশাকের বাহারে। আজ রাতে যখন তোমার স্বামী মেস কিটে সেজে নীল আর লাল রেশমের পাড় বসানো আঁটো জ্যাকেট পরে আর কালো প্রজাপতি মার্কা টাই কঠিন কলারের উপর বেঁধে লাল-নীল-সোনালী পোশাকআশাকে সেজে চরণে রূপোলী স্পারের লহরা তুলে নাচতে যাবে তখন তোমার মনকে তাতেই মজিয়ে রেখো।

মুখে অবশ্য সে কথা বললে না।

সে শুধু বলল, ভাবীজি, বাইরের সাজগোজ আর ডিউটিতে পুরোপুরি আত্ম-নিয়োগ এটা তো আমাদের জীবনের একটা 'মাস্ট'। উপকরণ দিয়েই হয় পূজার প্রথম পাঠ। শুধু মিলিটারী কেন, সিভিল জীবনেও তাই হওয়া উচিত। ইংরেজদের মধ্যে সেটি আছে বলেই ওরা এত বড় হয়েছে। ম্যানরদা যে প্রাণপণে ওদের বিদ্যাগুলো শিখছে, তার পিছনে জেনে রেখো তোমার কথাই প্রেরণা যোগাচ্ছে। আজ সে ক্যাপ্টেন, কাল সে কম্যাণ্ড পাবে। সবই তো তোমার জন্য।

মেখলা হেসে ফেলল প্রসন্ন হয়ে। জিজ্ঞেস করল, তুমি কি করে জানলে? বড় যে অভিজ্ঞ লোকের মত কথা কইছ।

—সবাই সংসারে বোকা হয় না; কিছু কিছু লোক থাকে চালাক। অবশ্যই তারা অবিবাহিত।

কথাটার প্রচ্ছন্ন ঠাট্টা বুঝতে পেরে মেখলা রাগে ঝলমল করে উঠল। অন্তত স্বয়মের চোখে এই ক্ষণে তাই মনে হলো।

—তা ঠিক বলেছ। নারী সম্বন্ধে অবিবাহিতরা বিবাহিতদের চেয়ে বেশীই বোধ হয় জানে। মেখলা বলল।

স্যালুট করার ভঙ্গিতে হাত তুলে স্বয়ম্ জবাব দিল, ভাবীজী, যে সমাজে আর যে মিলিটারী মহলে তাদের সেই অভিজ্ঞতা হয় সেখানে আমি নতুন ঢুকেছি। বলতে গেলে এখনো আমার পৈতে হয়নি। ম্যানরদা ভরসা দিয়ে বলেছে আমাকে শিগগিরই ব্যাচিলর অব আর্টস অর্থাৎ বি এ. বানিয়ে দেবে।

—অ্যাঁ, কি সর্বনাশ! তুমি বিয়ে করে বসবে?

—না না। আমাদের মেসে বলে—যে হরদম অনেক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেও কুমার রয়ে যাবার আর্ট জানে সে-ই হচ্ছে ব্যাচিলর অব আর্টস।

—দাঁড়াও, তোমাকে একজন ওস্তাদ এম.এ. অর্থাৎ মিস্ট্রেস অব আর্টসের গোলাগুলির রেঞ্জের মধ্যে তুলে ধরতে হবে। সেই হবে সমুচিত শিক্ষা। কিন্তু আশ্চর্য! কলকাতায় তোমায় এ পর্যন্ত কেউ চাঁদমারী করেনি?

স্বয়ম্ কলকাতার কথায় ফিরে যেতে চায় না। কলকাতা মানেই হাহাকার। কলকাতার বিষণ্ণ আকাশে স্বাতী নক্ষত্র দৃষ্টিপথে প্রায় আসেই না। সে কথা থাক।

মুখে সে বলল, জান ভাবীজী, আমার মানদণ্ডটা একটু অবিশ্বাস্য রকম ধোঁয়াটে। এখনো অভিজ্ঞতা হয়নি কিনা। কলকাতায় তেমন সুযোগ-সুবিধাই নেই অভিজ্ঞতা অর্জন করার।

স্বয়মের উত্তরটা ঠিক লক্ষ্যভেদ করল। ভাবীজী তাড়াতাড়ি সেই মানদণ্ডটা জানতে চাইলেন।

নিজের সঙ্গে যাচাই করে অবশ্যই দেখতে হবে। তরুণীদের নিঃসঙ্গতা আর বিষণ্ণতায় ভাল টনিক।

স্বয়ম্ বলল, কলকাতায় আমরা ভিন্‌দেশী সুন্দরীদের পোড়া চোখে দেখার বিশেষ সুযোগ পাই না। তবে সিনেমা পত্রিকা আর বিদেশী জার্নাল দেখে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। ওয়াই-এম-সি-এর কাফেতে বসে আমরা একবার স্টুডেন্টস ইণ্টারন্যাশন্যাল ঘোষণা করেছিলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বিদেশী পড়তে আসে। তারাই মুরুব্বি আর তাদের বিচার-বিবেচনাই ভরসা।

—আহা তোমাদের রায়ে কি দাঁড়াল তাই বল না। শুধু ভনিতা করে সময় নষ্ট করছ।

স্বয়ম্ মনে মনে হাসল। অন্তত ক্ষণিকের মানসিক শান্তিই বা কম কিসে? সংসারে তার দামই বা কি কম?

মেখলা দেবীর মনের মেঘ একটুক্ষণের জন্যও তো সরে গেছে।

সে বলল, আমরা সবাই ছিলাম ব্যাচিলর। অর্থাৎ নারী বিরাজ করে যাদের মনের মধ্যে, ঘাড়ের উপর নয়।

মেখলার কোপ কটাক্ষ দেখে স্বয়ম্ চকিতে কথা ঘুরিয়ে ফেলল। বলল, খুড়ি, ভাবের আবেগে জিব ফসকে কথাটুকু ভুল বলেছি। ঘাড় নয়, সংসার। স্ত্রীরা তো সংসারের উপরে সর্বময়ী কর্ত্রী।

হ্যাঁ। যা বলছিলাম। আমাদের রায় হলো যে তিলোত্তমা সুন্দরী নারীটি গায়ের রঙে হবে ইংরেজ, হাসিতে আইরিশ, চলনে স্প্যানিশ, গড়নে ফরাসী। তার নাক হবে গ্রীক, চুল হবে ইটালিয়ান, চোখ ইরাণী, চিবুক ও চরণ দুটি সুইডিশ। এমনি একটি ডিশ—আই মিন আমেরিকান অর্থে ডিশ—শাড়িতে সাজিয়ে দাও মার্কিন স্মার্টনেস দিয়ে। ব্যাস। এবার সারারাত স্বপ্ন দেখ আর দহন জ্বালায় জ্বলো।

চোখের ধনুকখানা টানটান করে মেখলা একখানা তীর হানল, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু তিলোত্তমার সঙ্গে প্রেম করবে কি করে? আর কি ভাষায়?

লাজুক হাসি এবার স্বয়মের মুখে ফুটে উঠল। অনেক কল্পনাশক্তি খরচ করে সে এই তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেছে মেখলার মন হালকা করে তোলার জন্য। আর কুলোচ্ছিল না।

সে শুধু হেসে বলল, আমরা সবে ডাঁসা পেয়ারা। আমরা রায় দিলাম যে প্রেম হচ্ছে ভাষার অতীত আর জাত বা দেশের সীমানা মানে না। কি করে প্রেম করতে হয় সে সম্বন্ধে আমরা ভোট নিইনি। বিষয়টা বড় জটিল বলে।

অবশ্য এক আমেরিকান্ ছাত্র কোনারক আর খাজুরাহোর শিল্পকলা থেকে অনেক কিছু শিখে নিয়েছিল। সে আপত্তি তুলে বলেছিল যে বিষয়টি নাকি বড়ই সরল। শিখবার দরকারই হয় না।

—তুমিও আজকাল সরল মনে কর নাকি?

হাতজোড় করে স্বয়ম্ বলল, আমার মনে করাকরির জন্য মিলিটারি জীবনে কিছু যায় আসে না। আমি শুধু জানি যে একবার ট্রেনিংয়ের সময় একটা সুইট অব রুমস দিয়ে কর্তারা বলেছিল যে আমায় নিজে চরে খেতে হবে। ব্যাচিলরদেরও এরকম শিক্ষা হওয়া দরকার।

আমি দেখলাম যে তার মানে হচ্ছে বেশ মজাসে টিন আর কার্টন কেটে জুতসই ব্রেকফাস্ট, চলনসই রকম ডিনার আর সন্ন্যাসে পাঠাবার মত সাপার। মিলিটারী মেসের দিকে অন্ধকারে জুলজুল করে তাকিয়ে থেকে কোন লাভ হতো না।

ট্রেনিং কিনা!

১৮

মেখলারও ট্রেনিং হলো সেই রাতেই।

অন্যান্য ভারতীয় অফিসারদের স্ত্রীদের হাতে খড়ি এর আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। মিলিটারীতে দেশী অফিসারের সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা তের। ম্যানর সেই ভাগ্যবান তের শতাংশের মধ্যে পড়ে। কাজেই তার পদের মর্যাদা আর জৌলুষ যুদ্ধের কল্যাণে যারা নতুন আসছে তাদের চেয়ে অনেক বেশী।

স্বাভাবিকভাবেই সে এই ঝলমলে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে তার সময় আর সুযোগ দুই-ই ছিল যথেষ্ট।

কিন্তু বেচারী মেখলার মাত্র সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। এই জগতে মিশে যাবার সে সুবিধা পায়নি। আজ তার হাতে খড়ি হবে প্রথম মেস নাইটে ককটেল পার্টিতে।

স্বয়ম্ সঙ্গে থাকায় যে এই দীক্ষার ব্যাপারে সুবিধা হবে তা মনোহর হিসাব করে নিয়েছিল। শান্ত গভীর প্রকৃতির নতুন রিক্রুট জুনিয়ার অফিসার মেখলার আনাড়ি ভাবকে ঢেকে চলবে। ঠাট্টা করে বা অনুকম্পার দৃষ্টিতে ছোট করবে না।

হায়! এই মেস কি সেই ছকু খানসামা লেনের মেস নাকি?

কোন বাঙালী সাহিত্যিক প্রথম যুগে ব্রিটিশ মিলিটারী মেসের বর্ণনা শুনেই হয়তো রসিকতা করে চালচুলোহীন আমাদের পাইকারী খাওয়া থাকার আস্তানাগুলির নাম দিয়েছিল মেস। সে সম্বন্ধে গবেষণা করার সময় স্বয়ম্ পায়নি।

সে শুধু আশ্চর্য হয়েছিল এই দেখে যে যে সামান্য মাইনেতে সামরিক জীবন সে শুরু করেছে তাতে এই ভদ্র পরিচ্ছন্ন আর সাজানো গোছানো আস্তানা অসামরিক জীবনে কল্পনাও করা যায় না। যে টাকা তাকে দিতে হচ্ছে তার বিনিময়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে বা মধ্য কলকাতায় কি ঘর আর কি খাবার পাওয়া সম্ভব তা মনে করতেও ওর সংকোচ এসেছিল।

সে হিসাব করে দেখেছিল যে সরকারী অনুদানে কেনা ক্রোকারি আর কাটলারি আর বাসিন্দাদের দানে সাজানো হরিণের শিং বাঘের ছাল প্রভৃতি ট্রফি বাদ দিলেও মিলিটারী মেসে অল্প পয়সায় যা পাওয়া যায় তা কল্পনা করা যায় না। সুব্যবস্থাই সস্তার কারণ।

মেস তো মেস নয়। একেবারে যাকে বলে হোম। মেসের বাংলোর চারপাশে অবিবাহিত অফিসারদের কোয়ার্টার্স। হয়তো জনা পঁচিশ-ত্রিশ অফিসার—প্রায় সবাই জুনিয়র অবস্থায় মেসে নিয়মিত খেতে আসে। বিবাহিতরা বাইরে বাংলো পেয়ে যায় অল্পদিন অপেক্ষার পরেই।

সপ্তাহে দিন চারেক ডিনার নাইট আর একদিন অতিথির রাত। সে সব ডিনার তো শুধু খানাপিনা নয়। যাকে বলে একেবারে প্যারেড।

আর অবিবাহিত দিনগুলিতে মেসে বাসের যে আনন্দ ছিল তা স্মরণ করে বিবাহিত অফিসাররাও দীর্ঘশ্বাস ফেলে। শুধু বেপরোয়া মুখ ছোটানো বা বোতলের কর্ক ফাটানো নয়। নির্ভেজাল চিন্তাহীন রসাল রঙীন মহূর্তগুলির জন্যই সেই দীর্ঘশ্বাস। ওরা কতবার যে স্ত্রীদেব বলে ফেলেছে যে মেসকে মিস করছে তার আর হিসাব নেই।

স্বভাবতই মিলিটারী স্ত্রীবা মেসকে সতীন মনে কবে।

মেখলাও করেছিল।

সন্ধ্যাবেলা তৈরী হতে যাবার জন্য উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ স্বয়মকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা তুমি তো ব্যাচিলার, তুমিই বল বৌয়ের চেয়ে মেস কেন তোমাদের চোখে বড় ?

সাবধানে স্বয়ম্ উত্তর দিল, খুব স্বাভাবিক। যখন যুদ্ধ থাকে না তখনো নন-ফ্যামিলি এরিয়াতে বদলী হলে তোমরা আমাদের ত্যাগ কর। কিন্তু তোমাদের দেশের সীতার মত মেস আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে। অপেক্ষা করে বনে, পাহাড়ে, দুশমনে ঘেরা ঘাঁটিতে।

—কিন্তু ফ্যামিলি স্টেশনেও তো তোমরা মেসে ছোটার জন্য ব্যাকুল।

—সে কথা ঠিক। একসঙ্গে গড়ে পিটে রাতদিন না কাটালে যুদ্ধের সময় ঠিকমত বোঝাবুঝি হবে কি করে? একসঙ্গে লড়ব আর মরব কি করে ?

—তবু তো তোমরা হামেশা স্ট্যাগ পার্টি কর। শুধু পুরুষদের পার্টি।

—করি। কারণ মহিলারা সঙ্গে থাকলে আমাদের হয় সব চেয়ে ভাল, না

হয় সবচেয়ে খারাপ 'নটি' সাজতে হয়। তখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক সহজ রূপে থাকি না।

একটা স্যালুট করে স্বয়ম্ বলল, আচ্ছা, এখন যাই, ভাবিজী। আমাদের হরিণীহীন স্ট্যাগ পার্টির মেয়াদ মাত্র দেড় ঘণ্টা। ততক্ষণ। সো লং।

সেই দেড় ঘণ্টায় যা হাসি হৈহৈ আর হুল্লোড় হলো তা যেন সঞ্জীবনী সুরা।

মিলিটারী আড্ডা, অশালীন গালি আর ঠাট্টার ব্যবহার আর চড়া মদ এই তিনটে বাইরে থেকে স্বয়মের চোখে ত্রিবেণী সঙ্গমের মত মনে হতো।

এখন ওর মত কিছু কিছু বদলেছে। এখন সে মনে করে অসীম ক্লান্ত মুহূর্তে অনন্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে শুধু একটি পানপাত্রে যদি এক বিন্দু প্রাণ ফিরিয়ে পাওয়া যায় তাতে কারো কোন ক্ষতি বা কিছু ক্ষয় হয় না।

একবার তার মনে পড়ল মাইকের কথা। স্কুল অব ইকনমিকসের ছাত্র ছিল যখন তখন সে সম্ভবত পান করতই না। এখন যুদ্ধ বিভাগে যোগ দিয়ে সে যেটুকু পান করে তাতে তার অকল্যাণ হয়নি। মনে পড়ল যে সে নিজেই প্রথম পরিচয়ের সন্ধ্যায় রামায়ণে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে সৈন্যদের সুরা দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের উদাহরণ দেখিয়েছিল।

কিন্তু মেস নাইটে স্ট্যাগ পার্টিতে সে যে সুরাস্রোত বইতে দেখল তাকে সে সমর্থন করতে পারল না। মন ব্যথিত হয়ে উঠল। বিশেষ করে এজন্য যে একটু পরেই মহিলারা যোগ দেবেন।

অবশ্য তাদের মধ্যে ভারতীয়রাও কেউ কেউ বেশীই পান করবেন। তাই তার অপ্রসন্নতা বেড়েই গেল।

পিছন থেকে কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিল একজন মেজর ইংরেজ। তাড়াতাড়ি সে সম্মান দেখাল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা হাসি হানল ইংরেজটি—কি? মনে তোমার কিসের বোঝা, শ্যাম? প্রেমে পড়েছ? না, কোন মেয়ে তোমায় শিকারের জন্য তেড়ে আসছে? বল দেখি বাছা? আই হ্যাভ গট দি মেডিসিন।

হেসে শ্যাম তার তখনো প্রায়-অস্পৃষ্ট শেরীর গ্লাসটা তুলে ধরল। ছোটদের গল্পের শিয়ালের মত এই একটি গ্লাসই সে সারা সন্ধ্যা দেখাবে।

—সাবাস! তুমি ঠিক তরে যাবে। তবে জেনে রেখো যে বেশীর ভাগ পুরুষই নারী সম্বন্ধে সব জানে, কিন্তু স্ত্রী সম্বন্ধে একেবারে কিসসু না। অতএব সাধু সাবধান।

নারী আর স্ত্রীর মধ্যেকার সূক্ষ্ম তফাৎটা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে মেজর তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলল।

পাশ থেকে ক্লিক করে বুটের আওয়াজ তুলে যোগ দিল আরেকজন ইংরেজ অফিসার।

সে বলল, তবে জেরীদের এ সম্বন্ধে যা অভিজ্ঞতা আছে তা আমাদের নেই। ডানকার্কে সমুদ্রতীরে বন্দী থাকার সময় শিখে নিয়েছি যে হুনরা ওদের হুরীদের কি চোখে দেখে। ওরা বলে নারী হচ্ছে পেঁয়াজ। জীবনে ঝাঁজ মেশাবার জন্য। তা ছাড়া আর কিছু নয়।

এই পর্যন্ত বলে সে একবার চারদিকে তার নজর ছড়িয়ে দিল। সহৃদয় হুরী না শত্রুপক্ষের হুন কাদের সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার হদিশ নেই।

শেষ পর্যন্ত সে গ্লাসটি প্রেমসে মুখের, মানে ঠোঁটের সামনে তুলে ধরে রসিয়ে আবৃত্তি করল :—

"নারী হচ্ছে শুধুই পিঁয়াজ ;
শোভন সুঠাম তার সাজ।
খোল তার আবরণখানি,
নেই হিয়া, নেই দয়া ;
কাঁদো হেরি' কঠিন পরাণী।"

* * *

আমি বন্দীশিবির থেকে খালি হাতে পালিয়ে এসেছি বটে, কিন্তু এই অমূল্য শিক্ষাটি সঙ্গে নিয়ে। খোদ হিটলারের খাস দাওয়াই।

ততক্ষণে মিলিটারীদের স্ত্রীরা আর নিমন্ত্রিত কয়েকজন ওয়াক-আই,—যুদ্ধের আনুষঙ্গিক গোপন কাজের জন্য বিলেত থেকে সদ্য আমদানী ইংরেজ তরুণী এসে পৌঁছেছে। কাজ আর মজা দুই-ই হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলে ওদের উপস্থিতিতে। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

সে কি দৃশ্য। সোনালী বা মধু রঙের তারার আকারের বাতি। বিরাট হলটা আর তার পাশের কামরাগুলি মোলায়েম মখমলের পর্দায় সাজানো। হরিণের শিংওলা মাথা, বাইসন আর হাতীর দাঁত, পুরনো বন্দুক আর ঝকঝকে নতুন স্পোর্টস কাপ সুন্দর রুচিসম্মতভাবে সাজানো।

ইস্পাতের মত কঠিন যাদের কাজ ফুলের মত কমনীয় তাদের সঙ্গিনীরা। আর বাসরের আতিশয্য না থাকলেও ফুলের ঘটা কি আর ফুলদানীগুলির ছটাই বা কি।

অপ্সরাদের পরার যোগ্য ইভনিং গাউন আর শাড়ি, ভারতীয় মহিলাদের ঝলমলে সোনা মুক্তো হীরের গহনা, বিদেশিনীর অঙ্গে মুক্তো না হয় কসটিউম জুয়েলারী।

আর পারফিউম? সুরভিসার? এই যুদ্ধের বাজারেও শ্যানেল নম্বর তিনের উন্মাদনায় পরাণ অরুণবরণী।

স্বয়মের উপর গোপনে ভার দেওয়া হয়েছিল মেখলাকে চালিয়ে নেবার। নতুন প্রমোশন পাওয়া ক্যাপ্টেন স্বামী ব্রিটিশ ট্র্যাডিশন অনুসারে পায়ের ওয়েলিংটন বুট থেকে স্পার্স্ খুলে নিয়ে ব্রিটিশ মেজরের স্ত্রীর সঙ্গে তদ্গতচিত্ত হয়ে নাচছে। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট হয় যে। কাজেই নিজের স্ত্রী অন্যের হেপাজতে। বিলেতী এটিকেটও তাই-ই বলে।

ওয়েটারদের বকের পালকের মত শাদা পোশাকে বুকের উপর সোনালী লাল মনোগ্রাম, কুলা পাগড়ীতে সোনালী এবং সিঁদুরে রঙের পাড় আর ঝালর ঝলমল করছে। তারা ট্রেতে করে ড্রিঙ্কস, ঈটস পানীয় আর চুটকী খাবার নিয়ে শাদা দস্তানা পরা হাতে সসম্ভ্রমে পরিবেশন করে যাচ্ছে।

বিলেতী মেমরা খাবারের চেয়ে পানীয়ের দিকেই বেশী মন দিচ্ছে। দেবে না-ই বা কেন? মেখলা দেখল যে ওদের হাতে কি সব চমৎকার রঙের পানীয়ের কাট গ্লাসের ছোট পাত্র। তার মধ্যে ভাসছে চেরী।

চেরী? অর্থাৎ কি না শেরী?

'মাই মাউণ্ট ইজ মাই শেরী' ঘোষণা করেছিল মনোহর। মেখলার মন আনচান করে উঠল। ছোট্ট বিস্কুটের উপর সাজানো সুডোল এ ..া ডিমসেদ্ধর টুকরো নিয়ে দাঁতে খুঁটতে খুঁটতে সে মনোহরের দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকাতে লাগল।

কিন্তু বিলেতী পার্টিতে স্বামীই না কি পরপুরুষ। দূরে সরে থাকবে।

জার্মানদের বন্দীশিবির থেকে যে বীরপুরুষ পালাতে পারে, ত্রস্ত ভীরু হরিণী মেখলার চাহনি কি তার নজর এড়াতে পারে?

সে টুক করে এগিয়ে এসে স্বয়ম্‌কে বলল, যাও না শ্যাম, কর্নেলের ঘরণীর গ্লাসটা শুকনো শুকনো মনে হচ্ছে। তুমি নতুন অতিথি। তুমি সেটা আরো সুরা দিয়ে চার্জ করে দিলে আমাদেরই মান বাড়বে।

অভিজ্ঞ সিনিয়রের অনুরোধ রক্ষা করতে হয়।

শুধু ভদ্রতা নয়, ডিসিপ্লিনও বটে।

ততক্ষণে প্রাক্তন বন্দী খোলা মাঠ পেয়ে গেছে। মেখলাকে খুব আপনজনের মত অন্তরঙ্গভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি পান করবেন?

আনকোরা সাহেবের মুখের অনুরোধে সলজ্জ হয়ে মেখলা নিম্বু পানি চেয়ে বসল।

অবশ্য অবশ্য। আমি একটি স্পেশ্যাল নিম্বু পানি শুধু আপনারই জন্য বানিয়ে নিয়ে আসছি।

সাহেবের সদাশয় ভালমানুষিতে মুগ্ধ হবারই কথা। মেখলার রঙীন ওষ্ঠাধরে হাসি খেলে গেল। সে নিজেকে বেশ যাকে বলে ইমপরট্যাণ্ট তাই বোধ করল।

স্বামী তো কদর বুঝছে না। এখন দেখ, রাজার জাত রাজপুরুষ কেমন খাতির করছে।

লেবুটা বোধহয় একটু বেশী টেপা হয়েছিল। অথবা বোধহয় কোন খারাপ গাছের লেবু হবে। কেমন একটু তেতো-তেতো লাগল। কিন্তু যে কষ্ট করে আদর দেখিয়ে এনে দিয়েছে তার মর্যাদা রাখতে হবে তো?

সে ঢক করে এক চুমুকেই গেলাস শেষ করে ফেলে সম্মান রাখল। তারপর একটু আলাপ প্রলাপ।

খুব প্রসন্ন হাসি হেসে বন্দী বলল, আমি যে খুব নিকট অতীতে জার্মানদের হাতে বন্দী ছিলাম তা আপনাকে বলেছি। এখন আমি আপনার মধুর ব্যবহারের হাতে বন্দী। আসুন না একটু নেচে সেই বন্ধনদশাকে সার্থক করে তুলি।

বন্দী তো একটি বাহু বাড়িয়ে দিল। অন্য বাহুটি জড়িয়ে ধরার প্রতীক্ষায়। একেবারে ফিলড রেজিমেণ্টের বেগবান ঘোড়ার মত তড়বড় করে উঠছে।

দূর থেকে মনোহর দেখতে পেলো।

দেখতে পেলো স্বয়ম্ও।

মনোহরের আশা হলো লজ্জাবতী লতা নিজের মধ্যে সংকুচিত হয়ে যাবে। মেখলা তো নাচ জানেই না।

স্বয়মের মনে হলো একটি বেতসী লতা আধুনিকতার বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠতে চাইছে। কিন্তু তার উপর যে ভার আছে সেই ঝাপটা হাওয়ার সঙ্গে ভাবিজীকে মানিয়ে নেওয়ার। উড়তে দেওয়ার নয়।

কিন্তু এক চুমুকে পান করে নিলে নেশাটা যে হয় বড্ড ভারী আর তাড়াতাড়ি।

স্বয়ম্ চট করে পাশে এসে দাঁড়াল।

হেসে বলল, মিসেস হীটনের কাছে যেতেই উনি জানতে চাইলেন এই নবীনা নবাগতাটি কে? আমায় বললেন এখুনি ওঁর কাছে নিয়ে যেতে। আমি এঁকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আগে। ততক্ষণ অপেক্ষা করো।

চাতুরীটা বুঝতে বাকী রইল না।

ছোকরাকে কর্নেলের ঘরণীর কাছে পাঠানোর মতলবটার জন্য বন্দী মনে মনে নিজেকেই শাপান্ত করল। কে জানত মিসেস হীটনের দোহাই দিয়ে মিসেস শর্মাকে সরিয়ে নেওয়া হবে।

এঃ! একেবারে হীরে দিয়ে হীরে কাটা!

তবে এ-আকাশে তারকার অভাব নেই তো। বন্দী অন্য তারকার বন্দনা করতে এগিয়ে গেল।

স্বয়ম্ অবশ্য শেষ রক্ষা ঠিক করতে পারল না। তরতাজা টাটকা ফুল দেখলে মধুমত্ত অলির দল ঘিরে আসবেই। এবং জুঁই ফুল যেন রঙহীন জিনের সুরা সিঞ্চনে সহসা রঙীন হয়ে উঠেছে। আরো মোহময়।

মক্ষিরানী।

তার চারদিকে মধ্যযুগের বীরবেশী ঝকমকে নাইটের দল মধুচক্র রচনা করল। ইউনিভার্সিটির শিক্ষায় মুক্ত মন আর মিষ্ট রসনা নিজের চারদিকে ভক্তের ভিড় তৈরী করল। খুব সহজে। সাবলীল ভাবে।

সেই ভিড়ের ওপার থেকে মনোহর বার বার মেখলার দিকে তাকাতে থাকল। তার প্রতিদিনের সংসারে হারিয়ে যাওয়া মেখলা, ও গৃহের নানা সাজসজ্জা সরঞ্জামের মধ্যে শুধু একটি সচলা সজ্জিতা মূর্তি মেখলা—সে তো এ নয়, এ নয়। এ হচ্ছে অন্য কেহ, অন্য কোন খান থেকে আবির্ভূতা জীবন্ত প্রতিমা।

বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।

কিন্তু শুধুই কি বিস্ময়?

বিষভরা জ্বালাও কি নেই তার সঙ্গে মিশিয়ে? আমার ঘরণী অন্যদের পরাণ করে তুলছে অরুণ-বরণী। আর তার উৎস, তার প্রেরণা যা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে থাকার কথা, ইচ্ছামত সাধ অনুসারে অহরহ উপভোগ করার কথা—সেই প্রাণধারা সেই আনন্দস্রোতের পারেই বসে আছি। অথচ পান করি না। পিপাসা থাকি ভুলে।

স্বয়ম্ নীরবে এক কোণে দাঁড়িয়ে বার বার দু'জনকে দেখতে লাগল।

মেখলা একটু মাত্র সুরার আগুনে জ্যোতির্ময়ী হয়ে জ্বলে উঠেছে। মনোহর একটুখানি সংসারের আলায় সেই জ্যোতিকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। আমারি বঁধুয়া ··। আন বাড়ি·যায়···· ?

জেলাসী কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ এই মুহূর্তে স্বয়ম্ খুঁজে পেল না।

কিন্তু গভীর রাতে ফেরার সময় ওদের ওলডস্‌মোবিল গাড়ির পিছনের সীটে একা বসে সে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে সামনে দেখল যে মনোহর আর মেখলা পরস্পরকে খুঁজে পেয়েছে।

এক টুকরো চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়েছে আর সমস্ত আকাশকে তার সঙ্গে নিজের পানে নামিয়ে আনছে।

স্বয়মের চোখ স্বাতীর স্বপ্নে মুদে গেল।

১৯

আহা! তরুণীর চাঁপার কলির মত নরম আঙুলগুলি বার বার ঠোঁটে তুলে নিচ্ছি যেন।

বলেই আকাশের দিকে একটা চুমু প্রেমসে ছুঁড়ে দিলেন এই রসিক পুরুষ।

তাই তোমাদের মনে হয় নাকি অ্যাসপারাগাস চুষবার সময়? ক্রীমের চেয়ে নরম, মাখনের চেয়ে মোলায়েম। মুখে তুললেই তোমার হয়ে গেল। অ্যাসপারাগাস তোমরা পাবে—প্লেনটি অব দেম। চারদিকে ছড়ানো।

মারমুখী এক প্যারট্রুপ ট্রেনার ওদের প্যারাসুট ঝম্পের কলাকৌশলের ক্লাস নিচ্ছিলেন।

৮২ নম্বর ট্রুপার দলের নেতা হিসাবে তিনি সিসিলি দ্বীপে প্যারা-ঝাঁপের মধ্যে ছিলেন। আর সেখানে জার্মান ও ইটালিয়ান সৈন্যদল অ্যাক অ্যাক থেকে আরম্ভ করে অ্যাসপারাগাস পর্যন্ত সবকিছু দিয়েই ওদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা রেখেছিল।

এসো, মাই ডিয়ার বয়েজ, দুশমন তোমাদের অ্যাসপারাগাস দিয়ে আপ্যায়ন করবে এই আশা করে অভিযানে এসো।

আহা, টিনে ভর্তি নধরকান্তি ননীর মত কোমল সুখাদ্য। সবুজাভ সাদা সবজি।

একটা মারাত্মক রকম অশ্লীল দিব্যি দিয়ে শিক্ষক জানালেন যে, ইংরেজী কবিতায় আছে যে, বেহেস্তে হুরী আর পরীরা এই সুস্বাদু বস্তুটি খেয়ে থাকে। ঠোঁটের মধ্যে দিতে না দিতে মিলিয়ে যায়।

তারপর আবার একটা অশ্লীল খিস্তি।

আহা, তোমরাও ওই নধর কোমল পরশের সঙ্গে সঙ্গেই সপ্রেম শিহরণে হুরীদের উদ্দেশে উবে যাবে। স্বর্গের লীলাভূমিতে তাদের সঙ্গে কেলি করতে চলে যাবে।

শুধু, সীমান্ত কেন, জাপানীদের দখলী এলাকার সামনে-পিছনে পাহাড় জলা আর জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে যেখানেই কিছু খালি জমি আছে, সেখানেই মিত্র-

শত্রুর প্যারাট্রুপারের দল বা গ্লাইডারে বয়ে আনা সৈন্যদল নেমে পড়তে পারে। সেখানে কেন এহেন খানার ব্যবস্থা ?

এমনিতেই জাপানী সেনাদল অনেক বেশী এগিয়ে এসেছে। যোগাযোগ রাখাই কঠিন। পিছনের দলগুলি সহজে বা তাড়াতাড়ি জানতে পারে না যে আগুয়ান দল কি করছে। তার উপর রসদ বা অস্ত্রশস্ত্র কোন কিছুরই যোগান সহজ নয় এই রকম রণভূমিতে। কাজেই শত্রুরা প্যারাট্রুপ বা সৈন্যদল আকাশ থেকে পিছনে নামিয়ে দিলে জাপানী দুশমনের দল বাঁতাকলে পড়বে।

কাজেই অবাঞ্ছিত অতিথির সরেজমিনে সৎকারের ব্যবস্থা হচ্ছে অ্যাসপারাগাস।

ফাঁকা ডাঙা জমি বর্মা আরাকান সীমান্তে তেমন কিছু বিশেষ নেই। যেখানে আছে সেখানেই বসানো হচ্ছে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি। জঙ্গলে গাছের অভাব নেই। কাজেই গুঁড়ি বানানো সহজ। কিন্তু লোহার শিক বা ডাণ্ডার মত গাছের গুঁড়ি ততটা সুবিধের নয়।

কারণ, প্রত্যেক অ্যাসপারাগাসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বুবি ট্র্যাপ। আর প্রত্যেক খুঁটির সঙ্গে পাশের খুঁটি তারে জড়ানো। জেনারেল লোহার খুঁটি বসাতে আর তাতে বিজলীর প্রবাহ চালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। 'অন্তত হামলার মুহূর্তে।

কিন্তু কোথায় বা লোহা আর কোথায় বিজলী। শুধু কাঁটা তার যে আছে তা-ই যথেষ্ট। তবে জরুরী হলে ডায়নামো চালিয়ে বিজলীর বন্দোবস্ত করতে হবে। ভোল্টেজ বাড়ানোর ব্যবস্থা করবার যন্ত্রপাতিও আছে। কেবল ডাঙাভোজের মধ্যে গাছের গুঁড়ির খুঁটি বিজলী প্রবাহের শক সামলে নিতে পারে। একটি বড় অসুবিধের ভয় হচ্ছে সেটা।

সেজন্যই তারের সঙ্গে মাইন অথবা শেলের সংযোগ আছে।

এতটুকু ছোঁয়া লাগে যদি, তাহলে এতটুকু কাল গুণতে আর হবে না। একেবারে পরকালের ওপারে পৌঁছে দেবে অ্যাসপারাগাস। যমের মুখের ওপারে। এই হচ্ছে অ্যাসপারাগাস।

প্যারাট্রুপদের তালিম দেবার সময় সেই শিক্ষক নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। শুধু হাতে-কলমে শিক্ষাই যথেষ্ট নয় এই বাহিনীতে। মানসিক দীক্ষা আরো বেশী জরুরী।

আমাদের ছিল দুটো প্রধান লক্ষ্য। আমরাই ছিলাম আগুয়ান বাহিনী, পথ দেখানিয়া।

ঠিক জায়গাতে নেমে প্রথমেই সেখানে আমাদের শত্রুপক্ষের যে যেখানে ঘাপটি মেরে আছে তাদের সাবাড় করতে হবে। শুধু খেদালে হবে না। কারণ তাহলে ওরা সব দিকে সঙ্কেত জানানী দিয়ে দল ভারী করবে। সবাইকে হুঁশিয়ার করবে।

তার আগেই ওদের সাবডাতে হবে। এবং তার পরই আমাদের পরে যে সব গ্লাইডারের ঝাঁক আসবে তাদের জন্য ফাঁকা জায়গা খোলা রাখতে হবে। যেন না থাকে কোন বাধা, কোন বিপদ।

গ্লাইডাররা নীচে নেমে হাতিয়ার সামলে দুশমনকে মোকাবিলা করতে তৈরী না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জিম্মাদারী। খোলা মাঠ হচ্ছে আমাদের জমিদাবী।

কিন্তু সেই জমিদারী আগে তো নিজের দখলে আসুক।

আপনি শুতে জায়গা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।

নিজেই সেই এলাকায় আগে কখনো নামিনি। কেমন এলাকা তারও ঠিক-ঠিকানা নেই। অথচ আমার মিশন হচ্ছে যে গ্লাইডারদের নামবার জন্য জায়গা সরেজমিনে ঠিক করতে হবে। শত্রু বাধা দিতে এলে তাকে ঠেকাতে হবে। ঠুকতে হবে। হঠাতে হবে।

তার জন্য শুধু হালকা হাতিয়ার সম্বল। কারণ শুধু তো হাতিয়ার নয়, নানারকম গুলি, বোমা, আলো ফেলে সঙ্কেত জানাবার যন্ত্র এ· কিছু র‍্যাশন—এসবও সঙ্গে নিয়ে নামতে হবে।

আকাশের খুব বেশী উপরের স্তর থেকে প্যারাটুপার নামিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

মাটিতে কোথায় নামাবে সেটা কিছু আন্দাজ করে দেখা দরকার এবং বেশী উপর থেকে ঝাঁপ দিলে হাওয়ার টানে টানে কোথায় গিয়ে নামবে তারও ঠিক থাকবে না।

বিশেষ করে সকাল-সাঁঝের আলো-**ধারি বা মেঘলা বাদলার ঘোমটার মধ্য দিয়ে আকাশ থেকে উঁকি মারতে যদি হয় তাহলে অনিশ্চয়তা আরো বেড়ে যায়।

আমি তখন সামান্য একজন প্রাইভেট।

স্বয়মের দল আর সহকর্মীরা গুরুর বক্তৃতা শুনতে শুনতে কিন্তু ভাবছিল যে গুরু শুধু প্রাইভেট হলে কি হবে, তার বর্ণনার তোড় যে কোন পাবলিককে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাক্টের কল্যাণে হাজার হাজার ছাত্র, মাস্টার, রিসার্চ ওয়ার্কার পণ্ডিত সব সেনাদলে নাম লিখিয়েছিল। আইনের ভয়ে নয়। যুদ্ধ থেকে ফিরে বেঁচে বর্তে এলে বেসামরিক জীবনে অর্থাৎ 'সিভি স্ট্রীট'-এ যে সব আখের রক্ষা করবার ব্যবস্থা আছে তার ভরসাতেও নয়। নিছক দেশের টানে, মনের টানে। সমস্ত মানবজাতিকে স্বৈরাচরের হাত থেকে, একনায়কত্বের হাত থেকে সঙ্গে সঙ্গে বাঁচানো যাবে এই বিশ্বাসে।

কাজেই গুরুও নিশ্চয়ই সাধারণ প্রাইভেট হবার আগে বিশেষ কোন পণ্ডিত ছিল। শিক্ষার্থীর দল মনে মনে সেইরকম সিদ্ধান্ত করেছিল।

না হলে কি আর এমন মন-মাতানো, প্রাণ-জাগানো ভাবে শিক্ষা দিতে পারে?

অথবা এমন করে শিক্ষিত ভারতীয় যুবকদের বিদেশী রাজের হয়ে আরেক বিদেশী শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করতে পারে? যার ফলে নিজের দেশের পরাধীনতা হয়তো আরো বেশী পাকা, না হয় আরো বেশী দীর্ঘ হয়ে উঠতে পারে, এমন একটা যুদ্ধের জন্য মাতিয়ে তুলতে পারে?

কিন্তু ওদের এত সব কথা ভাববার সুযোগ তখন গুরুজী মোটেই দেননি। তার সাকরেদদের অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু শেখাতে হবে।

আর এইসব শিক্ষিত বাঙালী তরুণদের হাতে-কলমে গড়ে পিটে নেবার সময় ভাবতে বা তর্ক তুলতে অবকাশ দিলে চলবে না।

আর্মির সিক্রেট সার্কুলার আছে যে, এয়ার ফোর্সে বাঙালী তরুণের মত টিচেবল শিখিয়ে নেবার মত মাল আর নেই। এরা যেমন চালাক তেমনি চৌকস। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি বেপরোয়া। নো ফাইনার স্টীল ইজ প্রডিয়ুসড ইন ইণ্ডিয়া। ইউ হ্যাভ ওনলি টু টেম্পার ইট দি রাইট ওয়ে। ভারতবর্ষে এর চেয়ে ভাল ইস্পাত জন্মায় না। শুধু একে ঠিকভাবে শান দেওয়া দরকার।

সেইসব শান পালিশ দেওয়া ঝকঝকে ইস্পাতের ফলা হচ্ছে এই এয়ারফোর্সের ১নং বাঙালী প্যারাট্রুপারের দল। ওরা শিক্ষককে আদর করে নাম দিয়েছে গুরু। আগ্রহ করে নিয়েছে তালিম।

গুরু বলে চলেছে—আমি তখন সামান্য একজন প্রাইভেট। আমরা প্যারাটুপার দলের সবাই তাই। আর আমরা আগুয়ান দল বলে আমাদের নাম পাথ ফাইণ্ডার। পথ দেখানিয়া। আমাদের দায়িত্বই সব চেয়ে বেশী।

আমরা যদি ঠিক সময়ে আর ঠিক জায়গায় পিছনের প্যারাটুপার আর গ্লাইডারে বয়ে আনা সৈন্যদের নামিয়ে আনতে না পারি, তাহলে সবটা অভিযানই ব্যর্থ হয়ে যাবে। চুপিসাড়ে আর তাড়াতাড়ি সব হাসিল করতে হবে। দুশমন টের পাবার আগে দলের সবাইকে নেমে পড়তে হবে। হাতিয়ার নিয়ে তৈরী হতে হবে।

না হলে নিজেদেরই বাঁচাতে পারব না।

ঘাঁটি আগলানো তো পরের কথা। ঘাঁটি তৈরী তো প্রথমে করতে হবে। এবং সেই মোক্ষম সময়টুকু পারত পক্ষে শত্রুকে ঘাঁটানো শাস্ত্রের বারণ।

সবাইকে তাক লাগিয়ে পিছন থেকে বাঙালী একজন শিক্ষানবীশ বলে উঠল, অর্থাৎ সে সময়টা শত্রুর সঙ্গে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্বন্ধ।

কিন্তু কেউ সে ঠাট্টাটা কানেও তুলল না আজ। কয়েকদিনের মধ্যেই আগুয়ান এলাকায় যেতে হবে।

কবে? কোথায়?

কেউ তা জানে না। শুধু জানে যে যেতে হবে বিনা প্রশ্নে, বিনা উত্তরের প্রত্যাশায়।

সামরিক জীবনে এর চেয়ে বড় কথা কিছু নেই। দলপতির আদেশ হচ্ছে বেদ বাক্য। কোন প্রশ্ন নেই। থাকবে না কোন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব কোন বাধা, ব্যতিক্রম।

তেলে জলে মানুষ, রঙ্গ ও কলরোলে অভ্যস্ত মানুষ, এই বাঙালীদের জীবনে একেবারে নতুন স্বাদ, নতুন আমেজ। অতীত জীবনটা যেন একটা পুরানো বইয়ের ওলটানো পাতা। ভুলে যাওয়া, ফেলে আসা রাস্তা।

অসীম আগ্রহে এরা গুরুর কথাগুলি শুনতে লাগল।

লিস্‌ন ওল্ড বয়েজ, তোমরা একটা সত্য ঘটনা শোন। আমারই দলের কথা। কিন্তু এ শিক্ষাটা ইয়োরোপের সিসিলি আর বর্মার শোয়েবো সব জায়গাতেই সমানভাবে মনে রাখতে হবে।

দরকার না হওয়া পর্যন্ত পথ দেখানিয়ারা দুশমনকে দেখা দেবে না। ঘাঁটাবে না।

লিলিলিভেনামবার সময় আমাদের মধ্যে একজন অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে ঝোপের ওপারে একজন শত্রুসৈন্যকে দেখতে পেল। সহজেই তাকে শেষ করে দিতে পারত। কিন্তু গুলির আওয়াজে অন্য শত্রুরা সজাগ হয়ে যাবে বলে চুপ করে রইল।

পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে আগে খোলা জমিটা বের করতে হবে। তারপর শত্রুরা ছাউনি থেকে দলে বলে এসে সে জমিতে পৌছনোর পথে যে সাঁকোটা আছে তাকে উড়িয়ে দিতে হবে। তার পরেই তো আসবে হাতের সুখের পালা।

সেজন্য সে কঠোর আত্মসংযম করল।

বয়েজ, আমাদের সেই দলের একটা গ্রুপ আরেকটা নালার পাশ দিয়ে যেতে যেতে অন্ধকারে নালার ওপারে একটা সৈন্যদল দেখতে পেল। তাদের হেল-মেটের আকৃতি দেখে বুঝল যে ওরা ইটালিয়ান সৈন্য। তারাও এদের আবছা অন্ধকারে এক চোখ দেখেই বুঝতে পারল এরা কারা।

আচমকা একটা শক পেয়ে গেল দু'দলই।

নালার এপারে আমাদের দল আর ওপারে ওরা। দু'পক্ষই চুপচাপ। মুখে 'রা' নেই, চোখে নেই ইশারা। যেন কেউ কাউকে দেখতে পায়নি এমন ভাবে দু'দল পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে গেল। ওদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে বাড়তে অন্ধকারে ওরা মিলিয়ে গেল। ঠিক ভূতপ্রেতের মত।

অবশ্য ওরা তাই। অন্তত মৃত ভূত হওয়াই ওদের উচিত। বেঁচে থাকার হক থাকা উচিত আমাদের। শুধু আমাদের।

কিন্তু বয়েজ, আমাদের এই দলটাই একটু পরে প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে সেই স্ট্র্যাটেজিক সাঁকোটা সাবড়িয়ে দিয়েছিল।

মনে রেখো, এই সব মোকাবিলাতে তোমাদের জীবন আর তোমাদের পরে যারা আসছে তাদের জীবন আর তোমাদের সকলের সাফল্য নির্ভর করবে শুধু তোমাদেরই আগাম দলের বুদ্ধির উপর।

বন্দুকে ঘোড়া টিপতে যতটুকু সময় লাগে তার চেয়ে বেশী তড়িঘড়ি খাটাতে হবে তোমাদের বুদ্ধি।

মনে রেখো যে তোমাদের আপেল বাছাই করে টুকরিতে রাখার মত একটি একটি করে বাছাই করা হয়েছে। এক হাজার জন স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিল। মাত্র শ'দেড়জনকে যোগ্য বলে মনে করে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। তোমরা

নামবে শুধু শত্রু এলাকায় নয়, শুধু আঘাটায় নয়, একেবারে আনকোরা নরকে। গ্রীণ হেল বস্তুটিকে চিনে রেখো।

ওরা হয়তো টের পেয়েই চারধারে গুলির শিলাবৃষ্টি শুরু করে দেবে। শ্রাপনেল ফাটাতে থাকবে। ঝলমলে ট্রেসার বুলেটের ফুলঝুরি ছোটাবে। রং-বেরঙের তারার মত সেই গুলির আলোয় তোমাদের চোখ ঝলসে যাবে।

কিন্তু দুশমনের চোখ থাকবে চাঁদমারি প্র্যাকটিশের ওপর। মণ খানেক হাতিয়ার, আলো, রাডার আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে তোমরা যখন আকাশী লীলায় নামতে থাকবে দেবদূতের মত, ওই মরণদূতরা তখন রেশমী প্যারাসুটের ছাতাগুলো ঝাঁঝরা করে দেওয়ার চেষ্টা করবে।

কিন্তু তাতে ঘাবড়িয়ো না। মনে রেখো যে জোয়ানের ছাতি যৌবনবতীদের জন্য। ব্লণ্ডদের মাথার সোনালা চুলের ঘষা খেয়ে খেয়ে ফুলে উঠবার জন্য। গুলি খেয়ে চুপসে যাবার জন্য নয়।

গুরু তারপর আশ্বাসে ভরা যে লোভের ব্যাপার ব্যাখ্যা করলেন, তা রসাল সাহিত্যের গুরুঠাকুর বোকাচ্চিয়োর মত রঙ্গরাজও হজম করতে পারতেন না।

লড়াই শেষ হলে সে সব সুখ তোমাদের জন্য. রিজার্ভ রেখেছে প্যাট্রিয়ট তরুণীরা। বেহেস্তে গিয়ে হুরি পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। এপারেই ওরা বসে আছে তোমাদের জন্য।

ততদিন মনে রেখো যে, বুকের ছাতির চেয়ে প্যাটের ছাতি ঝাঁঝরা হওয়াই ভাল। সেজন্যেই সযত্নে ক্যামোফ্লাজ করা জলপাই গেরুয়া আর হলুদ রঙে চকরাবকরা করে ছোপানো জাম্পিং স্মক পরিয়ে তোমাদের ·. গার ক্রিসমাস সাজানো হয়।

হঠাৎ যদি কোন শত্রুর ঘাঁটির ওপর বা প্যাট্রল দলের সামনে উদয় হও, ফর হেভেন্স সেক, ওরা টের পাবার আগেই সরে পড়ো এক টেরে। অন্ধকারে ওরা ভূত দেখতে থাকুক। ততক্ষণে তোমরা ভূতের মত নিঃসাড়ে সরে পড়ো।

তারপরই যেখানে প্যারাট্রুপ নামানোর মত জায়গা পাবে তার সন্ধান শুরু কর। পেলেই সঙ্কেত দাও। মনে রেখো যে তোমাদের হাতে সময় আছে মাত্র এক ঘণ্টা। এক ঘণ্টায় তোমরা জাপানী যুদ্ধের একটা মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারবে।

কেমন করে সেটা সম্ভব হবে তা আবার এই শেষ বার ব্রিফিং-এর (মামলা বুঝিয়ে দেবার) সময় আবার বলছি।

জাপানীদের যথেষ্ট পরিমাণে কিন্তু টেলিফোন নেই। বেতার যন্ত্রের আরো বেশী অভাব। তোমরা গ্লাইডার আর প্যারাট্রুপাররা নেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যাতে শত্রুর কোম্পানীগুলি ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখতে পারে।

রেজিমেণ্টাল হেডকোয়ার্টার থেকে ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে খবর পাঠানোর পথও বন্ধ করতে হবে।

ওরা হাঁটা পথে জঙ্গলের আড়াল দিয়েও যেন লোক মারফৎ খবর চালাচালি না করতে পারে।

মনে রেখো ফলের দিক দিয়ে প্রত্যেকটা যোগাযোগ এক একটা দুশমন দলের ব্রিগেডের সমান দামী।

রসদের ঘাটতি আর গোলাবারুদেরও কমতি আছে ওদের আগুয়ান বাহিনীতে। ওদের পিছনে যখন তোমরা কায়েম হয়ে পাট্টা গাড়বে তখন বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে ওদের তোমরা বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে। আমাদের লোকক্ষয় হবে অনেক কম। হয়তো নামমাত্র।

কিন্তু খবর পেলেই ওদের হেডকোয়ার্টার্স থেকে মরিয়া হয়ে খাবার পাঠাবে, আরো রি-ইনফোর্সমেণ্ট পাঠাবে। তখন তোমাদের এই দুঃসাহসী অভিযানে কোন ফল হবে না। তাছাড়া তোমরা আর তোমাদের পরের প্যারাট্রুপাররা যাবে মোটামুটি হালকা হাতিয়ার নিয়ে।

তোমাদের উপর আর্মার্ড ট্যাঙ্ক নিয়ে পালটা হামলা যাতে না হতে পারে সেজন্যও এই অভিযানে সফলতা অবশ্য দরকার।

অবশ্য তোমরা জান যে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যে সব গ্লাইডার তোমাদের পিছু পিছু তোমাদেরই আলো দেখানো জমিতে নামবে তাতে আসবে অ্যান্টি ট্যাঙ্ক কামান আর লোহার বর্মভেদী কামান।

কিন্তু সেগুলি কতদূর আর কত তাড়াতাড়ি তোমাদের কাজে লাগবে তা নির্ভর করবে তোমাদের সরেজমিনের উপর। আর্মার্ড কেরিয়ার কতখানি উঁচু-নীচু ভাঙা বা ডাঙা জমির মোকাবিলা করতে পারবে তা পশ্চিমী যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে জোর করে এখুনি বলা যায় না।

তাই তোমাদের আসল ভরসা থাকবে শুধু তোমাদের রাইফেল স্টেন গান, গ্রেনেড আর ব্যাঙ্গালোর টর্পেডো। অর্থাৎ বারুদ ভরা পাইপ যা দিয়ে কাঁটা তার থেকে হালকা বেড়া অনেক কিছুই উড়িয়ে দেওয়া যায়।

আর সবচেয়ে বড় ভরসা থাকবে তোমাদের হঠাৎ খেলানো বুদ্ধি, রেডি উইট।

আমি যে আজ তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তোমাদের আমারই মত চোরা বিদ্যায় তালিম দিচ্ছি, তা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র এই বুদ্ধির খেলায়। আর কোন কপিবুক উপদেশেই তা সম্ভব হবে না।

যুদ্ধে যোগ দিয়ে তোমাদের এই জিনিসটাই সবচেয়ে বেশী লাভ হয়েছে বলে আমি মনে করি। সেজন্যই তোমাদের শিক্ষার উপর আমার এত ভরসা।

তবে শোন আমার নিজের কাহিনী। আমি যখন অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়লাম—আমার প্লেনের কোন দোষ নেই—যেখানে নামার কথা তার চেয়ে মাত্র মাইল খানেক দূরে। ফ্ল্যাক ব্যাটারির গোলা তুবড়ীর মত আকাশ ফুঁড়ে উঠছে। হাউই বাজির মত ট্রেসার বুলেটের চারদিকে তুর্কীনাচন।

তার সব নাচা-কোঁদা এড়িয়ে এপাশ-ওপাশ পাক খেতে খেতে আমাদের প্লেন আমাদের সবকটি প্যারাট্রুপারের একটা স্টিক অর্থাৎ লাঠির মত গোঁজা সারি কোনমতে খালাস করে গেল। খালাস না বলে উগরে গেল বলতেও পার। আমরা পনের জনের লাইন।

কিন্তু তারপর?

তারপর ভূমধ্য সাগরের তাজা হাওয়া আমাদের ছাতাগুলোকে দোলা দিতে দিতে নানান দিকে সরিয়ে নিতে লাগল।

ঘন গাছপালায় ঢাকা একটা জঙ্গলের উপর আমি এসে পড়লাম। কোন্ গাছের কোন্ মাথা উঁচু মগডাল আমাকে বর্শা বা সড়কি বেঁধা করে দেবে তার ঠিক নেই।

অথচ আঁধারে ঠিক কি করে যে ওরই মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে নামব তারও ঠাহর পাই না।

আমার ফাঁসি হল শেষ পর্যন্ত।

অর্থাৎ আমার প্যারাশুটের লাগামগুলো একটা গাছের মগডালে ফেঁসে আটকে গেল। আমি মাটি থেকে হাত বিশেক দূরে ইতি-উতি দোলা খেতে খেতে ঝুলতে লাগলাম।

জঙ্গলটা নিথর নিঃশব্দ। কিন্তু তার বাইরে অবিশ্রান্ত মেশিন গানের গুলি। আর মাথার উপর এরোপ্লেনের কান ঝাঁঝরা করা আওয়াজ। আকাশ-ভরা ফ্লেয়ার অর্থাৎ নিশানা আলোর ভূতুড়ে ঝাড় লণ্ঠন জ্বলে উঠছে, আর নিভছে। আবার জ্বলে উঠছে।

জঙ্গলটাও একেবারে জনমানবহীন নয়। একটা ইটালিয়ান শান্ত্রী পিল বক্সের অর্থাৎ গুমটি ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। আমি চোখ বুজে মড়ার মত ভান করে রইলাম। নিঃসাড়, নির্নিমেষ। শুধু বাতাসে শুটের ছাতাটাকে যেটুকু দোলা দিয়ে যাচ্ছে সেটুকু বাদে।

মুখের উপর তেজী টর্চের বাতি এসে পড়ল। বুঝলাম যে ভেরী পিস্তলের গুলি করে সে আলোর শিখা ছাড়লো না কারণ সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে কোন প্লেন জঙ্গলে শত্রু লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছে মনে করে বোমা ছাড়তে পারে।

তারপর সেই ইটালিয়ান কারাবিনেরো অর্থাৎ সিপাই পা চালিয়ে এগিয়ে এল। যতটা কাছে হতে পারে এগিয়ে এসে আমার ফাঁসিকাঠে ঝোলা মৃত দেহটাতে একবার চোখ বুলিয়েই "সে মর্টে" ওটা মরে গেছে বলে ফিরে গেল।

জার্মান হলে তবুও দুটো গুলি ছুঁড়ে শরীরটা যাচাই করে নিত। কিপটে ইটালিয়ান গুলি বাঁচাল।

অথবা উপর থেকে কোন প্লেন টের পেলে বোমা ছাড়বে সে ভয়ও হয়তো ছিল। মোট কথা সে চুপচাপ করে গুমটি ঘরে গিয়ে ঢুকল। নিশ্চিন্ত নিঃসন্দেহ মনে।

আর আমিও খাপ থেকে ছুরি খুলে লাগাম কেটে নিলাম আস্তে আস্তে। শব্দ হলে চলবে না। হাতের স্টেন গানটা ঝাঁপ দেবার পর গাছে আটকে যাবার ধাক্কায় ছিটকে দূরে পড়ে গিয়েছিল। কাজেই শব্দ শুনে ক্যারাবিনেরো যদি ফিরে আসে—দ্বিতীয়বারের বার আর বাঁচতে পারব না।

খুব হুঁশিয়ার হয়ে জঙ্গলী ডালপালায় বুটের আওয়াজ বাঁচিয়ে স্টেন গানটা খুঁজে নিলাম। আর গুমটি ঘরের পাহারাদার সেই ক্যারাবিনেরোই আমার প্রথম শিকার হলো।

কিন্তু মনে রেখো, তোমার বুদ্ধির ঢাকনাটা তালা বন্ধ রেখো না। কখন চুপ থাকবে আর কখন দৌড়বে সে সব নতুন নতুন পরিস্থিতি অনুসারে ঠিক করবে।

নিজের দলের অন্য লোক যদি চুপচাপ লুকিয়ে এগোচ্ছে দেখ, তাহলে খুশী হয়ে তাকে ডেকে বসো না। কোন বিশেষ কারণেই সে চুপ করে আছে হয়তো।

আর শত্রুকে যদি তাকের নাগালের মধ্যে পাও একবারে চাঁদমারির মত, তাহলেও তখুনি গুলি ঝাড়বে অথবা তাকে নিঃসন্দেহ মনে সরে যেতে দেবে সেটা চকিতে ভেবে নেবে। তোমাদের জীবন ঝুলছে এক নিমেষের সুতোয়।

যদি কোন পুকুর বা ডোবায় পড়, চেঁচিয়ে উঠো না। বন্দুক আর কোন্ কোন্ হাতিয়ার নিরাপদে পারে ছুঁড়ে দিতে পারবে তা নিজেরাই বুঝবে। তবে কিট ব্যাগের জন্য মমতা করে না। ভিজে ব্যাগের ওজন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।

দিনের বেলাই এসব পরিস্থিতি মানুষকে দিশেহারা করে তুলতে পারে।

কিন্তু সবুজ নরকে গ্রীন হেলে অজানা আঘাটায় তোমরা তোমাদের গ্লাইডার বাহিনী আর প্যারাট্রুপারদের দিশা দিতে যাচ্ছ। অনিশ্চয়তা আর অনুমানকে মনে ঠাঁই দিয়ো না।

ওই ভাবগুলো হচ্ছে শত্রুপক্ষের বন্ধু।

আর—বুকে ক্রশ চিহ্ন আঁকতে আঁকতে গুরু বললেন, আর তোমাদের বন্ধু হচ্ছেন একমাত্র ভগবান।

পাছে কোন ভগবানে অবিশ্বাসী এ কথায় ভরসা না পায় সেজন্য তিনি আবার বললেন, কথাটা শুনতে কেমন কেমন লাগতে পারে। কিন্তু মনে রেখো যে বলশেভিকরাই সেই ১৯৩০-এ যুদ্ধের জন্য প্রথম প্যারাঝম্প শুরু করে। আরো জেনো যে ১৯৩৫ সালে যখন জার্মানরা সবার প্রথমে গোয়েরিং রেজিমেণ্ট নাম দিয়ে প্যারাবাহিনী তৈরী করেছিল তখন ওই নারকী, থুড়ি নাৎসীরাও এই শিক্ষাই পেয়েছিল।

আর ওদের যে শিক্ষা দিত তার নাম জান?

সবাই উৎসুক হয়ে তাকাল।

শিক্ষকের নাম ছিল জেনারেল ছাত্র। জেনারেল স্টুডেণ্ট।

হে আমার ছাত্ররা—তোমরা কিন্তু সবাই আমার চোখে জেনারেল।

তোমরা সবাই জেনারেল।

২০

যদি আমার মৃত্যু হয়···যদি আমি যুদ্ধে মারা যাই শুধু তখনি যেন খোলা হয়।

এরকম শর্ত দিয়ে এমন একখানা চিঠি ক'জন সংসারে লিখে রাখে? বিশেষ করে মৃত্যুর মুখোমুখি বসে?

লিখেছিলেন একজন।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বাহাদুর সমরনায়কের মধ্যে অন্যতম। বীরত্বে নয়, সৈন্য চালনার নিপুণতায় নয়, যুদ্ধে কলাকৌশল স্ট্র্যাটেজিতেও নয়। কিন্তু তবুও সব চেয়ে শ্রদ্ধেয় সমরনায়ক।

স্বয়ম্ভুর মতে বেসামরিক নেতা হিসাবে পরাজয়ের শেষ পরিখায় দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত অবাস্তবকে সম্ভব করে যুদ্ধ জয় করার মত নেতা চার্চিলের মত আর কেউ হবে না।

স্বয়ম্ যখন যুদ্ধে যোগ দিতে মন ঠিক করে ফেলেছে তখনো মিত্রশক্তিকে ঘোড়দৌড়ের বাজির কোন জুয়াড়ী ব্যাক করতে হয়তো সাহস পেত না। কিন্তু ১৯৪০-এ জার্মান প্রলয় বোমার মধ্যে থেকে একটি ডুবন্ত জাতি ও মরুঞ্চে মানসিকতাকে চার্চিল যেভাবে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুলে যুদ্ধে অবিচল রাখছিলেন তার তুলনা স্বয়ম্ ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পায়নি।

'আনটু ব্যাটল' রণপথে তিনি বারবার পার্লামেণ্ট থেকে, বি. বি. সি-র বেতারে মাভৈঃ আহ্বান করে যে সাহস যোগাচ্ছিলেন তা স্বয়মের নিজের ভীরু কুণ্ঠিত মুহূর্তগুলিকে ভরসায় ভরে দিত।

অথচ আশ্চর্য এই চার্চিলকেই সে খুব ঘৃণা করে। ভারতের স্বাধীনতা কামনার সব চেয়ে শত্রু, আপোষহীন শত্রু হিসাবে তাঁকে সে দু' চক্ষে দেখতে পারে না।

তবু তাঁর চিঠিটার কথা বারবার মনে করে।

ট্রেনিং ক্যাম্পগুলিতে রাত-দিন পরিশ্রম আর শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে স্বয়ম্ রাজস্থানের চারণদের কথা মনে করে। চিরাচরিত প্রথা আর পেশা অনুসারে

তারাও প্রেরণা যুগিয়েছে। এমন কি পৃষ্ঠপোষক রাজা আর রাজবংশের দরকার পড়লে যুদ্ধও করেছে। তবু ইংরাজস্থানের এই চারণ চার্চিলের তুলনা কোথায় ?

রসনায় তাঁর মৃতসঞ্জীবনী, লেখনীতে অস্ত্রঝঞ্ঝনা।

প্রায়ই সেই চার্চিলের কথা ভেবেছে স্বয়ম্ভু। ইংরেজ প্রধান মন্ত্রীর মত আমাদের দেশের স্বাধীনতার শত্রু বোধহয় কেউ নেই। আবার নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য এত বড় যোদ্ধাও কেউ হয়নি।

তাঁকে স্বয়ম্ভু মন দিয়ে ঘৃণা করে। আর পূজা করে মাথা নুইয়ে।

চার্চিল যুদ্ধে জিতবেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু এতদিন যে দেশকে টিঁকিয়ে রেখেছেন, এতটা তৈরী করে এনেছেন তার তুলনা নেই। এখন যুদ্ধের এলাকায় সেই চার্চিলেরই একটা চিঠির কথা ওর বারবার মনে পড়ছে।

প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। আরাকানের যুদ্ধপ্রান্তর থেকে ফ্রান্সের প্রান্তর কত দূর। কত অন্য রকম।

১৯১৬ সালে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি স্ত্রীকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। উপরে লেখা ছিল যে শুধু তাঁর মৃত্যু হলেই যেন খামটা খোলা হয় :—

'খুব বেশী দুঃখ করো না। আমি নিজের অধিকারে সম্পূর্ণ আস্থাবান আত্মা। মৃত্যু শুধু একটা ঘটনা এবং বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যে আমাদের যা ঘটে তার মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সবার উপরে—বিশেষ করে তোমায় দেখার পরে, হে আমার প্রেয়সী, আমি সুখী হয়েছি আর তুমি আমায় নারীর হৃদয় কত মহৎ হতে পারে তা শিখিয়েছ। যদি অপর লোক কিছু থাকে সেখানে আমি তোমার সন্ধানে থাকব। ততদিন সামনে তাকিয়ে থেকো, মুক্তি বোধ করো, জীবনে আনন্দ করো, ছেলেমেয়েদের লালন করো। আর আমার স্মৃতিকে প্রহরা দিয়ো। ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন। বিদায়।

ডবলিউ'

এই চিঠিটার কথা স্বয়ম্ভুর প্রায়ই মনে পড়ে। আর মনে পড়ে স্বাতীর কথা।

যার সঙ্গে সাংসারিক কোন সম্বন্ধই নেই। নেক্‌সট অব কিন নিকটতম আত্মীয় দূরের কথা, কোন আত্মীয়ই নয়। শুধু এইটুকু বিনা সুতোর হারের মত সম্বন্ধ। একটুখানি কথা—একটুখানি বাঁচো।

এমন সময় মৃত্যু যেন নিজে থেকে হাতছানি দিয়ে ওকে ডেকে পাঠালো।

ভি ফোর্স।

ভি ফর ভিকটোরি নয়। এখনো নয়।

ভ্যাল ফোর্স তার মানে।

ভলান্টিয়ার ফোর্স। অর্থাৎ যারা মরতে যেতে রাজী আছে। এবং নিজে যেচে।

কিন্তু সরকারী চাকরীর বা সাধারণ সেনাদলের চেয়ে অনেক বেশী রকমারী যোগ্যতা থাকা দরকার।

শুধু স্বাস্থ্য আর কষ্ট সইবার ক্ষমতা নয়। সে তো কম-বেশী সৈন্যদলের প্রায় সবারই থাকে। তাকে অভ্যাস দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

এখানে চাই অত্যন্ত চটপটে স্বভাব, ক্ষিপ্র গতি আর প্রত্যুৎপন্নমতি। গুলি চালানোতে শব্দভেদী রাজা দশরথ, দৌড়ঝাঁপে ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন, আহার-বিহারে বায়ুভক্ষণকারী সাপ আর মুখের ভাব ও চেহারা বদলানোর বিদ্যাতে বহুরূপী চ্যামেলিয়ন।

স্বয়ম্ অর্থাৎ শ্যাম মনে মনে ভেবে নিল—লড়াইয়ের বড়াই নেই এতে। কিন্তু আরো কিছু আছে, যা শুধু যুদ্ধের মধ্যে নেই।

এ-হেন সর্বগুণের পাঁচমেশালী পাঞ্চ অর্থাৎ মাদকতা চাই 'ভি' ফোর্সের জন্য। উন্মাদনা চাই মনে। তা না হলে দেহ হঠাৎ করে বসবে অসহযোগ।

পাঞ্চের পাঁচমিশেলী মদের মতই গরমা-গরম প্রতিক্রিয়া চাই মাথায়। না হলে বিপদের মুখে বুদ্ধি পালাবে উড়ে। বুদ্ধিই যদি পালায়, টমিগানের গুলি বর্ষণের গুরু গুরু ডাকে তুমি ময়ূরের মত পেখম মেলে নিজেকে সাজাতে অর্থাৎ বাঁচাতে নতুন নতুন পথে আর নয়া নয়া ঢং-এ নাচবে না। মোদ্দা কথা তোমার বারোটা শেষবারের মত বেজে যাবে।

এই বাহিনীতে ঘোরাঘুরিটাই বড় লড়াই।

শুধু নিজে বাঁচলে হবে না, শত্রুকে বাঁচাতে হবে। দরকাব হলে কই মাছের মত সীমাবদ্ধ জলে জিইয়ে থাকতে দিয়ে তার গতিবিধি, কাগজপত্র থেকে খবর বের করে নিতে হবে।

বুদ্ধি করে নিজের গোপন খাতার ফাঁকগুলিও সঠিকভাবে ভরিয়ে নিতে হবে। সে সবের জন্যই নিজেদের সেনাবাহিনী শত্রুর মোকাবিলার অপেক্ষায় ওপারে অর্থাৎ নিরাপদ ডেরায় দিনক্ষণ গুণছে।

আর তুমি রয়েছো এপারে। অর্থাৎ শত্রুর এলাকায়। যেখানে শত্রুর চর আর তোমার চর উপরে উপরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছে। এমনি এলাকায় যেটা দু'পক্ষের জন্যই সিকিউরিটি রিস্ক।

মাঝেতে বহে বিরহ কাহিনী। অর্থাৎ দুশমনের উপযুক্ত নানা কারবার হীরে দিয়ে হীরে কাটার কারবার।

একেবারে যাকে বলে রণকাব্য।

—লিরিক অব দি ওয়ার স্যার।

—হোয়াট্স দ্যাট, স্যাম?

—শিয়ার পোয়েট্রি স্যার, শিয়ার পোয়েট্রি। দিস লাইফ ইজ শিয়ার পোয়েট্রি।

এই মন্তব্যটুকু করেই স্বয়ম্ মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

এবং আশা করতে লাগল যে বেণাবনে মুক্তো ছড়ায়নি।

আজকের দিনের ইংরেজ আর মার্কিন বাহিনীতে নীচের দিকের পদগুলিতেও বহু শিক্ষিত ছেলে ঢুকেছে। ইংরেজের ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাক্টের কল্যাণে শুধু ছাত্র নয়, সমাজের সেরা লোকরাও যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। শুধু যোগই দেয়নি। নিরাপদ দূরত্বে সমরদপ্তর বা সৈন্যপ্রধানদের ব্যক্তিগত স্টাফে জড়িয়ে না থেকে সোজা চলে এসেছে সম্মুখ সমরে। শত্রুর মুখোমুখি। পুরোপুরি ঝুঁকি নিয়ে।

শুধু মুখোমুখি নয়। পিঠোপিঠি পর্যন্ত।

অর্থাৎ শত্রু এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, তোমার সেনাদলের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে। আর তুমিও এগিয়ে যাচ্ছ সামনেই বটে। তবে শত্রুসেনাকে পিছনে রেখে। তোমাদের দূরত্ব যত বাড়বে তোমার পাঠানো খবরের গুরুত্বও সে অনুপাতে বেড়ে যাবে।

আর তফাতের মধ্যে এই যে তুমি একাই একশো। একটা গোটা ব্যাটালিয়ন বা রেজিমেন্ট তোমার খবরে নির্ভর করে তাদের গতিবিধি আর লড়াইয়ের প্ল্যান কষবে।

এমনিভাবে একেশ্বর হয়ে শত্রুর পিঠোপিঠি গোপন খবর পাচারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে টোনি আরউইন। জেনারেল আরউইনের ছেলে। নিশ্চিন্ত মনে নয়াদিল্লীর জিমখানা ক্লাব আর সাউথ ব্লকের উদার নিরাপত্তায় এয়ারকণ্ডিশন করা আরামে সে সাম্রাজ্যরক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকতে পারত। সত্যি সত্যি কাগজ কলম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারত।

কিন্তু সে মায়ু গিরিশৃঙ্গের অর্থাৎ পাগলী পাহাড়গুলির ওপারে কি জানি কি পাগলামী করে বেড়াচ্ছে।

মান্নুর কথাটার মানে হচ্ছে পাগলী।

খোদ হোম সেক্রেটারী কনরান স্মিথ, বলতে গেলে তখনকার বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের রাষ্ট্রতরণীর একজন কর্ণধার। একটা ইঙ্গিতে একমাত্র ছেলেকে অমনি একটা নিশ্চিন্ত চেয়ারে বসিয়ে দিতে পারতেন। আর সেই অক্সফোর্ডের পাশ আর পালিশে ঝকমক করা তরুণ মালয়ের কোন জঙ্গলে জাপানী হানাদারদের পিছনে এসে কোথায় নিঃশেষ হয়ে গেল তার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

সে সব কথা মনে করেই স্বয়ম্ আশা করল যে ওর রসাল টিপ্পনীটা মাঠে মারা যাবে না।

অবশ্য মারা গেল না।

ভি ফোর্সের কমাণ্ডারের খাস আস্তানার যিনি খোদ কর্তা তিনি নিজে এই বছর তুয়েক আগে ছিলেন আহেলা বিলেতী আই-সি-এস। বর্মার একজন ডেপুটি কমিশনার। এখন বর্মা রাজ্য নেই। তার জেলা বা শাসনও নেই।

তারই সহপাঠী স্কচ সহকর্মী আই-সি-এস রেঙ্গুনের প্রলয় পয়োধি জলের প্লাবনে দিশেহারা হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন বলে শোনা গেছে।

আর ইনি মাথা ঠাণ্ডা করে নিজের শাসনবিদ্যা আর স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাচ্ছেন। ভি ফোর্সের কাজের উপর মিত্রশক্তির এগোনো পেছানো যুদ্ধ আর সাফল্য সব কিছু নির্ভর করছে।

মুখে হাসিখুশী আর কাঁধে ব্রিগেডিয়ারের মুকুট ও তারকাচিহ্নের ঝকমকানি নিয়ে তিনি এখন হেসে ফেললেন।

বললেন, আই সি। স্টিল স্মেলিং অব ইয়োর কলেজ ডেজ। এখনো কলেজের গন্ধ তোমার মধ্যে আছে। ভালই হলো এই গন্ধ আর এই রঙ্গরস তোমার খুব দরকার হবে। জান তো, আরাকানে কোন রসকস নেই। উঠের পিঠের মত তোমার নিজের মন থেকে তা আহরণ করে একলা কালহরণ করতে হবে। আশা করি এ সম্বন্ধে তোমার মনে কোন দ্বিধা নেই।

—না স্যার। আমার মন পরিপূর্ণ তৈরী।

—অ্যাঁ! তুমি মনের কথা তুলে ফেললে একেবারে! তবে শোন একটা সত্যি গল্প।

আমার দাদা গত যুদ্ধে গিয়েছিলেন। ফ্ল্যাণ্ডার্সে বোম্বার্ডমেন্টের মধ্যে ট্রেঞ্চে শুয়ে তারা গুণবার চেষ্টা করতে করতে তিনি তাঁর পাশে শোয়া স্যাঙাৎকে

জিজ্ঞেস করলেন—জো, তুমি যুদ্ধ বাধার আগেই আর্মিতে যোগ দিয়েছিলে। কিন্তু কেন?

জো বলল—জেনে রাখ যে আমার বৌ ছিল না আর যুদ্ধ আমি পছন্দ করি। কিন্তু তুমি কেন ফ্রণ্টে এলে, বন্ধু? তোমার অক্সফোর্ডের ছাপ নিয়ে দিব্যি লণ্ডনের কাছাকাছি কোন স্টোর অফিসে বা জি. এইচ. কিউ.তে থেকে যেতে পারতে।

দাদা উত্তর দিল—আমার বৌ আছে এবং আমি যুদ্ধ পছন্দ করি না। তাই।

পরমুহূর্তে একটা শেল এসে যুদ্ধপ্রেমিক জোকে চিরকালের মত শান্তি দিয়ে গেল। কিন্তু দাদা রয়ে গেল। আর তার যুদ্ধও এখনো চলছে।

কাজেই দেখ, মন নিয়ে জীবনকে মাপজোক করা চলে না।

গল্পটা বলে কম্যাণ্ডার বললেন, কিন্তু ঠাট্টার কথা আর ভাগ্যের কথা থাক। তোমার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের মাথা খাটিয়ে কাজ করতে হবে। তোমার বিদ্যা তোমার বুদ্ধি সেগুলি হচ্ছে তোমার পাস্ট, অতীত। সেই অতীতটা হবে সামনের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার পাটাতন। বসে থাকার সোফা নয়।

তোমার আসল অস্তিত্ব হচ্ছে তোমার বর্তমান। যাদের দিয়ে কাজ করাবে তারা তোমার স্তরের বা সমাজের লোক নয়। তাদের অনেকে হচ্ছে পাঁড় জোচ্চোর বা বদমায়েস, এমন কি খুনী। অথবা পাঁচটা টাকার জন্য নিজের ভাইয়ের ধড়টা দু-টুকরো করে দিতে পারে।

হঠাৎ বোধহয় স্বয়মের মুখটা কেমন হয়ে গিয়েছিল। সেটা কম্যাণ্ডারের নজর এড়ালো না। মুখের প্রতিটি রেখা, স্বরের ছোটখাটো ওঠানামা সবই কড়া খেয়ালে না রাখতে পারলে ভি ফোর্সের নেতা হওয়া চলে না।

তিনি বললেন, না, শ্যাম, তুমি এখনো তেমন পাকাপোক্ত হয়ে ওঠোনি। আরে আমরা তো সবাই খুনী। হয় করেছি, না হয় করব, না হয় করতে মনে মনে তৈরী আছি। মোকা পেলেই করব।

—স্যার, এটা তো যুদ্ধ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, যুদ্ধ তো নিশ্চয়ই। কিন্তু সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দী নেপোলিয়ন আর বিলেতের ডার্টমুর প্রিজনে বন্ধ আসল খুনী দুজনেই সমান। একই জগতের। তফাৎ হচ্ছে শুধু বুলিতে আর বলার ধরনে। এসব ব্যাপার বুঝে আমি দার্শনিক হয়ে উঠেছি।

—তার মানে ?

অর্থাৎ বর্মা থেকে পালানোর কারণটা ঘটার আগে অর্থাৎ রোজ ভোরে খবরের কাগজ নিয়মিত আসত। তখন সবার আগে শোক সংবাদের কলমটা দেখতাম। তাতে আমার নামটা নেই দেখলে খুশী হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতাম।

একটু হেসে তিনি বললেন, আর আজকাল রাতে ক্যাম্প খাটটাতে শুতে যাবার আগে মাটির নিচে যে বিছানা পাততে হয়নি সেটা বুঝে বিছানায় গড়িয়ে পড়ি।

দুটোই সমান মনে করি। আর ভাবি যে এক হিসাবে স্বয়ং ঈশ্বরও খুনী। আমার মতই—প্ল্যান করে খুনী। অবশ্য অনেক বড় স্কেলে।

স্বয়ম্ অপ্রস্তুত হয়ে তাকাল।

—জান শ্যাম, তোমাদের গীতা পড়লাম গত বছর। বর্মা থেকে বানের জলের মত প্রবল তোড়ে রিফিউজীরা এইসব জঙ্গল দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে নদী-নালা পার হয়ে ইণ্ডিয়ার দিকে পালাতে লাগল।

না পালিয়ে করবেই বা কি ? আমাদের আর্মি বলে যা ছিল তা আর্মিই নয়। আমাদের ইনটেলিজেন্সের মত বুদ্ধু আর ঘুমন্ত গুপ্তচর আর খবর যোগানে দল সারা পৃথিবীতে কোথাও ছিল না। এমনি অবস্থা যে আমি ব্রিটিশ রাজের একজন জেলা শাসক সেই আমিও খবর পেলাম না যে জাপানীরা হঠাৎ আমার হেড কোয়ার্টার্সে চড়াও হবে।

আমি পালালাম।

আর্মিও পালালো।

মোক্ষম মুহূর্তে অসুখে পড়েছিলাম। তাই শহরের অন্য ইয়োরোপীয়ানদের সঙ্গে পালাতে পারিনি। শাদা পলাতকদের রাস্তাটাও শেষ পর্যন্ত ধরতে পারিনি। কিন্তু অন্য রাস্তার নির্দয় নিঃসহায় কাহিনী সবাই জানে। তাই সে সম্বন্ধে কিছু বলছি না।

একটু উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন, শুধু একটা কথা বলব যে সব সময় ঈশ্বরকেই মনে হতো খুনী বলে। তিনি যুদ্ধ করান, রাজ্য হারান, নতুন শাসন বা অত্যাচার তৈরী করেন—সব সত্যি। কিন্তু এইরকম লাখে লাখে খুন কেন ? যারা নিরীহ তাদের উপরই এত নিষ্ঠুরতা কেন ?

কেন, তার উত্তর পেলাম একদিন। একজন ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক সব আত্মীয় আর সব বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নীচে একটা নালায় গড়াতে গড়াতে নেমে

গিয়েছিলেন জল খেতে। একা। ওঁর পায়ে হেঁটে নামার ক্ষমতা ছিল না। তবু প্রাণ বাঁচাবার তাগিদ সবার উপরে।

এক চুমুক রাম গিলে দম নিয়ে তিনি শুরু করলেন, জলের সন্ধানে আমিও ওর পেছনে পেছনে গেলাম। আমার সোলার টুপীতে করে জল তুলে ওঁর মুখে দিলাম। ওঁর কৃতজ্ঞ দুটি চোখ আমার দিকে শুধু তাকিয়ে রইল। তারপর উনি ছেঁড়া কোটের পকেট থেকে একটা পকেট বুক বের করে আমার হাতে দিলেন।

হয়তো ভেবেছিলেন যে আমায় প্রতিদান দিচ্ছেন। হয়তো কিছু শুনতে চেয়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেলেন।

সেই পকেট বুক ছিল তোমাদের গীতা। পাশে পাশে ইংরাজী অনুবাদ ছাপা ছিল। তাতেই জানলাম যে তোমাদের ভগবান বলেছেন যুদ্ধের আগে তিনিই সবাইকে মেরে রেখেছেন। মাই গড।

এই ঘন জঙ্গলের লতাপাতায় ছাওয়া ক্যামোফ্লাজ করা কুটীরের চারদিকে স্বয়ম্ চোরা চাহনি চালাচ্ছে দেখে কম্যাণ্ডার বললেন, ওয়েল স্যাম, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অব মাই ফ্ল্যাগস্টাফ হাউস?

তারপর নিজেই বলে চললেন, জান অল্প কিছুদিন আগেও রেঙ্গুনে আমার বাংলোয় যে ঠাট ছিল তার কথা মনে করে মাঝে মাঝে কম রস পাই না।

ডিনারের আগে ককটেল, সুপের সঙ্গে শেরী, শ্যাম্পেন, লিকিওর আর শুতে যাবার আগে হুইস্কি সোডা। ডিনার টেবিলে প্রত্যেকটি চেয়ারের পিছনে একটি করে বেয়ারা দাঁড়িয়ে। অন্যরা খাবার পরিবেশন করছে আর সুপারভাইজ করছে টেলকোট পরা বাটলার।

পর্টের আড়ালে প্যান্ট্রিতে আরো গুটিকতক পরিচারক আইসড কনসম (বরফ জমানো সুপ), রোস্ট ডাক, সোল মাছ ফ্রাই, মুখরোচক সেভারী ইত্যাদি তৈরী করতে ব্যস্ত। আর আমাদের গভর্নমেণ্ট হাউসের চাকরেরই সংখ্যা ছিল একশ দশ। কিন্তু আমিও ছিলাম একটি খুদে লাট।

—স্যার, এনলিস্ট করার পরে আমি নয়া দিল্লীতেও এই ঠাট এখনো চলছে দেখে এসেছি।

—কিন্তু সেখানেও কি দেখেছ সে সাম্রাজ্যশাসনকারীদের ঘরে ঘরে যখন এই নিশ্চিন্ত বিলাস তখন নীরবে দুশমন কিভাবে জাল ছড়াচ্ছে? মিলিটারী খবর ছেঁকে তুলবার জাল?

তোমার দাঁতের ব্যথাটুকু হলেও শাদা ওভারল পরা শুভ্রহাস্তমণ্ডিত জাপানী রাজহাঁসের মত নম্র আবাহনে তোমায় আপ্যায়ন করছে। তোমার পার্টিতে বা ক্লাবে যদি মিঠে মদ মার্টিনি সব চেয়ে ভালভাবে নাড়ান দিয়ে সার্ভ করা হয়ে থাকে তার পিছনে জাপানী হাত।

তোমার চুলের সবচেয়ে নটবর ছাঁট মাথাকে যদি অহঙ্কারে উঁচু করে তোলে তার জন্য কেরামতী জাপানী কাঁচির। সকালবেলা দলাই মলাই করে মন মেজাজ যে সুখের সুরে ভরে দিয়ে যায় সেই 'ম্যাসিয়োর' উঠতি সূর্যের কিরণে বড় হয়ে উঠেছে।

আর, আর সব গ্ল্যামার গার্লের আর গ্লোরিয়াস সোয়্যারী উৎসবের ছবি খুট খুট করে হাসিমুখে তুলছে ওরাই।

কিন্তু শুধু ওই মনমাতানিয়া ছবি তোলার জন্যই কি ওরা বর্মা জাঁকিয়ে বসেছিল?

—আপনারা সন্দেহও করেননি স্যার? ওরা তো কলকাতাতেও ব্যাঙের ছাতার মত নানান দোকান খুলে বসেছিল আর আমরা পাড়ায় পাড়ায় সেটা নজর করতাম। আর কারণ অনুমান করতে ভুল হয়নি।

—প্রশাসনের যখন নাশ হয় তার পেছনে থাকে বহু আরাম আর আলস্য আর মনকে চোখ ঠারা। খুসবুভরা খসখস টাট্টি শুধু গরম রোদ্দুর করে না; খবরের আনাগোনাকেও করে অবরোধ। অথচ রেঙ্গুনের সব চেয়ে চটকদার জনপ্রিয় সোস্যাল পার্টি দিত জাপানী কনসাল।

—কিন্তু ব্রিটিশ সিংহ তো এ পর্যন্ত সব সময়ই সিংহ বিক্রমে জেগে উঠতো আর গর্জে যেতো। এবার আপনাদের সাম্রাজ্যের মুকটমণি ক্রাউন জুয়েল হংকং থেকে মাত্র হপ্তা দুইয়ের মধ্যেই শাদা পতাকা উড়িয়ে দিলেন কি করে? হোয়াইট ফ্ল্যাগ?

—কারণ হোয়াইট হল থেকে শাদা পতাকা যে বছরের পর বছর ওড়ান হচ্ছিল।

—সে কথা আমরা কলকাতায় কলেজে পড়তে পড়তেই ভেবেছি। হিটলারের গুপ্ত মন্ত্রণার শৈলগুহা বার্চটেস গার্ডেনের উপরে যে ধাপ্পার ধূম্রজাল কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছিল তা আপনাদের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের ছাতার পরতে পরতে জমে ঘন হয়ে রইল। কাজেই যে বিরাট মারমুখী বিক্রম ওরা যবনিকার ঠিক পিছনেই জমা করছিল তা আপনাদের নজরে পড়েনি।

কম্যাণ্ডার সপ্রশংস দৃষ্টিতে সেই আধো অন্ধকার আধো আলোতে স্বয়মের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর টেবিলের ওপর রাখা রিভলভারটা ঠুক ঠুক করে ঠুকতে লাগলেন। অধীন ভারতীয়, তার উপর বাঙালী। নতুন রিক্রুটের মুখে এমন কথা অসহ্য। অথচ অস্বীকার করার পথ নেই।

এবং কথাগুলি শাণিত হলেও শান্ত। মর্মান্তিক হলেও মর্মভেদী।

তারপর বললেন, এ কথা ঠিক। ইংলণ্ড থেকে আমাদের তথ্যমন্ত্রী ডাফ কুপার এই ক'মাস আগেও এসে বর্মায় বসিয়ে রাখা তরুণ সৈন্যদের সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন যে বেচারারা যুদ্ধটা আস্বাদই করবার মোকা পাবে না। ঠিক সেই সময়েই জাপানীরা পার্ল হারবার আচমকা খতম করে দেবার ব্যবস্থা পাকা করে নিচ্ছিল। আর আমরা মান্দালয় ক্লাবে বছরের সেরা রোশনাই মিলিটারী টাট্টু করছি।

—বেসামরিকরা আর রাজনীতিকরা না হয় এমন নিশ্চিন্ততায় ডুবে থাকত। কিন্তু মিলিটারি ইনটেলিজেন্স কি করে ঘুমিয়ে ছিল বুঝি না।

—প্রত্যেক সাম্রাজ্য শেষ হয়ে যায় এমন করেই। সূর্য আমাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে অস্ত যাবার পথ পেত না। কিন্তু চাঁদের আলো আর মদের আবেশ আমাদের দিন রজনী ভরে বিরাজ করতো।

সৈন্যরা অবশ্য সুশৃঙ্খল ছিল। কিন্তু কর্তারা ছিলেন নিশ্চিন্ত আর ঘুমন্ত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আবার শুরু করলেন, তুমি কিপলিং-এর বইতে নিশ্চয় পড়েছ যে তুষারশুভ্র ব্লাউজ আর বিচিত্র বর্ণের রেশমী লুঙ্গিতে সজ্জিত বর্মী মেয়েরা রূপের ঠাটে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আর মনমাতানোর জন্য বিয়ার আর ব্রিজ, সুরা আর নারীর কোন অভাব ছিল না বর্মায়।

ক্লাব আর মাকসিমের মত নাইট ক্লাব সংসারের সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেত। প্যারাডাইস ক্লাবে যখন জেগে উঠলাম দেখি সব শেষ। একেবারে শেষ।

কে জানে হয়তো এই কম্যাণ্ডারেরও সবাই, সংসারের নিকটতম সবাই সেই প্রলয়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

স্বয়ম্ চুপ করে রইল।

একটু পরে কম্যাণ্ডার আবার শুরু করলেন, স্বপ্নের স্বর্গ শেষ আর গীতার লেখা মোহের শেষ দুটো কথাই একসঙ্গে বললাম। তোমাকেই বললাম—তুমি হিন্দু বলে। এবং আর্মিতে নতুন এসেছ বলে।

জলের মধ্যে থেকে মারা এবং মরা সহজ। একা সেই কাজ অনেক বেশী শক্ত। বিশেষ করে যখন তোমায় স্মাগলার ঠগ শয়তান জেলভাঙা এসব লোকের সাহায্যে কাজ করতে হবে। অনেক সময় মনে হবে জাপ শত্রুরা তোমার সহকারীদের চেয়ে ভাল লোক এবং বেঁচে থাকার যোগ্য। তাই জানিয়ে দিলাম।

তুমি যাদের দিয়ে কাজ করাবে তারা বেশীর ভাগ চাটগাঁর লোক। মগ আর জাপানী দু দলকেই তারা দু চোখে দেখতে পারে না—হেট লাইক হেল। তাতে তোমারই সুবিধা।

প্রত্যেক গ্রামে দু-একজন করে আমাদের লোক তৈরী আছে। তাদের দিয়ে শত্রুর গতিবিধি রসদ সরবরাহ অস্ত্রশস্ত্রের বহর ইউনিটগুলির পরিচয় ইত্যাদি বের করতে হবে।

ওরা নিয়মিতভাবে নয়, হঠাৎ হঠাৎ তোমার কাছে আসবে। অথবা তুমি নিজে গাঁয়ে গিয়ে তাদের মোলাকাৎ করবে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য তোমার ক্যাম্পেই লোক থাকবে।

সকলেরই আলাদা আলাদা ডাক-নাম দেওয়া আছে। পৈতৃক নাম আর পরিচয় এখানে অচল।

আর শোন, প্রত্যেকেরই নিজস্ব ডাক-নাম মুখস্থ রেখো। সেটা সব সময় কৌশলে যাচাই করে নেবে প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তে।

শত্রুরেখার আরো পিছনে আমাদের এজেন্টরা আছে। তারা একটু বেশী চালাক আর সজাগ। আর প্রচুর টাকা তাদের দেওয়া হয়।

তবে তার মধ্যে কেউ কেউ আছে ডাবল এজেন্ট। তুমি যদি যথেষ্ট পরিমাণে জাগ্রত হও, তোমারি সুবিধা হবে। বুঝলে?

—বুঝেছি, স্যার।

—বেশ ভাল কথা। তবে জান আমাদের সবচেয়ে সাবধান হতে হয় ফুঙ্গীদের সম্বন্ধে। যুদ্ধ শুরু হবার আগে বর্মাতে ত্রিশ হাজারের উপর জাপানী এসে বসবাস করেছিল। তারা সবাই বোধহয় স্পাই। তারা বর্মী ফুঙ্গীদের অনেককে হাত করেছে। অনেক ফুঙ্গী ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের পথ ভুলিয়ে জাপানীদের দিয়ে 'অ্যাম্বুশ' করতে সহায়তা করেছে।

কিন্তু আমিও দরকার মত ফুঙ্গী সেজে গেছি। তোমার একটু মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের মুখ এ কাজের পক্ষে সুবিধাজনক। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। গোটা কয়েক ধর্মপদও এখন আওড়াতে শিখে নিয়ো।

দেখবে আমি যখন ফুঙ্গী সেজে সর্বাঙ্গে ক্রীম মেখে আওড়াই :

আকাশে পদম নথি
সমনো নথি বাহিরে
পপঞ্চাভিরতা প্রজা
নিপঞ্চা তথাগতা

তখন কে আমায় ধরবে যে আমি তাদেরই একজন নই? আকাশে পথ নেই; সাধু শ্রমণ বাইরে দেখা যায় না। আলবৎ ঠিক কথা। কিন্তু আমি ভুলি না যে প্রজা অর্থাৎ সাধারণ মানুষ ছলনাময়।

ছুরি ওরা আমায় মারবে না আমিই তাদের মারবো, তা পদে পদে হিসেব করে চলতে হবে। বুঝলে শ্যাম?

আর শোন, তোমার ডান হাত হবে যে তার নাম খুনী খান। ওটা ওর বাপ-মায়ের দেওয়া নাম নয়। খানটা বোধ হয় ওর অবস্থাপন্ন বাপ-মায়ের পদবী। কিন্তু ও এতবার সার্জনের মত পাকা হাতে পেটে চাকু চালিয়েছে যে যার পেট কাটে সে মরবার আগে টেরই পায় না। তাই ও খুনের রাজা খুনী খান।

কিন্তু ওকে তুমি বিশ্বাস করতে পার পুরোপুরি। এককালে সরকার থেকে ওর নামে হুলিয়া আর বখশিশ ঘোষণা ছিল। ওর গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে যোগসাজস খুব ভাল। আর খবর আনে পাকা। ওর পাকা শিক্ষা তো সেই আমাদের আমলেই হয়েছিল কিনা।

এই পোশাকে নিশ্চয়ই চলবে না?

—ঠিক বলেছ তুমি। যদি ভগবান গীতার কথা মত তোমা: তুলে নেন—গড হেলপ ইউ—তখনো এই পোশাকের সঙ্গে জড়ানো মর্যাদা তোমার দেহ পাবে না। তোমার এই খাকি সর্ট আর শার্ট, বুট আর সক্স্ ওপারে অনুপ্রবেশ করবার সময় সবই ছাড়তে হবে। পরনে থাকবে লুঙ্গি আর চরণে থাকবে শুধু কাদা মাটি। লুঙ্গির নীচে থাকবে খসখসে সুতোর বোনা বেল্ট আর তাতে জড়ানো রিভলবার। আবার ফুঙ্গীপাড়ার জন্য আলাদা সাজ।

—ব্যাস?

—ব্যাস-স। আর কিছু নয়। তোমার একমাত্র বন্ধু বল, ভ্যালে (নিজস্ব চাকর) বল, সম্পদ বল, ওই হচ্ছে তোমার নিজের মাথা খেলানো বুদ্ধি। ত্রিসংসারে আর কেউ তোমার নিজের বলতে থাকবে না। তোমার নিজের জান, আর তোমার উপর ভরসা করে থাকা আমাদের সৈন্যদল নির্ভর করে থাকবে তোমার বুদ্ধির উপর।

বুদ্ধি। বুদ্ধির মত অদৃশ্য সুতো থেকে ঝুলবে এখন থেকে ওর জীবন। ছিল ছাত্র ; চাকরীর সন্ধানে জুতোর গোড়ালি ক্ষয়ে যাওয়া বেকার যুবক। হলো সামরিক অফিসার ; সঙ্গে এলো ঝকঝকে পোশাক আর পরিচয় এবং নাম উঠল এনলিস্টেড খাতায়। নামের চেয়ে বড় হয়ে উঠল নম্বর।

একটা শৃঙ্খলাময় সিস্টেমের মধ্যে একটা মাত্র ডিজিট, একটা ভাবলেশহীন পরিচয়হীন নম্বর।

এমন কি 'ডেথ অর গ্লোরি' মৃত্যু না হয় কীর্তি মার্কা ফ্রন্ট লাইন ডেসপ্যাচে উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমরে নামার বাহাদুরীও সে এই ফোর্সে পাবে না।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে কম্যাণ্ডার আবার বললেন, তবে জেনে রেখো যে কখনো কখনো বুদ্ধি করে বোকা সাজতেও হতে পারে। আমরা কিছুদিন আগে একজন নাইজেরিয়ান স্যাপারকে প্যারাশুট দিয়ে দি আদার সাইড অব দি হিল'-এ নামিয়ে দিয়েছিলাম। রেল-লাইন ওদিকে নেই। তবু এত মাল আর এত সৈন্য ওরা এদিকে নিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই বড় নদীটিতে সাঁকো বেঁধেছে। সেটা উড়িয়ে দিতে হবে।

—তা নাইজেরিয়ান কেন?

—বাঃ। কালো চাটগাঁয়ের লোকের মত পোশাক পরে অন্ধকারে পথ হাতড়ে একা যেতে পারবে। তা সে পেরেছিল। সাঁকোটা ভেঙেও ছিল। কিন্তু ধরা পড়ে ঐ ক্ষুরধার বুদ্ধির লোক যেমন বোকা সাজল তা তোমায় বলি।

জাপানীরা জিজ্ঞেস করল—তুমি কি করে এখানে এলে?

—আকাশ থেকে আমায় ফেলে দিয়েছিল—ছাতায় বেঁধে।

এই বলে আকাশে হাত-পা ছুঁড়ে সে হাসতে লাগল। মিশ কালো রঙের ভিতর থেকে ঝকঝকে বুদ্ধি ঝরতে লাগল।

—তোমার মত কজন আছে? তোমাদের সৈন্যদলে কতজন কালো আছে?

—হাজার হাজার, লাখ লাখ। আমি তো গুণতে জানি না।

আবার সেই মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের হাসি।

—তোমায় কি প্লেনে করে নামাল? না গ্লাইডারে করে?

—ও সব তফাৎ আমি জানি না। আমায় ধাক্কা মেরে নীচে ছুঁড়ে দিয়েছিল।

একথা শুনে জাপানীরা ওকে প্রচণ্ড মার দিল। মারতে মারতে আবার জিজ্ঞেস করল—তুমি কি প্যারাশুটিস্ট?

—সব নিগ্রোই ঝাঁপিয়ে পড়ে। শাদাদের লাথি খাওয়া, পিছন থেকে ধাক্কা খাওয়া আমাদের অভ্যাস আছে।

—কি রকম অস্ত্র আর কামান তোমাদের সঙ্গে আছে?

—জানি না। আমরা তো শুধু জঙ্গলী মানুষ। দা নিয়ে বর্শা নিয়ে মানুষ মারি। বনে চরে বেড়াই।

রাম ধোলাই দিয়ে উলঙ্গ করে ওকে জাপানীরা বনে ছেড়ে দিল। পিছনে রাখল নজর। কিন্তু জাপানীদেরও একটা পাগলাটে উলঙ্গ লোকের পিছে পিছে ঘুরতে লজ্জা হয়েছিল বোধ হয়। সে শেষ পর্যন্ত নিরাপদে ফিরে এসেছে। কেবল বোকার ভানটাই ছিল একমাত্র সহায়।

স্বয়মের নিজেব সৈনিক নম্বরটাও এখন লোপ পেয়ে যাবে।

বিশেষত অনেক ধর্ম সম্প্রদায়েব লোক বলে যে তোমার নম্বর যখন আসবে শুধু তখনি তুমি এই ভব ধাম ত্যাগ করতে পাববে। আব আমি তো এখন নম্বর নিজে থেকেই ছেড়ে আসছি। অর্থাৎ যখন তখন এস্পাব ওস্পার।

আর শোন। যখনি যে গ্রামে একা খববাখবব তদারক করতে যাবে সেখানে রাত কাটাতে যেয়ো না। সব চেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ অতিথি-বৎসল গ্রামেও না। তুমি জান না কোন্ দিনেব বন্ধু বাতেব দুশমনে পবিণত হয়ে শত্রুর হাতে তোমায় তুলে দেবে। অবশ্য ওব পক্ষে লাভের ব্যবসা, কিন্তু পুবো লোকসান আমাদের।

আব যদি পার তো মবো। পটল তোলা বরং ভাল। কিন্তু চরণ মাঝির নৌকো যেন ফুটো না হয়ে যায়। যোদ্ধা কথা জাপানীর হাতে বন্দী হয়ো না। নেভার। নো, নেভার।

আবেগে রুদ্ধ কিন্তু আনন্দে উৎসাহিত কণ্ঠে নতুনের সম্ভাবনায় সে বলল—তা নিশ্চয়ই হব না। স্যার, যোদ্ধা হয়েও গেঁযো মেঠো মানুষের সঙ্গে চোরা গোপ্তা কাজ করতে হবে। সব জেনে, সব বুঝেই ভি ফোর্সে নাম লেখাতে এসেছি। ওদের চালাতে, ওদের সঙ্গে চলতে, হাসতে মরতে হবে গোপনে। তবু তো বাঙালীব দুর্লভ জীবনে এখন পাব শুধু দৈহিক লড়াই নয়, বুদ্ধির লড়াই। নিজেই-নিজের সেনাপতি হয়ে বাঁচার উন্মাদনা পাব। সেটাই লাভ। হোক না সেটা যুদ্ধের বাঁধা ছকের বাইরে। আপনার ভি ফোর্সের অন্যরা যা পাবে তার চেয়ে আসলে অনেক বেশী পাব আমি।

—ব্রাভো বয়, ব্রাভো। কিন্তু আরো একটা অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে রোজ লড়াই করতে হবে। মশা, সাধারণ মশা। মশা নিবারণী ক্রীম সঙ্গে নিতে ভুলো না।

প্রতি সন্ধ্যার সহচরী হবে ওই ক্রীম। পাহাড়ের পাশ দিয়ে যখন সূর্য লাল চোখ করে সরে পড়ার জন্য শাসানি দেবে আর গাঁওবুড়া খুব মোলায়েম ভাবে ফিসফিস করে বলবে—এখন বোধ হয় সাহেবের বাসায় ফেরার সময় হল—তখন চট করে ওই ক্রীমের কথা মনে করো। 'প্রচণ্ড বৃষ্টিই হোক আর বৃষ্টি নেই বলে কোন ঝোপঝাড়ে তারার চাঁদোয়ার তলায়, রাত কাটাতেই হোক—বেশ ভাল করে ক্রীম মেখে নেবে।

ফিক করে হেসে স্বয়ম্ বলল, ঠিক একেবারে বিলাসিনী বিউটিদের মত। বিউটি স্লিপের জন্য বিউটি ক্রীম।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে ব্রিগেডিয়ার বললেন, এই রসবোধটা সব সময় বজায় রেখো। সব চেয়ে হতাশ আর একলা মুহূর্তে সব চেয়ে বড় সঙ্গী।

—ক্রীম মাখার অভ্যেস আছে, স্যার।

—নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এখানে সে অভ্যেসটা যেন রিলিজিয়ন করে নিয়ো। না হলে জঙ্গলের গভীরে বা চাঙের বুকে বা পাহাড়ের আড়ালে হঠাৎ কম্প দিয়ে জ্বর এসে গেলে জাপানী তলোয়ারের খোঁচা ছাড়া আর কিছুতেই সে জ্বর ছাড়বে না। মেপাক্রিন বটিকা রোজ খেলেও ছাড়বে না। মশাকে উপোসী রাখতে হবে।

আরো অনেক কথা হলো। চারদিকের এলাকার ম্যাপ, কোথায় কোন্ জাপানী ঘাঁটি নজরে এসেছে, কোন্ কোন্ গ্রামে খবব দেনেওলা আছে, কোথায় আছে স্পাই—সব আলোচনা হলো।

কম্যাণ্ডার আবার শুনিয়ে দিলেন, মনে রেখো তোমায় হুকুম করবার বা নির্দেশ দেবার কেউ ধারে কাছে থাকবে না। সব পবিকল্পনা তোমার নিজের, সব রূপায়ণ তোমারই দায়। শুধু যন্ত্রের মত গোটা কতক লোক থাকবে। তোমার বিচার হবে তোমার কাজ দিয়ে। তার মাশুল হচ্ছে তোমার নিজের দায়িত্ব আর বুদ্ধি। এর চেয়ে বড় পরীক্ষা জীবনের উপর দিয়ে আর কিছু নেই।

স্বয়ম্ গভীর ভাবে কথাগুলি মনের মধ্যে নিল।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। আমি নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে কাজে লাগিয়ে নিজেই নিজের নেতা হয়ে সেনাদলের আর নিজেরও মর্যাদা বাড়াব এই আশাতেই যেচে ভলাণ্টিয়ার হয়ে এসেছি। আমি জানি যে বর্মা সীমান্তের এই আর্মিকে মিত্রশক্তি বলে 'দি ফরগটন আর্মি'। তার মধ্যেও আমি কাজ করব সবচেয়ে বিস্মৃতিতে ঘেরা সৈন্য হিসাবে।

—না, করগটন আমি নয়, শ্যাম। আনুনোন আমি। ভুলে যাওয়া নয়; অজানা। খরচের খাতায় তোলা নয়। হিসাবের আড়ালে তোলা। যুদ্ধের শেষে যখন আমরা পর্দার বাইরে বেরিয়ে আসব লোকে আমাদেরই সবচেয়ে বেশী বাহাদুরী দেবে।

একটু হেসে তিনি আবার একটা গভীর নিঃশ্বাস নিলেন। বললেন, শ্যাম, তুমি তো কলকাতার ছেলে। বাঙালী। জান, তবুও কেন তোমায় এই কাজে নিচ্ছি?

মন্ত্রমুগ্ধের মত স্বয়ম্ বলল, বলুন তবে। আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে।

—তোমার চেহারা আর ভাষাজ্ঞানই তোমার উপর আমার নজর এনে দিয়েছিল। কিন্তু সেটা গৌণ।

বাঙালীদের ইন্ডিভিজুয়ালিজ্ম বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এই কাজে একটা বিশেষ সুবিধা। যদি—যদি সে বাঙালী আত্ম-নিয়ন্ত্রণ আর শৃঙ্খলার দীক্ষায় একটা দলের একটা টিমের মধ্যে মিলে-মিশে একাত্ম হয়ে যেতে পারে, আবার প্রয়োজনে সেই দলের উপরে দলের বাইরে নিজত্বকে কাজে লাগাতে পারে।

কোন মানুষ যদি ভেড়ার দলে থেকে থেকে ভেড়া বনে যায় তার দ্বারা এ কাজ হবে না। আমি রিপোর্ট পেয়েছি তুমি তা হয়ে যাওনি।

দ্রুত হাতে দুটো গ্লাসে 'রাম' ঢালতে ঢালতে তিনি বললেন, না, বড় ভারী হয়ে যাচ্ছে আবহাওয়া। তার চেয়ে সেই গানটা একসঙ্গে নিচু সুরে গাওয়া যাক। তুমি তো কলকাতিয়া। গানটার নাম দি ক্যালকাটা কলেরা সঙ। আমাদের জন্যেই যেন লেখা।

Stand to your glasses steady.
This world is a world full of lies.
Here's a toast to the dead already
And here's to the next man to die.

কলকাতার স্বয়ম্ যুদ্ধক্ষেত্রের শ্যাম হয়ে গেছে। সেও গলা মিলিয়ে গাইতে লাগল। সামনে অজানার অভিসার। অচেনার লীলা।

গাইতে গাইতে স্বয়ম্ যেন নতুন একটা আবেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। 'রাম' সুরার উন্মাদনা ছাপিয়ে লোপ করে দিয়ে একটা মানসিক রমণীয় জীবন-বেদ শুনতে পেল।

কেমন সমর-মন্ত্র এটা? কেমন সাধনা যার সন্ধানের মধ্যে সে অনুভব

রয়েছে একটা পরম সার্থকতা? জীবন-মরণের চরম লীলার মধ্যে পরম প্রাপ্তি।

স্বয়ম্ভূ থেকে স্বয়ম্। তা থেকে শ্যাম। নামের প্রত্যেকটা পরিবর্তনের মধ্যেও যেন সে একটা নিয়তির ইঙ্গিত, একটা গোপন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে।

সমস্ত বনভূমি নীরব নিস্পন্দ।

হঠাৎ একটা হরিণ ডেকে যাচ্ছে। কোন বুনো পশুর পায়ের খসখস শব্দ তাঁবুর চারপাশে ক্যামোফ্লাজের জন্য ছড়ানো ডালপালায় মর্মরিত হয়ে উঠছে। সুপুরী গাছের মৃদু মর্মরধ্বনি আর বাঁশ-বনের দোলানীর পটভূমিকায় একটা জগৎ ঘুমিয়ে আছে।

আর সেই ঘুমের দেশের মধ্যে একমাত্র জীবন্ত জাগ্রত সত্তা হবে স্বয়মের। তার নিজের কাজের গণ্ডীর মধ্যে সে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার স্বাদ পাবে।

স্বাতী বলেছিল—লিভ এ লিটল।

২১

বন্ধনহীন গ্রন্থি।

কাব্যের ভাষায় যা রমণীয়, আটপৌরে সংসারের মধ্যে তা-ই গাঁটছড়া ছাড়া বাঁধন হিসাবে রোমান্সে ভরা।

স্বাতীর কাছে সেই বহু ভাগ্যে পাওয়া অনুভব না এল তার রমণীয় কাব্যময়তা নিয়ে, না তার সাংসারিক রোমাঞ্চ নিয়ে।

সংসারের হিসাবে স্বয়ম্ কেউ নয়। শুধু প্রতিবেশী, শুধু পরিচিত একজন—যে মাত্র হালে মেশার যোগ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার যাচাই হলো না। অজ্ঞাত যার ভবিষ্যৎ আর অপরিচিত যার বর্তমান তার চিন্তা আর তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা চিন্তা করে সময় নষ্ট বাস্তব সংসার করে না।

স্বয়ম্ বলেছিল যে সে ত্রিশঙ্কু। স্বাতী বলেছিল, তুমি মাথা তুলে রেখেছিলে আকাশে আর এখন চরণ রেখেছ ধরণীতে। তুমি সেতু—আকাশ আর পৃথিবীর যোগসূত্র।

একটু হেসে যোগ করে দিয়েছিল, সত্যিই তাই। তুমি প্যারাসুট রেজিমেন্টের অফিসার। আকাশে উড়ে স্বর্গ থেকে নেমে ধরণী দখল করবে।

স্বয়ম্ এই প্রশংসাটুকু মন খুলে উপভোগ করেছিল। হেসেছিল। বলেছিল, তার মানে আমি শঙ্কাহীন ত্রিশঙ্কু। বাধা-বন্ধনহীন।

কিন্তু সে রেখে গেল এক বন্ধনহীন গ্রন্থি। ঠিকানাহীন চিহ্নহীনভাবে মিলিয়ে গেল। শুধু রেজিমেন্টের নাম আর তার সঙ্গে এ পি ও (আর্মি পোস্ট অফিস) নম্বর। একটা জলজ্যান্ত মানুষের ঠিকানা ও পদচিহ্ন এমন করেই লেপে মুছে লোপ করে দেওয়া হয় সামরিক ব্যবস্থায়।

সেই বিলোপটা স্বাতী স্পেশাল ট্রেনে স্বয়ম্‌কে বিদায় জানাতে এসে আরো বেশী মর্মে মর্মে বুঝেছিল। আর্মি ট্রান্সপোর্টের ট্রেন সিগন্যাল কেবিন ছাড়িয়ে এঁকে-বেঁকে নজরের আড়ালে মিলিয়ে গেল। ইঞ্জিনের মাথার উপরের সিগারেটটা যেন শেষ সুখ-টানের পর হালকা একটু ধোঁয়া আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নিঃশেষে নিভে গেল।

কিন্তু ট্রেনটার একটা ঠিকানা জানা আছে। তাকে খুঁজে পাওয়াও যাবে। তার আরোহীদের ঠিকানা কিন্তু ওই তিনটি অক্ষর ছাড়া কিছুই নয়। তাদের কোন খোঁজ করাও চলবে না। যুদ্ধ নামে একটা বিরাট যন্ত্র তাদের গ্রাস করে মুছে দিয়েছে।

অজানা য়্যাসেমব্লি সেণ্টারে নিয়ে যাবার মিলিটারী ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম বিদায় সম্ভাষণের উপযুক্ত জায়গা নয়। না আছে নিরিবিলি, না নিরালা পরিবেশ। চার দিকে অসভ্য চিঁড়ে-চ্যাপটা ভীড়। তার চেয়ে বেশী অসভ্য হচ্ছে অচেনা লোকের নজরের তীর। ইঞ্জিনের সার্চলাইটের চেয়ে বেশী প্রখর, বেশী মুখর সেই সব নজর। তার বাইরে অনেকটা দূরে নিরিবিলিতে ওরা মিলিত হয়েছিল।

ওই সব ভীড আর নজর উপেক্ষা করে স্বাতী বলেছিল, এতদিন ট্রেনিং ক্যাম্পে ছিলে। তখন ভাবিনি। এখন মনে হচ্ছে ইতিমধ্যে নিজেকে বিদায় নেওয়াতে অভ্যস্ত করে নেওয়া উচিত ছিল।

স্বয়মের সুঠাম ইউনিফর্মে ঘষামাজা পালিশ করা পদেব চিহ্নগুলি ঝকমক করছিল মিলিটারী মহিমায়। কিন্তু তার নিজের আঁখিতারায় কোন দীপ্তিরই আভাস ছিল না। স্বাতীর এই কথাতে সে আত্মসংবরণ করে নিল।

হেসে বলল, অর্থাৎ বেশ ভাল করে ওদেশী লোকদের মত গুডবাই ডার্লিং প্রভৃতি বলতে মক্স করে নেওয়া উচিত ছিল। তা করনি, ভালই করেছ। বিনা কথার বিদায় বিনা সুতার হারের মতই বেশী যত্নে তুলে রাখতে হয়।—এবং বেশী সঙ্গোপনে।

তার পরের নিবিড় কয়েকটি সোনাঝরা মিনিট ওদের কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছিল, কি কথা হয়েছিল আর কি হয়নি স্বাতীর কিছুই মনে নেই বলে মনে হত।

মনে আছে অথচ মনে নেই। স্মরণে বিস্মরণে জড়ানো সুধায় ভরানো সেই পরম ক্ষণটুকু। সেই পরম স্বীকাব। কিন্তু কোন অঙ্গীকার নয়।

তারপর থেকে স্বাতী ক্রমশ যেন নিজের শামুকের খোলার মধ্যে গুটিয়ে যেতে লাগল। অথচ সে যে কোন রকমেই সঙ্কুচিত বা স্বেচ্ছা-নির্বাসিত ভাবে থাকুক এটা স্বয়ম্ নিশ্চয়ই পছন্দ করবে না তাও সে বুঝত।

স্বয়ম্ বলে গিয়েছিল, তুমি খুব সহজ আছ এইটুকু যেন আমি মনে করতে পারি। আমার চিন্তা তোমার চিত্তে যেন কোন শিকল অদৃশ্যভাবে না পরিয়ে দেয়। এরকম যেন না হয়।

স্বাতী মৃদুস্বরে বলেছিল, তুমি শিকল কেন মনে করছ? আমি যদি মনে করি মণিহার?

—না। মনে মনের মণিহার বাইরের জগতে ব্যবহারে বিহারে যেন শিকল না হয়। আমার কথা তোমার মনে কোন ছায়া এনে দেবে তা আমি চাই না।

স্বাতী তমসা-তীর্থে স্নান করা আধুনিকা। তবু সে স্বয়মের শেখান, স্বয়মের মুখে শোনা পুরাকালের নায়িকার কথাটুকু কখনো মন থেকে সরায়নি।

একদিন কথায় কথায় সে স্বাতীকে রামের সঙ্গে বনবাসে গমনের সময় সীতা রামকে যা বলেছিলেন তা বলেছিল, যত্বয়া সহ স স্বর্গঃ। তোমার সঙ্গই আমার স্বর্গ।

একালিনী স্বাতীর সীতার মত কোন বন্ধন নেই, নেই কোন অনুশাসন। কিন্তু মনে মনে সে পরিবার সংসার সমাজ সব এড়িয়ে, সব ছাড়িয়ে একটি মন্ত্রের অনুরন অনুভব করেছে। সীতার মত স্বর্গসুখ সম্ভব নয় বনভূমিতে। কিন্তু মনভূমিতে সে তো একা নয়।

মনে মনে সে ভাবল—আমার নিঃসঙ্গতার কারণ হচ্ছে তোমার স্মৃতি। আর নিঃসঙ্গতাতেই তোমার সঙ্গ পাব।

কিন্তু সে যে বহু জনেব প্রার্থনার ধন। ধনী উঁচু মহলের আধুনিকা তরুণী। নিভৃতে থাকতে চাইলেই বা সেটুকু স্বাধীনতা সে পাবে কি করে? তার নজরে পড়া, তার প্রেম পাওয়া যে বহু তরুণের প্রার্থনা। আর সেই সাধনার হোমকুণ্ডে উভয়পক্ষের হিতৈষী আর গুরুজনরাও যে নিত্য আহুতি দেবার জন্য উৎসাহ দেয়।

মডার্ন কলকাতার, পশ্চিমের মন্ত্রে জেগে ওঠা কলকাতার নতুন নতুন গজিয়ে ওঠা সান্ধ্য সমাজে মধ্যমণি হবার যোগ্যতা যে রাখে তাকে আড়ালে থাকার সুযোগ দেবে এ হেন বেরসিক নয় কলকাতা।

একটা জ্যাম সেসনে অর্থাৎ অর্কেস্ট্রার বাজনা শুনতে শুনতে দিন দুপুরে বিকেলে কফি আর হ্যামবার্গার সামনে রেখে আড্ডা আর ইচ্ছা হলে হৈ হল্লা মায় নাচের মাঝখানে বন্ধু-বান্ধবীর দল স্বাতীকে নিয়ে এসেছিল। উত্তর কলকাতার বেঙ্গলী মহিলা মহলে দিবানিদ্রা যেমন মহাপুণ্য এদের কাছে দিবানৃত্য তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়।

তিন-চারজন মেয়ে বন্ধু আগে থেকেই একটা টেবিল দখল করে রেখেছিল। তাদেরই একজনের চেনা কয়েকজন মিলিটারী তরুণ অফিসার' কোন টেবিল

খালি না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তাদের দেখতে পেয়ে ওরা ডেকে আনল। ওয়েটারকে দিয়ে আরো কয়েকটি চেয়ার আনিয়ে ওদের নিজেদের টেবিলেই বসাল। ঘেঁষাঘেষি করে বসে শুরু হল মেশামেশি।

জ্যাম সেসন সব অর্থেই সার্থক হয়ে উঠল। জ্যামের মতই মিঠে আর আর ঠাসাঠাসি।

হালকা হাসি আর মিঠে ঠাট্টার মধ্যে শুরু হয়েছিল তাদের পরিচয়। কিন্তু নতুন জঙ্গী বন্ধুরা সব অগ্রসর, মানে অ্যাগ্রেসিভ, মানে এগিয়ে যাবার বিদ্যায় ওস্তাদ।

মিলিটারী বিদ্যায় যারা রপ্ত তাদের ধর্মই যে এগিয়ে যাওয়া। দখল করা।

এমনি একটি দখলিয়ানা ভাব দেখিয়ে ওদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র অর্থাৎ অভিজ্ঞ নেভাল অফিসারটি মোম দিয়ে নরমকরা গোঁফের স্থচালো প্রান্ত স্থখে মোচড়াতে মোচড়াতে নিজের পুরুষালি দুঃখ নিবেদন করল।

সে বেশ দুঃখে বিগলিত ভাবে বলল, জান তোমরা, আমার কি কপাল। এই কলকাতার এক রেস্তোরাঁ থেকে বছর সাতেক আগে আমি একটি কচি বেবী ফেস নিয়ে নিরীহ নিশ্চিন্ত ভাবে বের হচ্ছিলাম। বেয়ারা দরজা খুলে সেলাম করে দাঁড়াতেই সামনে পড়ল এক লম্বা দাড়িওয়ালা সর্দারজী। দাড়ির চেয়ে লম্বা কাগজপত্রের বাণ্ডিল নাড়তে নাড়তে সে বলল—ফরচুন টেলার, সার। গ্রেট ফরচুন ফর ইউ।

ওর ফরচুন গড়ে তুলতে আমি কিছুই সাহায্য করব না এ কথা সংক্ষেপে জানিয়ে দিলাম। আরও ভাল করে সমঝিয়ে দেবার জন্য হাতটা সামনের দিকে এগিয়ে তুলিয়ে দিলাম। তারপরই মিলিটারী কায়দায় আইজ ফ্রণ্ট।

সে কিন্তু ওস্তাদ চিড়িয়া। মোটেই না ঘাবড়িয়ে সেও পালটা হাত তুলিয়ে লাল ব্রিটিশ সিংহের ছবি আর ছাপমারা একটি সরকারী সার্টিফিকেট দেখিয়ে দিল। ব্রিটিশ ভাইসরয়ের ভারিক্কি একজন একজিকিউটিভ কাউনসিলার নিজে সই করে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। সর্দারজীর ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে অলৌকিক। হাতে হাতে প্রত্যক্ষ ফল পেয়েই তবে তিনি এই সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

তা দেখেও আমি বাগ মানলাম না দেখে সর্দারজী বলে বসল—মিলিটারী সাব, স্থন্দরী মেয়েরা সব সময় আপনার চার দিকে ঘিরে থাকবে। স্থন্দর স্থন্দর সব মেয়ে। আহা! আপনার কি ভাগ্য!

আমি তখনো আইবুড়ো। আহা! শুনে পুলকে গলে গিয়ে একখানা পাঁচ টাকার নোটই বকশিশ করে ফেললাম। পাছে তার সঙ্গে সে আবার খারাপও

কিছু বলে বসে সেই ভয়ে আর কিছুই শুধোলাম না। শুধু জেনে নিলাম কটি সুন্দরী। সে বলল পাঁচটির কম নয়।

স্বাতী মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিল। ওরাও পাঁচটি তরুণী একসঙ্গে বসে আছে আর এই লক্কা পায়রাদের এক টেবিলে বসিয়েছে। কে জানে? এই জঙ্গী নওজোয়ান আবার নৌ-জোয়ান। যে পাঁচটির কথা বলেছে তার খেই ধরে স্বাতীর সুতোতে ও টান দেবে কিনা।

কাজেই স্বাতী লেগ পুল করে জিনিসটা উড়িয়ে দেবার জন্য বিদ্রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, হায় হায়। মোটে পাঁচ টাকা বকশিশ করেছিলেন বলে পাঁচটি। একটি দশ টাকার নোট আপনার দেওয়া উচিত ছিল।

মুখে করুণ হাসির রেশ টেনে মিলিটারী বলল, তখন ওই ভবিষ্যৎ-বাণীটা আমায় সোনার স্বপ্নে মশগুল করে তুলল। হাতে হাতে ফল পেতে বেশী দেরী হল না। একেবারে হুমড়ি খেয়ে—হেড লং যাকে বলে—প্রথমেই একটি সোনালী সুন্দরীর সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। মিলিটারী কায়দায় যাকে বলে ফরওয়ার্ড মার্চ। দুর্গ দখল করে ফেললাম। ফল—বিবাহ। তবু তখনো আশা ছাড়িনি।

সঙ্গী আর সঙ্গিনীরা সমস্বরে—একই নিঃশ্বাসে প্রায় জিজ্ঞেস করল, তারপর?

—তারপর? স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিট তো সম্ভব ছিল না। একেবারে এনসার্কলমেণ্ট হয়ে গেল। চারদিক দিয়ে ঘেরাও। চারপাশে ফুলের বাগান, মুক্তির হাতছানি। কিন্তু চার ধারে ঘেরা বিয়ের কাঁটা তারের বেড়া। এখন সাত বছরেই ঠিক পাঁচটি মেয়ে আমার। পাঁচ দিক থেকে ঘিরে কিলবিল করছে। ওভার-রান করে ফেলেছে। বলে এটা দাও, ওটা চাই। বলে হাঁটু গেড়ে ঘোড়া হও।

বৌ বলে—জাঙ্গল ওয়ারফেয়ারটা ঘরে বসেই প্র্যাকটিস করে নাও। মেয়েরা বলে তোমার উপর আমরা সোয়ারী হব। বৌ বলে—বাড়ি বসেই 'ব্যাটল কিট' আর আর্মামেণ্ট নিয়ে মার্চ করা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। দেখ হায়, সুন্দরী পরিবৃত হয়ে থাকার ভাগ্য।

স্বয়ম্ বলেছিল, অফেন্স ইজ দি বেস্ট ডিফেন্স। আগুয়ান আক্রমণই সব চেয়ে ভাল প্রতিরক্ষা। তারই শিক্ষা স্বাতী কাজে লাগাবে। কারণ নৌবাহিনীর সেনানী বড় বেশী তার দিকেই টার্গেট প্র্যাকটিস করছে এখন। মেয়েদের ওই দৃষ্টি চিনতে ভুল হয় না।

স্বাতী তাই একটা যেন বুলেট ছুঁড়ল, ওয়েল ড্যাডি, সর্দারজী আপনাকে সময় থাকতে সাবধান করে দিয়েছিল। ওর হাতে পাঁচ টাকার নোটখানা গুঁজে দেবার সময় কি আশা করেছিলেন? হুরীতে ভরা হারেম?

হঠাৎ ওদের সকলের হো হো করে হেসে ওঠার ধাক্কায় মেঝের মাঝখানের ছোট্ট নাচের জায়গাটিতে যেন বোমা ফাটল। নৃত্যপরাদের তাল ভঙ্গ হল।

সচকিত হয়ে স্বাতী একবার উপরে চোখ তুলে তাকাল। যেন অদৃশ্য শূন্য থেকে স্বয়ম্ প্রশংসা ভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু মিলিটারী বন্ধুটি জাত যোদ্ধা। তিনি হারবেন, কিন্তু হার মানেন না। নেভার সে ডাই—মারা গেলাম এ কথা কখনো বলো না। শুধু যুদ্ধশাস্ত্র নয়, জীবনশাস্ত্রের বচন।

অতএব তিনি মাথা নুইয়ে মিষ্টি করে বললেন, সুইটি ডিয়ার, তোমার ব্রডসাইড পর্যন্ত কি চমৎকার।

একটু থেমে আর একটু ফোড়ন দিলেন, যেমন মোক্ষম তেমনি মিঠে তোমার ব্রডসাইড।

যুদ্ধজাহাজের একটা পাশের সবগুলি কামান যখন দাগা হয় সে সময়কার গোলার স্রোতকে বলা হয় ব্রডসাইড। মিলিটারীটি স্থলসেনার নয়, নেভীর অর্থাৎ জলসেনার। তাই ব্রডসাইড কথাটা ওর মুখে সহজে এসেছিল।

কিন্তু স্বাতী ক্ষুরধার হাসি দিয়ে সেই মিঠে অথচ মোক্ষম অনুযোগকে নস্যাৎ করে দিল,- আপনি যে ব্রডসাইডের কথা বলছেন, সেটা জলযুদ্ধের নয়। যদিও অবশ্য জলীয়।

সবাই সকৌতুকে ওর দিকে তাকাল।

স্বাতী উদ্ভাসিত মুখে বলল, রিন-এ অর্থাৎ রয়্যাল ইণ্ডিয়ান নেভীতে আজকাল যে ব্রডসাইড সবাই চালাচ্ছে তা, আমি যতদূর জানি, গোলাগুলি নয়। এক ভাগ জিন, এক ভাগ ড্রাই ভারমুথ, এক ভাগ সুইট ভারমুথ, দু ঝটকা বিটারস আর এক চামচ চেরী ব্র্যাণ্ডি। এতগুলো অগ্নিবারি একসঙ্গে তোড়ে বর্ষণ করলে কোন্ শত্রুরের সাধ্যি তার ধাক্কা সামলায়? তাই না, অ্যাডমিরাল?

বেচারী লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডার। নেভীর ক্যাপ্টেন পর্যন্ত হয়নি। এই যুদ্ধ চালু থাকতে থাকতে ওই প্রমোশনটুকুও হয়ত হবে না। কিন্তু স্বাতীর ব্রডসাইডের আঘাতে সে এক লাফে অ্যাডমিরাল হয়ে গেল।

মাউণ্টব্যাটেনের পদটা এবার যায় আর কি !

অ্যাডমিরাল কিন্তু সত্যিই শিভ্যালরীতে খুব উঁচুদরের যোদ্ধা। এমনভাবে মুখের ভঙ্গিতে, উত্তরের ধারাতে এই আক্রমণটাকে সহজ আর সরস করে তুলল যে কোন বিরক্তি বা অপ্রীতির সম্ভাবনা মাত্র গজাল না।

আরেক জন বন্ধু মিলিটারী এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে খুব প্রসন্ন ভাব দেখিয়ে এগোবার চেষ্টা করল। বলল, সিনরিটা, আপনি ম্যাজিক জানেন। আমাকেও দিন না অন্তত একজন স্প্যানিশ গ্র্যাণ্ডী করে। তাহলে আমি নিদেন পক্ষে ডুবন্ত আর্মাডারও অ্যাডমিরাল হতে রাজী আছি। তার চেয়ে বেশী সুখের ডোবা, সুখের মধ্যে ডোবা আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

বলেই সে বাউ করে নত হয়ে ডুব দেবার জন্যই যেন প্রস্তুত হয়ে গেল। ক্ষণকালের লীলার স্রোতে।

চকিতে স্বাতীব একবার বর্মা, আসাম, আরাকানের জলা, জঙ্গল আর জলরাশির কথা মনে হল।

আরেকবার মনে হল সেই সব ফ্রণ্টে তৈরী করা বাঙ্কার ডিফেন্সগুলির কথা। মাটিতে লম্বা লম্বা জিগজাগ আঁকাবাঁকা রেখায় খোঁড়া পরিখা। উপরে হয়ত লোহার ঢাকনা। তাকে ঢেকে রেখেছে গাছ লতাপাতার ক্যামোফ্লাজ। তার ভিতর থেকে চোরা কাঁটা-তারের বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে মেশিনগান বসিয়ে রেখেছে শত্রুসেনা। স্বয়ম্ হয়ত এমনি করে আনত হয়ে কোন প্লেন থেকে শূন্যে ডুব দেবার মত করে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তৈরী হচ্ছে এই মুহূর্তে।

কেবল জলস্রোতের বদলে বায়ুর সমুদ্র। কেবল ওইটুকুই যা তফাৎ।

কিন্তু এই কজন যোদ্ধা এখন ফ্রণ্ট থেকে নিরাপদ দূরত্বে, দিল্লীর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে না হলেও ফ্রণ্ট থেকে দূরে 'বেজ এরিয়াতে'ও বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।

আবার মনে হল—এদেরও হয়ত শুধু ছুটি কাটানোর সময়টুকুই হাতে এসেছে। মৃত্যুর সম্ভাবনা হয়ত সামনেই আছে। মুরুব্বি বা মোসাহেবীর জোরেই যে এখানে মোহ আর মদিরা আর বিলাস উপভোগ করছে তা না-ও হতে পারে।

মোট কথা স্বাতী অন্যের সাময়িক সৌভাগ্যে হিংসা করবে না। তাতে হয়ত স্বয়মের অমঙ্গল হতে পারে।

নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে স্বাতী হেসে এই হিস্পানী মার্কা সেনানীকে পুরস্কার দিল, হ্যাঁ, আমি সবাইকে ম্যাজিক বর দিচ্ছি। এই নাচঘরের সবাই ইন্দ্রজালের

প্রভাবে সুখী হবে। জয়ী হবে। না হলেও হয়েছে বলে মনে করবে। সেটার দামই সবচেয়ে বেশী।

সিনিয়র অফিসারটি হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—সেটাই ম্যাজিক। আজকের ম্যাজিক সব জিনিসকেই অন্যরকম রং-এ দেখায়। যাতুকর সত্যি কথা বলে না। যা সত্যি হওয়া উচিত তাই বলে। সেটা যদি অন্যায় বলে আমি মনে করি, যাতুকর তবুও সে অন্যায়টার ভার বইতে পিছপাও হয় না। কিন্তু যুদ্ধের যাতুকররা কোন ভারই বহন করে না। অন্যদের ঘাড়ে চাপায়।

সামনে গায়িকা মাইকের সামনে গাইছিল। যেন 'প্রেম জানাও আমাকে' এই কথাটুকু গানের মধ্যে দর্শকদের নিবেদন করছিল। চোখ বুজে যেন স্বপ্ন-ঘোরে সে প্রেম প্রার্থনা করছিল। সম্ভবত স্পট লাইটের প্রখর আলোর জন্য চোখ বুজে রেখেছিল। সম্ভবত এই বিচিত্র লালসাময় পরিবেশকে দৃষ্টির বাইরে রাখতে চাইছিল।

অথচ যারা শুনছিল তাদের বেশীর ভাগই গায়িকার মোহের ঝরণায় যেন স্নান করছিল। সে তো গোলাপী আভার সায়রে ডুবেছিল আর ব্যাকুল-হৃদয় শ্রোতারা কান দিয়ে শুনে চোখ দিয়ে দেখে মুখ দিয়ে তাদের তৃপ্তি আর আনন্দ প্রকাশ করছিল।

যে সব মহিলা উপস্থিত ছিল তাদের হাতির দাঁতের মত শুভ্র সুন্দর মুখের উপর আঁখি দুটির কালো আর ঠোঁট দুটির লাল রেখাগুলিও যেন প্রশংসায় কথা কয়ে উঠতে চাইছিল।

আরো একটু এগিয়ে আমাদের অ্যাডমিরাল এই পরিবেশের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বেমানান বিদ্রোহের মত বলে চলেছে—যুদ্ধ তো বহু, বহু পুরনো খেল। যাতুকররা এটাকে ন্যাশনাল স্পোর্ট করে নিয়েছে। যাতুদণ্ড ঘুরিয়ে সবাইকে বলছে তোমরা হচ্ছ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তোমাদের একটা মহৎ মিশন উদ্দেশ্য আছে। তোমরা ইতিহাস তৈরী করছ। নিয়তিকে রূপ দিচ্ছ। বৃহত্তর সুন্দরতর ভবিষ্যতের কারিগর তোমরা।

আর···আমরা বেমালুম সে সব বাণী হজম করছি।

কিন্তু সুইটি স্বাতী, তোমার ম্যাজিক আমাদের অন্য একটা রসাল জগতে নিয়ে গেল একটু ক্ষণের জন্য। তোমার যাতু অক্ষয় হোক।

এই বলে সে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

২২

বাইরে তখনো গঙ্গার ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। সুন্দর আকাশ। ভীড় আর ভাঙাচোরার অনেক উপরের আকাশ। যেন ধানজমির উপর আঁকাবাঁকা নক্সা কাটার মত মেঘের কতগুলি আঁচড় পড়েছে সেই আকাশে। মেঘের পাড়গুলি বাদামী আর জলন্ত সোনার আভায় ঝকমক করছে।

কচি কলাপাতা সবুজের হাসিতে উদ্ভাসিত আকাশে দু-একটি মেঘ বলাকার মত লীলাভরে উড়ে চলেছে আর শিবের মাথার চাঁদের টুকরোটি এখনি দেখা যাচ্ছে।

একটি রক্তকরবী গাছ ফুলের কুঁড়ির প্রতিশ্রুতি দেখিয়ে সমস্তটা সন্ধ্যা আর স্বপ্নকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। আকাশের চুনী পান্নার জড়োয়া গহনায় সেজে।

ঠিক সেই সময়টিতে স্বয়ম্ও একটা পাহাড়ী সন্ধ্যায় তার গোপন কুঠুরিতে গুপ্ত খবরের প্রত্যাশায় বসেছিল। চোখ কান আর মাথা সজাগ চারিদিকের সম্বন্ধে, বাইরের সম্বন্ধে।

তবু মন বার বার ভিতরে, হৃদয়ের ভিতরে উঁকিঝুঁকি মারে। তখনি সে বুঝতে পারে যে সে মন নিয়ে বেঁচে আছে। শুধু যুদ্ধের একটি যন্ত্র হয়ে যায়নি।

সে ভাবছিল—যুদ্ধের পর কিরকম পরিবেশে ফিরে আসব? অর্থাৎ যদি প্রাণে ফিরি এবং মনে না মরি?

খনির দুর্ঘটনায় শুধু প্রাণ নিয়ে বেঁচে ফেরা কুলীর মত?

অথবা স্বাস্থ্যবান যৌবনবন্ত, কিন্তু সব বিষয়েই স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে? শুধু নিজের স্বপ্নটি বাদে।

স্বাস্থ্য, যৌবন এই দুটি কথা হঠাৎ তাকে যেন একটা ধাক্কা দিল। এই দুটি ধনই হচ্ছে সেই মূলধন যা যুদ্ধে ব্যবহার করতে হয়। করে করে খইয়ে দিতে হয়। হয়ত বা জলাঞ্জলিও।

জলাঞ্জলি, জীবনের কাছে পুষ্পাঞ্জলি নয়।

সে তো দেখেছে যুদ্ধের এলাকা থেকে কয়েক দিনের জন্য ছুটি পেয়ে সৈন্য

আর অভিসারীরা যখন পিছনের এলাকায় লোকালয়ে ফিরে আসে তখন তাদের কি ক্ষুধার্ত চেহারা হয়ে যায়।

অবশ্য সবারই যে তা হয়, তা নয়। কিন্তু যারা ব্যতিক্রম তাদের নিয়েই তো আর সংসার ভরা নয়। বুদ্ধিমান কর্তারাও নানা ব্যবস্থা রাখে তাদের জন্য। কম্‌ফর্ট গার্ল থেকে স্বদেশপ্রেমিক 'এনসা' আর্টিস্টদের মধ্যে মেশানো অন্য ধরনের মেয়ে পর্যন্ত।

এক ধাক্কায় স্বয়ম্ সেই চিন্তাগুলি মন থেকে সরিয়ে দিল। যেন তার সাধনার পথে প্রলোভন দেখাতে এসেছে মায়াময়ী মারমূর্তিরা।

মোহিনী মায়ায় মার এমন করেই ভগবান বুদ্ধের সাধনা ভঙ্গ করতে এসেছিল।

গোপন কুঠুরীর এক কোণে রাখা বৌদ্ধ ভিক্ষুর ছদ্মবেশটাতে স্বয়মের দৃষ্টি পড়েছিল। তাই তার মনে জেগেছিল বুদ্ধ আর মায়াবী মারের কাহিনী।

না।

আরো ছবি মনে জাগে যে।

স্বাতীর সঙ্গেই তো সে গিয়েছিল স্টার ডাস্ট রেস্তোরাঁয়। সেই স্মৃতিটুকু তার সমস্ত যৌবনের সুরভিতে বিভোর হয়ে ফিরে এল এই মুহূর্তে, এই আঁধার নির্জনে।

প্রায় আধো ঘুম, আধো জাগরণের মাঝামাঝি সময়ে। স্বয়ম্ তাকে স্বীকার করবার সাহস রাখে।

নিজের মুগ্ধ মন, মগ্ন চৈতন্যের ইতিহাসে সেই চঞ্চলতা, সেই মাদকতা। সে এই নিঃসঙ্গ নিমেষে তাকে অস্বীকার করতে পারছে না।

বাইরে আকাশ ভরা তারার চুমকী। ছায়াপথ।

মনের ছায়াপথে চমক দিয়ে উঠল স্টার ডাস্ট রেস্তোরাঁর মোহ।

মোহে আর মদিরায় চুর হয়েই তো দলে দলে লোক আসে ওখানে।

তার মত আনাড়ী তরুণও বুঝতে পেরেছিল যে বেচারী স্বাতী সদ্য হাসিখুশী আনন্দের দেশ ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসেছে। সেখানে যুদ্ধ আর বোমার হামলা সত্ত্বেও লোকে আনন্দ করবার সুযোগটুকু ছেড়ে দেয় না। যুদ্ধ করতে গেলে শক্তি চাই। শক্তি পেতে গেলে চাই আনন্দ।

সেইজন্যই তো মহাচীনের নূতন স্রষ্টারা চালু করেছেন "স্ট্রেংথ থ্রু জয়" মুভমেণ্ট। আর এদেশে আমরা গোমড়া মুখ নিয়ে মরে থাকি। তরুণ তরুণীরা

পর্যন্ত ওদেশে সস্তা রেস্টুরেন্টে গিয়েও যা নাচ-গানের স্ফূর্তি পায়, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ করে সহজভাবে তা এদেশে সম্ভব নয়। স্বাতী তাই ক্যাবারে দেখতে এসেছে।

কিন্তু তার তো বুঝতে বাকী নেই, মোটেই বাকী নেই যে সেখানে যারা জমায়েত হয়েছে তারা সবাই হাড়পাকা অভিজ্ঞের দল। সদাই স্ফূর্তি সম্বন্ধে সজাগ। স্ফূর্তির সামান্য আভাসটুকুকে পর্যন্ত নগদ দক্ষিণায় বাস্তব ব্যাপারে দাঁড় করাতে চায়।

হাতে হাতে গোণ মাশুল।
সাথে সাথে কর উশুল।

সাড়া দেয় দু পক্ষই, এত তাড়াতাড়ি যে ইশারাই যথেষ্ট।

সেই পরিবেশে তার নিজের সুরভিত উষার উপস্থিতি সে মোটেই প্রসন্ন মনে নেয়নি। তবু সৃষ্টি হল একটা মোহন মোহ। দুর্বার উন্মাদনা। যদিও সে মনকে বুঝিয়েছিল যে সাদা চোখে উদার মন নিয়ে সব কিছু দেখতে হবে। সইতে হবে। না হলেই হবে তার শিক্ষার হার।

সেই হারজিতের খেলার মধ্যে সে বেশ বুঝতে পারছিল যে দেহ অর্কেস্ট্রার মাতাল ঝঙ্কারে উতলা হয়ে উঠছে। অনভ্যস্ত অপরিচিত জীবন ময়াল সাপের অপলক দৃষ্টির মত তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

ক্যাবারে যেন কবর দিতে চায় মানুষের নির্মল ভালো লাগাটুকুকেও। দিতে চায় মিশিয়ে নোংরা খাদ আনন্দের সোনার সঙ্গে।

আর যে ভোগ ওর নাগালের বাইরে, ধরা-ছোঁয়ার ওপারে সেই বস্তুটি অনেকের ভুলে আসা ভালবাসাকেও সামনে টেনে আনবে। ভুলে থাকা নয় তো সে ভোলা।

সহানুভূতি-প্রবণ মন নিয়ে স্বয়ম্ একবার ভাবল যে এই সব মানুষ শিকারীদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত যৌবন শুরু করেছিল প্রেম দিয়ে। ব্যথা পেয়ে বা ব্যর্থ হয়ে ম্যান-ঈটারে পরিণত হয়েছে। হায়! ভুলে থাকা তো শুধু ভুলে যাওয়াই নয়।

ভুলে থাকা যে ভেসে যাওয়াও হতে পারে।

সামনেই একটি সুগঠিতা তরুণী নাচছে। তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবলে সরবে আহ্বান করছে। দেখ, আমাকে দেখ। আমার দেহ-সৌষ্ঠবে পুরোপুরি দৃষ্টি দাও। মন দাও।

আর,—আর দামও দাও।

দেখতে দেখতে স্বয়মের মন কুণ্ঠায় ভরে গিয়েছিল।

এ তো বন-হরিণী নয়। এ যে বন্য বাঘিনী। এর সুঠাম তনুলতার মধ্যে লুকানো আছে ইংরেজীতে যাকে বলে য়্যানিমাল। এর ছাই ছাই ব্লন্ড চুলের ঝালর, ফ্যাকাশে নীলাভ চোখ, সামান্য উঁচু চিবুক সবই স্বয়মের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে আনছিল।

অথচ সেই নারী অধরাই থেকে যাবে ওর কাছে।

সে অবশ্য সুদূর চাহনি দিয়ে তার মুগ্ধ দর্শকদের যাচাই করে দেখছিল। খুব ঠাণ্ডা হিসাবী নজরে। তার মন সম্ভবত সেখানেই ছিল না।

কিন্তু স্বয়ম কি দেখছিল?

স্বয়ম্ প্রাণপণে তার মনকে সেখান থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। জীবনের প্রথম উষার আলোয় দেখা কিশোরীর দিকে।

সেই শুভ লগ্নে সেই কিশোরীর চাহনিও ছিল সুদূর। আর মন ছিল দিগন্তে। সেই কিশোরী কয়েক বছর পরে পশ্চিমী শিক্ষার পালিশ পাবার পরে তার পাশেই রয়েছে। তার আজকের চাহনির দিকে তাকাতে স্বয়মের কেন জানি না সাহস হচ্ছিল না। স্টার ডাস্ট রেস্তোরাঁয় বসে স্বয়ম্ সেই সন্ধ্যার দৃশ্য পিছনে ফেলে রেখে সেই নীল নির্জন উষাতেই ফিরে যেতে চাচ্ছিল।

তবু সেই নৃত্যগীত-উচ্ছল সন্ধ্যায় তার নজরে ফুটে রয়েছিল উৎসুক যৌবন। উদগ্র কামনা। রক্তমাংসের একটি আঁটোসাঁটো মূর্তি। সময় তাকে এখনো স্পর্শ করেনি। যৌবনের মোহ আর অন্তহীন গোপন রহস্য ঘেরা সেই নর্তকী।

না। স্বয়মের চোখে সে মাধুরী নয় অন্তহীন। সে রহস্য নয় অর্থপূর্ণ।

হঠাৎ স্বয়ম্ মনে মনে রবীন্দ্রনাথের একটি লাইন আবৃত্তি করল—মাটির ভঙ্গুর ভাণ্ড। তার কল্পনা যেন কামনার হাত থেকে এখন নিষ্কৃতি পাবে। কবিগুরুর আশীর্বাদ যে সে পেয়ে গেল এই মুহূর্তে।

সে ভাবতে লাগল—এই দেহ প্রায় বিবসনাই হোক আর সাটিনের আঁটোসাঁটো পোশাকে ফুটিয়ে তোলাই হোক কালিদাস কি একে দেখে টাইট ফিটিং অতিপিনদ্ধ বল্কলে আঁটা শকুন্তলাকে আবিষ্কার করতেন?

দা ভিঞ্চি কি এর মধ্যে মোনা লিসার হাসির রহস্য খুঁজে পেতেন?

টলমল মন আর চঞ্চল দেহ নিয়ে স্বয়ম্ সেই সন্ধ্যাটা সারাক্ষণ অশান্ত হয়ে কাটিয়েছিল। স্বাতী সঙ্গে থাকা সত্বেও।

যে অর্কেস্ট্রার ঝঙ্কার ওর দেহে যৌবনের জোয়ার জাগিয়েছিল হঠাৎ সেটা থেমে গিয়েছিল। আনন্দের সন্ধানে আসা বিলাসীরা হঠাৎ চমকিয়ে উঠেছিল। আর সারা হলটার আলো একেবারে স্তিমিত করে আনা হয়েছিল। একটা মূর্ছাহত রেশ শুধু গম গম করে বিরাজ করেছিল সামান্য সময়। সাইরেন বাজতে স্নুরু করেছিল বাইরে।

কিন্তু সেই অন্ধকার, সেই হঠাৎ থমকিয়ে যাওয়া আবহাওয়া সব কিছু ছাপিয়ে স্বয়ম্ মনুষ্যত্বে জেগে উঠেছিল। স্বাতী, তার সাথী স্বাতী। তার নিরাপত্তার ভার স্বয়মের উপর কেউ দেয় নি। তবু সে এখন দায়িত্বশীল সঙ্গী। সে রক্ষা করবে, সাহস দেবে, পথ দেখাবে।

প্রাণে প্রাণে সে তখন অনুভব করেছিল যে সব মোহ, সব বাসনার উপরে তার দায়িত্ব, নিজেকে মানুষ করে তুলবার দায়িত্ব।

সব চেয়ে বড কথা সেটাই।

সেটাই তাব স্বপ্ন। তারই জন্য সে যোদ্ধা হয়েছে।

ইয়োরোপে আমেরিকাতে দুই পক্ষের কর্তারাই সবাইকে শুনিয়েছিলেন যে এই যুদ্ধটা হচ্ছে মিথ্যা স্বার্থ লোভ প্রভৃতি অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

স্বয়ম্ মনে মনে ভাবল—আমাদের দেশেও এই প্রচার এক এক সময়ে এক এক দলের লোক শুনিয়েছে। আমরা যারা লড়াইয়ে হাড় পাকিয়ে ফেলেছি আমরা এখন কিন্তু শুধু আমাদের পাশের সহযোদ্ধাদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করি না।

অবশ্য একটু বিশ্বাস এখনো করি এই আকাশ, এই গাছপালা, পায়ের নীচের মাটি আর র‍্যাশনকে। কিন্তু হায় সেই আকাশ থেকেও ঝরে ফুলঝুরির মত ভেরী লাইট, ঝুড়ি ঝুড়ি বোম। গাছপালা আড়াল করে আশ্রয় দেয় শত্রুকে। মাটি গোলার ঘায়ে পায়ের তলা থেকে সরে যায়। আর ঠিক কোণঠাসা হলেই দেখি র‍্যাশন গরহাজির হয়েছে।

কিন্তু স্বয়ম্ সে সব অবিশ্বাস্য দুর্ঘটনাগুলির জন্য সব সময়ই প্রস্তুত থাকে। শুধু ভবিষ্যতের উপর ভরসা করাই শক্ত মনে হয়।

এই যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে এবং জয়ের মধ্যেই যে শেষ হবে সে সম্বন্ধে সে এখন নিঃসন্দেহ, তখন হয়ত ফিরে দেখবে গোটা দেশ ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে।

শুধু পরিবর্তিত নয়, ভেঙে চুরে পড়ে যাচ্ছে। যারা যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরবে, তাদের জন্য অপেক্ষা করবে ঔদাসীন্য আর বেসামরিক পথে বেকারি।

মানবজাতির ভবিষ্যতের সম্বন্ধে বড় বড় বাণী আজ যারা দিচ্ছে, তারা তখন ঝোলের বাটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। স্বার্থের সাধনারই জয় হবে।

তবু স্বয়ম্ নড়ে চড়ে উঠল। সে যখন একা, তখনো সে ত একাকী নয়। পরিত্যক্ত নয়। শুধু রাতের আঁধারে মাঝে মাঝে এই সামরিক খোলসটা খসে যায়। তখন একটা বেদনাহত অবিরাম সঙ্গীত রেশ চাঁদের আলোর মত সব কিছু মায়াময় করে তোলে। সঙ্গী বা পরিচিত যোদ্ধাদের মনের বাসনার ব্যাকুলতার বিশ্বাসভঙ্গের আকুলি-ব্যাকুলি তখন তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সে নিজেকে খুঁজে পায়। বাঁচার আশ্বাস পায়।

সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুরই নতুন একটা অর্থ, একটা রূপ প্রকাশ পায়।

পাশের ভরা ক্যান্টিন থেকে অমৃতের মত ফোঁটা ফোঁটা জল খেয়ে সে একটি স্নিগ্ধ শান্ত সন্ধ্যাকে নিজের চারপাশে ফুটে উঠছে বলে মনে করে। সেই সন্ধ্যা ওকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করে। চুপি চুপি অন্ধকারকে ছবিতে ভরিয়ে দেয়। স্বপ্নের শোভাযাত্রা একটার পর একটা রোশনাই জাগিয়ে চোখের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যায়। বেঁচে থাকার বিবর্ণ বিস্বাদ পটভূমিকে আলোয় আলোময় করে তোলে।

এই আলো এখন মনে জ্বলে উঠল অন্ধকার ভেদ করে। আলোকে সে প্রশ্ন করল—তুমি কি কখনো… ?

অসম্পূর্ণ প্রশ্নটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার রেশ ফুরাল না।

—কি, বল না খুলে…

—আমার হবে…তারপর সে অস্ফুট স্বরে যোগ দিল—এবং আমি তোমার।

—তুমি ত আমার আছই, বীর আমার।

—কিন্তু তুমি ত বুঝতে পারছ, আমি কি চাই।

বলেই স্বয়ম্ আপনাতে আপনি জেগে উঠল। না, না। আমি এখনো কিছুই চাই না।

স্বয়ম্ কিছুই চায় না। এখনো নয়। কিন্তু ওই গোপন কুঠুরী একটা আশ্রয়ের বন্দর, আশ্বাসের বাসা হয়ে উঠল। সময়ের আলো-আঁধারিতে মনে মনে সে রহস্যের রসায়নে স্বাতীকে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখল।

কত কাছাকাছি। কত আপনার।

২৩

ভীষণ দাপটে বর্ষণ চলছিল। নরম কাঁচা মাটির উপর ছোট বাসাটার মাথায় যেন আক্রমণের আগের গোলাবর্ষণের ব্যারাজ চলছে। যেন জঙ্গলী গাছপালার উপর ঝরছে সবেগে হাজারো রাইফেলের গুলি। চার পাশে অসংখ্য জলের ধারা নালার রূপ নিয়ে ধেয়ে চলেছে।

আর মাঝখানে স্বয়ম্ভূ।

ওপার থেকে বেশ কয়েকজন স্কাউট খবর এনেছে যে একটু দক্ষিণ দিকে মাইল দশেক দূরে সোনা মিয়া জরুরী খবর পেয়েছে।

কিন্তু সোনা মিয়ার নিজে এ-পাশে আসা ঠিক হবে না। সে মোটামুটি ভদ্রলোক। জাপানীদের চাল সরবরাহ করে। সে এদিক-সেদিক গেলেই ওদের নজরে পড়বে। কাজেই পর্বতকেই মহম্মদের কাছে যেতে হবে।

অতএব পর্বত ব্যবস্থা করতে শুরু করল। সঙ্গে মাত্র দুজন সঙ্গী আর একটা দুই মাল্লার কিস্তি নৌকা।

রাতের অন্ধকারে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকী এই একেবারে ধরাছোঁয়ার মধ্যে, হাতের মুঠোর মধ্যে তারার হাসি ফোটাতে আরম্ভ করেছে। ঝিল্লীর দল সবে বর্ষণক্লান্ত অবসরে প্রাণের নিবিড় আনন্দে নীরব নিশীথিনীকে ভরিয়ে তুলেছে। সেই আনন্দের পটভূমিকায় বাদলা কুয়াশায় ঢাকা পাঁচটি মূর্তি খাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল।

কিস্তিতে ওঠার আগে স্বয়ম্ একবার ভাল করে চারদিকে তাকিয়ে নিল। জোরে ক'বার নিঃশ্বাস নিল। যেন নিঃশ্বাস নিয়ে দূরে অথবা অদূরে কোন গোপন ঘাঁটিতে লুকানো জাপানী টহলদারদের গায়ের গন্ধ শুঁকে নিতে পারবে।

হাওয়া ঠাণ্ডা, ভেজা-ভেজা, কিন্তু ওর মন গরম। একেবারে খটখটে। কিপ্ ইয়োর পাউডার ড্রাই।

চার দিক অন্ধকার। কিন্তু ওর ভিতরে উন্মাদনার আলো। ফ্লেয়ার অব একসাইটমেণ্ট।

ওর প্রত্যেক গোপন অভিযানই যে জীবনের শেষ যাত্রা এমন মনে করে এগোতে হয়।

অথচ সে কথা মনেও স্থান দেওয়া চলবে না।

আবার স্বয়ম্ চারদিকে তাকিয়ে নিল।

আবার। আরো একবার।

হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল শ্রীকান্তের নিশীথ অভিযানের বর্ণনা। স্কুলে পড়বার সময় একেবারে মুখস্থ ছিল।

শ্রীকান্ত ওর কৈশোরের হিরো। স্বপ্নে-দেখা স্বপ্নমাখা বীর। তার অনুকরণ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতে পারত। কিন্তু না এসেছিল সুযোগ, না সাহস।

আজ সেই সুযোগ এসেছে। কিন্তু শুধু কি এই টুকুই। শ্রীকান্তর জন্য সামনে ছিল ভীষণ অন্ধকার আর ভয়াল নদীস্রোত।

স্বয়মের জন্য অপেক্ষা করছে পৃথিবীর মধ্যে কুখ্যাত গ্রেট রিট্রিটের স্মৃতিতে ভরা বনজঙ্গল পাহাড়ের পটভূমি। প্রলয়ের বন্যাস্রোতে শৈবাল দলের মত ভেসে যাওয়া ভেঙে পড়া লক্ষ লক্ষ নরনারী। জাপানী সেনার হাত থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে লুকিয়ে পালানো বর্মী রাইফেলের রক্ষী দল, চিয়াং কাইশেকের চীনা লড়িয়ে দল। যে ব্রিটিশ আর ভারতীয় সৈন্যদল পিছু হটতে হটতে যুদ্ধ করে রিফিউজী অসহায় শরণার্থী দলকে মরতে মরতে সরে আসার একটুখানি সময় করে দিয়েছিল, তারাও জাপানী নামেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল।

দি গ্রেট রিট্রিট—ইতিহাসে এমনটি আর হয়নি। নেপোলিয়নের গ্র্যাণ্ড আর্মির হঠে আসাও তার তুলনায় কম মর্মান্তিক।

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সৈন্যদের পালানোর শোচনীয় দুর্দশা তো স্বাভাবিক ঘটনা। নিরীহ বেসামরিক লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ও মৃত্যুর চেয়ে বেশী দুর্দশা মানবিক দিক দিয়ে অনেক—অনেক বেশী অস্বাভাবিক।

সেই মহাপলায়নের সত্য-মিথ্যা নানা ঘটনা, অসংখ্য অত্যাচারের কাহিনী, জাপানীদের সম্বন্ধে অলৌকিক ভয় আর সীমান্তের আশে পাশের ডাকাত লুঠেরাদের সম্বন্ধে আতঙ্ক রাত্রির মত ঘনশ্যাম পর্বতমালায় ঘেরা ঘন সবুজ নরকের গায়ে গায়ে ছড়িয়ে আছে।

গ্রীন হেল—এমন একটা সার্থক নাম ইতিহাসে হয়নি।

জাপানীরা আহত সৈন্যদের জন্য শুধু একটা তরোয়াল বা বেয়নেটের খোঁচা খরচ করে আর বন্দীদের অমানুষিক অত্যাচার করে—এ কথা জনপ্রবাদে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

তবু শ্রীকান্তকে একবার মনে পড়ল।

জোয়ারের তোড়ে খাড়িতে জল বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের পর ঢেউ কিস্তিতে নাচন ধরিয়ে দিল। স্বয়মের মনে কিস্তির সামনের বসবার জায়গাটার মত দোলা জেগেছে।

সেই দোলায় দুললে চলবে না। তার নিজের নেতৃত্বে এই প্রথম নির্দেশহীন কম্যাণ্ডো অভিযান। লুঙ্গির কষিটি একটু শক্ত করে নিয়ে সে দলকে আবার হুঁসিয়ার করে দিল।

—মনে রেখো আমরা লড়তে যাচ্ছি না। শত্রুকে মারতে যাচ্ছি না। শুধু আক্রান্ত হলেই আমরা গুলি চালাব। কেউ যেন আমাদের দেখতে পায় না, শুনতে পায় না। আমরা মাটিতে লেপটে লতাপাতায় সাপটে থাকব। দাঁড়াব শুধু তখনি যখন গাছের গুঁড়ি আড়াল করবে।

একটি বড় খাড়ির পারে এসে ওরা পৌঁছল। যেমন অন্ধকার তেমনি নিথর জায়গা। নিশ্চিন্ত হয়ে সম্ভবত নামা যাবে।

না। নিশ্চিন্ত হবার ফুরসৎ বরং যুদ্ধে হতে পারে। চোরা হামলায় একেবারেই নেই। হঠাৎ কোথা থেকে মশালের মত ফ্লেয়ার আলো জ্বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে একটার পর আরেকটা জ্বলে উঠতে লাগল। এধার ওধার চারধার থেকে।

জল আর জলা আর জঙ্গল সব হয়ে উঠল আলোয় আলোময়।

সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানি যেন ওকে আর ওদের দলের সবাইকে নগ্ন উলঙ্গ করে দিল। ওরা ত বহু সময়েই বান বা তুফানে উলঙ্গ বা প্রায় উলঙ্গ হয়ে যায়। ওদের পক্ষে নতুন অভিজ্ঞতা নয়। কিন্তু···

কিন্তু স্বয়ম্ভুর পক্ষে একেবারে নতুন। দৈহিক নগ্নতা পুরোপুরি নয়। আর সেই অবস্থাটা এমন কিছু শকিং অর্থাৎ চমকাবার মত নয়। কিন্তু মনের দিক থেকে, মতলবের দিক থেকে একেবারে উদ্ঘাটিত। উলঙ্গ।

পারের কাছের গাছের ছায়াগুলি হেলে দুলে খানিকটা ক্ষণিক আবরণ এনে দিচ্ছে। আলোর ছটায় ছায়াগুলি দুলছে। ওরা ধরা পড়ে গেছে।

হঠাৎ ওর কোমরে হাত চলে গেল। রিভলভারের ছোঁয়া লাগতেই

বিছ্যতের ঝাপটার মত হাত সরে এল। না, না। আমরা ত যুদ্ধ করতে আসিনি। শেষ পর্যন্ত দলের সর্দারেরই ভুল হয়ে যাচ্ছে। ছিঃ!

কিন্তু ওদিক থেকে জাপানীরা ভুল করেনি। তাক করে ওদের একটা মেসিনগান গর্জে উঠল। একটা গুলী কিস্তির খুব কাছে জলে পড়ে জলের ছররা ছড়িয়ে গেল। ভাগ্যিস আগুনের নয়, শুধু জলের।

খুনী খানের এমন অনেক হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অবস্থার মোকাবিলা করার অভ্যাস আছে। সে ছুহাতে বৈঠা নিয়ে নিল মাল্লার হাত থেকে। এক ঝটকায় পার থেকে কিস্তিটা একটু দূরে হঠিয়ে নিল।

এবার গাঁইয়া চাটগাঁইয়া ভাব দেখাতে হবে। সেটাই আত্মরক্ষার বর্ম। চট করে লুঙ্গি কোমর পর্যন্ত প্রায় তুলে নিল। রিভলবারটা ভাল করে ঢাকা পড়ে গেল। তারপর চোস্ত নিজস্ব ভাষায় হাঁকল, আমরা হুজুর, জেলে। জোয়ারে ভুল জায়গায় ঠেলে এনেছে। কসুর মাপ হয়, নিপ্পন হুজুর। গুলি ছুঁড়বেন না।

স্বয়মের খুব ইচ্ছা হল খুনীকে প্রাণদাতা বলে ধন্যবাদ দিতে। নিদেন পক্ষে সাবাস বলতে।

কিন্তু আগুনের আহুতিতে তার নতুন দীক্ষা হয়ে গেছে এই মুহূর্তে। সে শুধু অন্ধকারে খানের কাঁধে একটা হাত রাখল। কথা নয়, কথা নয়, শুধু কাজ।

অনেকখানি দূরে ভাটিতে সরে এসে ওরা পারে নামল। এবার শুরু হবে শত্রুর দখলি এলাকায় গোপন অভিযান।

এত ঘুরে দূরে এসে সুবিধাই হল। মাল্লারা বলল যে, যেখানে নামবার কথা ছিল আর যেখানে জাপানীদের টহলদার আগুয়ান দলের সাড়া ওরা পেয়েছিল তা থেকে আরো পাঁচ মাইল ভিতরে এসে পড়েছে ওরা।

অর্থাৎ জাপানী আগুয়ান সারির পাঁচ মাইল পিছনে। আরো ভালই হল।

তিনজন কাদার মধ্যে নেমে পড়ল। বর্ষা শেষ হয়ে গেছে। তবু সবটা আরাকানের তটভূমি কাদায়-কাদা। আর নদীর পারে হাওরের ধারে কাদা হবে না তো কোথায় হবে।

প্রশ্নটা নিজেকে নিজেই করল স্বয়ম্ভূ। হঠাৎ মনে এল আরেকটা প্রশ্ন। বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা।

নাঃ, আমার সামরিক শিক্ষা এখনো পাকা হয়নি, সে ভাবল। না হলে একথা এখন কেন মনে হাজির হয়? তবু তার মনে এল। তখন ওর বয়স আরো অনেক কম। চোখে ছিল রং আর মনে আদর্শ।

উত্তর কলকাতার কোন সেবাশ্রম সংঘের তরুণ সভ্য। সন্ধ্যার পরে বস্তির ছেলেমেয়েদের এক ঘণ্টা করে লেখাপড়া শেখায়। সেই শিক্ষাটা যাতে বস্তি-বাসীদের মনে গেড়ে বসে আর বাইরের জিনিস বলে কিছু দিন পরে বাতিল না হয়ে যায় সেজন্য ওদেরই ব্যবস্থা করা একটা ঘরে ওরা হ্যারিকেনের বাতির আলোয় পড়াত।

একবার ঘোর বর্ষায় ঘরে জল পড়তে লাগল। ওরা কজন বন্ধু বস্তির মালিকের বিরাট পাকা বাড়িতে গিয়ে হাজির। টগবগে ওয়েলার ঘোড়ার মত ওদের উৎসাহে লাগাম টানবে কে?

বস্তির ভাড়াটেরা গেলে দরোয়ানই ওদের মোকাবিলা করে তর্জন গর্জনের দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করত। নেহাৎ ভদ্রলোকের ছেলেরা এসে হাজির হয়েছে। তাই মালিক সুবিবেচনা দেখিয়ে ওদের দেখা করতে দিলেন।

এবং সব কিছু শুনে উচ্চস্বরে হেসে নিলেন।

নস্যি এক টিপ সশব্দে নাসারন্ধ্রে দিয়ে বলে উঠলেন, আহা, তোমরা ছেলে-মানুষ, স্বামী বিবেকানন্দের সব চেলা। তোমারই বল ভগবানের অভিপ্রায়টা কি। বস্তির ছপ্পর ভেদ করে ভগবানের জল ঝরবে না ত কি মা ভগবতীর দুধ ঝরবে? স্বামীজীই তো বলেছেন—উঠে যাও, জেগে ওঠ। ভাল ঘরবাড়ি খুঁজে নাও। তাই নয়? কই, তোমরাই বল?

সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর ফটোর দিকে নমস্কার।

ওরা রাগে নয়, ঘৃণায় দিশেহারা। উচ্চবাচ্য না করে সোজা তড়তড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল।

আদর্শের পিছনে ধাবমান ওয়েলার ঘোড়া পরাজিত হয় না, পিছু হটে আসে। তাও শুধু আবার তাল ঠুকে এগিয়ে যাবার জন্য।

তাই তো সেদিন ওদের তরুণ দল হাল ছাড়েনি। নিজেরা চেয়ে চিন্তে চাঁদা তুলে খোলার ছাউনী তুলে দিয়েছিল। বিনামূল্যের লেখাপড়া শেখানো অব্যাহত রেখেছিল।

আজ সে এই বাদায় কাদাময় জলাভূমির বাধা পার হয়ে তার নৈশ অভিসার সফল করে আসবে।

সোনা মিয়া। আহা সোনা মিয়া সোনার ধন খোঁচে স্বর্ণভূমি বর্মা মুলুকে। এই নিষুতি রাতের পাঁশুটে অন্ধকারে সোনা কথাটাই যেন আলোর রেখা দেখিয়ে দিল।

ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে নীরবে ওরা যাচ্ছে। কোথাও জনপ্রাণী নেই। যুদ্ধের আওয়ান এলাকায় যারা রাতে ঘোরাফেরা করে তারা হয় টহলদার, না হয় টিকটিকি। কারো জীবনেরই দাম একটা বুলেটের চেয়ে বেশী নয়। কিন্তু সেটাই নাকি সব চেয়ে ভাল দাম। হানাদারের হাতে জীয়ন্ত ধরা পড়লে আরো কি সব হতে পারে তা নিজে জানা নেই, কিন্তু শোনা আছে।

কিন্তু সে সব অমানুষিক ব্যবহারের কথা জলা-জঙ্গলের বা ঘুমন্ত গ্রামের প্রকৃতি তোমায় মনে মনে কচলাতে বারণ করছে।

কাঠের পায়ার উপর দাঁড় করানো বাসাগুলির দরজা বন্ধ। শান্তিতে সুপ্তিমগ্ন ছবি সব। কলা পেঁপের বাগিচা আর বাঁশবন আর সুপারীকুঞ্জ একেবারে বৈষ্ণব কাব্যের পরিবেশ তৈরী করে রেখেছে। সাহিত্যের ছাত্র স্বয়মের সেসব কথা মনে না আসার উপায় নেই।

কিন্তু আজ সে একটা ডিসিপ্লিনে শৃঙ্খলার কাঠামোতে ঋজুভাবে বাঁধা, একটা বিশেষ শিক্ষায় দীক্ষিত। সে অতীতকে ভুলে যায়নি, তাকে ফেলে চলেছে বর্তমানের ভিতরে। ভবিষ্যতের অভিমুখে।

এমন অবস্থায় কি করতে হবে সে সম্বন্ধে কেউ দেবে না কোন নির্দেশ। কোন হুকুম। কিন্তু ফলাফল দিয়ে তোমার বিচার হবে। যত কম খুশী কাজ কর বা যত বেশী অকাজ কর, বলবার কেউ নেই। তেলে-জলে মানুষ স্নেহের আঁচলে নিভন্ত দীপশিখার মত আড়াল করে রাখা সাধারণ বাঙালীর পক্ষে কত সুবিধাযুত, কত মনের মত অবস্থা।

কিন্তু না। এমন অবস্থাতেই স্বয়মের সবচেয়ে বড় ব্যবস্থার অবকাশ এসে গেছে। চারদিকের নিস্তব্ধ পরিত্যক্ত ভাবটাই সন্দেহজনক। কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই।

পতিত পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত—না, এখন গীতগোবিন্দ নয়। শঙ্কা এখানে চলবে না।

ঠিক কথা। জাপানীরা নিশ্চয়ই গ্রামটা দখল করেছে আর সব বাসিন্দাকে ভাগিয়ে দিয়েছে। বোধ হয় সোনা মিয়ার উপরই নজর রাখছে। বোধ হয় বুঝেছে যে ওর মতিগতির উপর একটা হুঁশিয়ারী পাহারা রাখা দরকার।

উত্তেজনায় মন ভরে গেল।

এই তো আসল জীবন! যার কোন নোঙর নেই। নির্দেশ নেই; কিন্তু নিশানা আছে। যার কোন দায় নেই; অথচ দায়িত্ব আছে।

শেষ পর্যন্ত সোনা মিয়ার দেখা মিলল। একটা পরিত্যক্ত গোয়ালঘরের গরুগুলি চলে গেছে জাপানীদের ভোগে। আর এখন সেটা লাগছে মিত্রশক্তির গুপ্তসেনার কয়েক জন দড়িছেঁড়া টহলদারের সাময়িক কাজে।

অন্ধকারে দুটো সবল কিন্তু উত্তেজিত হাত ওর হাত আঁকড়িয়ে ধরে শেক হ্যাণ্ড করল। হাতের ভঙ্গির চেয়ে ধরার ভঙ্গিতে স্বয়ম্ একটা ইঙ্গিত পেল। নির্ভেজাল আন্তরিক সহাযতার ভাব। আশ্বাস আর বিশ্বাসে ভরা।

কেরোসিনের কুপী জ্বালিয়ে তার উপর লাল কাগজের ঠুলি পরিয়ে ওরা মাটিতে রাখল। কোন্ দিন কত চাল দেওয়া হয়েছে, চাল যোগাড়ের আর পাচারের সময়, কোন্ কোন্ পথ দিয়ে কত পরিমাণ গেছে, কোন্ কোন্ গ্রামে বা জলাভূমি বা বাঁশবাগান থেকে কত বস্তা হালকা করেছে; কোন্ খাড়ির পারে বা কটি বস্তিতে চাল চলাচল করছে এসব একটা হাতে আঁকা মানচিত্রের উপর দাগ দিয়ে স্বয়ম্ ঠিক করে নিল। দরকার মত সাংকেতিক ঢেড়া মেরে নিল।

হীরা দিয়ে হীরা কাটতে হয়। সোনা মিয়ার সোনাতে আজ খাদ নেই হয়ত। তবু যুদ্ধের গতি কোন্ পথে গেলে কোন্ খানে কতটুকু খাদ মিশে যাবে তা খোদাই জানেন।

হপ্তায় হপ্তায় সরবরাহের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল দেখে সে প্রতি কিস্তির বাড়তির পরিমাণ আর কোন্ দিকের চালানে কত বাড়ছে তাও লক্ষ্য করে নিল।

আশ্চয। আশ্চর্য।

দুর্ভিক্ষের শহর কলকাতা থেকে চালের চোরা পাচারের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে আর সে চালান কোথায ছড়িয়ে পড়ছে তার হিসাবও কি শত্রুর গোপন টিকটিকিরা এমনি ভাবে নিচ্ছে?

মা ফ্যান দাও, দুটি ফ্যান দাও মা, বড় পেটের জ্বালা—এই করুণ কান্নার পাশাপাশি হয়ত কয়েক জোড়া হিসেবী চোখ অলক্ষিতে চরে বেড়াচ্ছে। এবং আমাদের দেশের অনাহারী লোক কালোবাজারীর কথাই শুধু ভাবছে। শুধু মজুতদারের মুণ্ডপাত করছে মনে মনে।

কিন্তু হয়ত দেশের নিরাপত্তাও যে এই চালের হিসাবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তা কি কারো নজরে আছে?

থাক থাক, দেশের কথা আর দেশের কান্না দূরে থাক। তার উপর তো সে ভার, সে দায়িত্ব কেউ দেয়নি। আজ তার কর্তব্য শুধু ভি ফোর্সের প্রতি।

এখানে এখনি সে যা আবিষ্কার করতে পারছে মিত্রশক্তির আওয়ান হামলার পক্ষে তার দাম হবে অসীম। শত্রুসৈন্য কি পরিমাণে র‍্যাশন পায় বা পেতে অধিকারী তা ওদের জানা আছে। ওদের উপর হুকুম আছে টু লিভ অন দি ল্যাণ্ড—যেখানে আছ সেখান থেকে খাবার যোগাড় করে নাও। কিন্তু যদি যোগানের বন্দোবস্ত করতে পারে জাপানী সৈন্যের কম্যাণ্ডাররা তা অবহেলা করে না।

পকেটে আছে এন্তার জাপানে ছাপানো ভারতীয় নোট আর বেয়নেটে আছে এস্পার ওস্পার ফুঁড়ে দেওয়ার মত শানদার ধার।

মনের ভিতরে এত উত্তেজনা আর মুখের উপরে আরাকানী বাসার গায়ে মাটির প্রলেপের মত শান্ত আলপনা।

ইচ্ছা হচ্ছে যেমন একাই সে এই সব খবর হিসাব করে আবিষ্কার ক'রেছে তেমন একাই ছুটে যায় ওইসব দুশমণের ডেরায়। তাদের সস্তা জঙ্গী পোশাক, অযত্নে কাঁধে ঝোলানো রাইফেল আর পায়ের বুড়ো আঙুলের অংশটাতে আলগা করে বানানো ক্যাম্বিসের বুট—এসবের মাঝখানে তেড়েফুঁড়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে। তাদের মিঠে মিঠে আঠালো ঘাসের গন্ধে ভরা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রিভলভার তুলে জঙ্গী হুকুমের হুমকি দিয়ে ওঠে—অল হ্যাণ্ডস আপ।

কিন্তু সে আজ আর সাদামাঠা ভেসে-যাওয়া জীবনের প্রতিনিধি নয়। সামরিক জীবনের আটঘাট-বাঁধা প্রতীক। একটা নূতন শিক্ষার ফসল।

এবার ফেরবার পালা। কিন্তু একটা খবর এখনো বাকী। যে পথ দিয়ে সে প্রথমে আসবে বলে ঠিক করেছিল সেখানে জাপানী টহলদার আছে। তার সঙ্গে কতজন আছে? তার পিছনে নিশ্চয়ই একটা ঘাঁটি থাকবে। ম্যাপের রেখাচিত্রে সেদিকে কোন চালান গেছে বলে মনে হয় না। যদি তার কাছ থেকে সুবিধাজনক সহায়ক খবর পায় তাহলে ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেণ্ট সেদিক দিয়ে এগোবে।

ফিফ্‌থ ডিভিসন এগিয়ে বর্মায় ঢোকবার জন্য কোমর বাঁধছে।

এখন কি করা যায়?

এমন হতে পারে যে শত্রুরা ওইদিকেই ঘাঁটি পেতেছে আর সৈন্যদল সরিয়ে এনেছে। রসদের লাইন ওদের খোঁজ পাবার একমাত্র লাইন নয়। তাছাড়া সম্ভবত ওরা মতলব করেই আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্য চাল চালান নিচ্ছে এক জায়গায় আর পাচার করছে অন্য জায়গায়।

জাপানী সেনাদলে জাতবিচার নেই। যে পিঠ অস্ত্র বয় সে পিঠ বস্তাও বইতে পারে। বিশেষ করে যদি তা রসদ হয়। ভারতীয় সৈন্যদলের মত ধর্ম জাত প্রদেশ ব্যবসা এসব প্রভেদ আর দুর্বলতার বালাই নেই। ওদের একটিই ধর্ম : দেশ।

আবো একটি কথা জানা দরকাব। স্থানীয় লোকদের জাপানী সেনাদের প্রতি কিরকম ভাব। তার উপব মিত্রশক্তির এই ভূখণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঢং ও জনবল নির্ভব করবে।

স্বয়ম্ সোনা মিয়াকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল।

সোনা মিয়া নিঃসঙ্কোচে বলল যে আজকাল সবাই হচ্ছে উঠতি সূর্যের উপাসক। মনে মনে না হলেও বাইবে। যে জিতছে তার দিকে ঢলাই জগতের নিয়ম।

আব জাপানীবা যে চালটা মুর্গীটা নিয়ে নিচ্ছে তা যে শুধু দায়ে পড়ে নিচ্ছে সে কথা বুঝিয়ে দিতে কসুর কবছে না। বলছে যে শাদাবা তো শান্তিব সময়েই শুধু লুঠেব মহান নীতি দেখিয়ে সব কিছু নিয়ে নিয়েছে। দেশে পাঠিয়ে দেশকে বড়লোক বানিয়ে ছেড়েছে।

আমবা কিন্তু শুধু বৃহত্তর সহ-সমৃদ্ধির এলাকা তৈবী কবছি। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই সব সম্পদ তোমাদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দেব। জাপান দুশো বছব আগের বিলেত নয়। আমাদের নিজেদেরই সব আছে। শুধু তত দিন যদি আমাদেব সৈন্যদের চাল আর অন্যান্য জিনিস যোগান দাও তাহলে তোমাদের কোন মুশকিল নেই।

জাপানীরা আরো বোঝাচ্ছে যে জান তো, আমরা নিজেরাও তোমাদেরই ধর্মের লোক। আর সব ধর্মকেই আমবা শ্রদ্ধা করে চলি।

আর যদি কোন লোক তোমাদের মধ্যে শাদাদের চর থাকে আমাদেব শুধু জানিয়ে দিও। আমরা তাদেব উচিত রকম দেখাশোনা করব।

এই পর্যন্ত বলে সোনা মিয়া একটু কেশে বলল, কিন্তু আমাদের একটি মুশকিল হয়েছে হুজুর। জাপানীরা বর্মীদের বুঝিয়েছে যে কোটি কোটি কালাকে বর্মা থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে ওরা শুধু বর্মীদেরই কল্যাণের জন্য।

তা ছাড়া আরাকান থেকে চাটগাঁইয়াদেরও তাড়াবে মগদের মঙ্গলের জন্য। ওদের জার্মানী দোস্ত হিটলার নাকি লেবারাম না কি একটা কথা চালু করেছে। হাত-পা মেলে আরামসে থাকার বাসা আর ব্যবস্থা সবই জাপানীরা বর্মী আর

মগজের জন্ত করে দেবে। তাই ওরা এক রকম তাদের হাত করে নিয়েছে।

এই বলে সোনা মিয়া লুঙ্গির গেঁজে থেকে দুয়েকটা ছাপানো ইস্তাহার বের করে দেখাল। গাঁয়ে গঞ্জেও এগুলো বেটা বাটুরা বিলি করছে।

সোনা মিয়ার নিজের টান যে কোনদিকে তা বুঝতে বাকী রইল না একটুও। জার্মানদের ভাষায় 'লেবেনসরাম' অর্থাৎ হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচার জমি বর্মাতে যে বর্মীদের জন্যও থাকবে না তা বর্মীরা এখন বুঝবে না।

অতএব ওকে এখন বাকী প্রশ্নটা করা চলে। 'জিফ'দের প্রতি স্থানীয় লোকদের মনোভাব কি? এবং ওরা সংখ্যায় কত?

এবার কিন্তু সোনা মিয়ার জবাব দিতে কোন উৎসাহ দেখা গেল না। শুধু মাথা নেড়ে বিড়বিড় করতে লাগল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের মিত্রশক্তি তাচ্ছিল্য করে জিফ এই ডাকনাম দিয়েছে। অথচ ওরা জাপানীদের সঙ্গে এসেছে বলেই আক্রমণকারীর নিষ্ঠুরতা থেকে বর্মা অনেকটা বেঁচে গেছে। ওদের জাপানীরা নতুন জায়গা দখল করতে যাবার সময়ে প্রায়ই আগে ঠেলে দেয়। অথবা আগুয়ান লাইনে পাহারা দিতে টহলদারী করতে অনুরোধ করে। ওরা এদেশী লোককে ভাল চিনবে ভাষা বুঝবে এই অজুহাতে।

অবশ্য মনে মনে জাপানীরা জানে যে নেতাজী সুভাষের স্বাধীনতার আহ্বানের আকর্ষণেই বর্মীরা তার সেনাদলকে সাহায্য করে।

স্বয়ম্ প্রশ্নটা আবার করল। খানিকটা ইতস্তত করে। তবু করল। কর্তব্য যখন সামনে, আনুগত্যের শপথ যখন বুকের মধ্যে তখন দুর্বলতার কোন ঠাই নেই। নিজেদের সেনাদলের কাজে লাগবে এই খবর।

সে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যখন শুনল যে এই এলাকাতে ওরা বিশেষ নেই এবং ওদের রসদের ব্যবস্থা পাকাপাকি কিছু নেই।

পাল্টা প্রশ্ন করল সোনা মিয়া—হুজুর, আপনি কি ওদের কোন সুলুক সন্ধান পেয়েছেন?

স্বয়ম্ উত্তর দিল না।

শুধু মনে মনে ভাবল যে খাড়ির পাড়ে যদি জাপানীর বদলে জিফ পাহারাদার থাকত তাকে হয়ত ভি ফোর্সের ভবলীলা সেখানেই সাঙ্গ করে নিতে হত।

বিকিনি স্নানের পোশাকের মত বলতে পারা যায়। সিকিটা ঢাকা, বাকীটা খুলে রাখা।

যেটুকু প্রকাশ করা তার মধ্যেই যথেষ্ট ইশারা। যেটুকু রাখা ঢাকা সেটুকুই আসল। নারীদেহের মত।

আমার কারবার বিকিনি নিয়ে।

এই উপমাটুকু মনে করে স্বয়ম্ খুব হেসে নিল। নিজেকে সমঝাল যে সে এখনো বেঁচে আছে।

পুরুষ সিংহ হতে সে চেয়েছে। কিন্তু প্রায় শৃগালের মত তার গতিবিধি। শুধু চোরা খবর, গুপ্তি হামলা আর মগজ খাটিয়ে কুড়িয়ে বাড়িয়ে যোগাড় করা মালমশলা দিয়ে হিসাব তৈরী।

তার গোপন কাজ হচ্ছে এই।

সে ভি ফোর্সে সাময়িকভাবে ভলাণ্টিয়ার হয়ে এসেছে। খুব গোপন, খুব দরকারী কাজ এই ফোর্সে। তাতে যেমন বিপদ তেমনি বাহাদুরী।

তবে সবটাই পর্দার আড়ালে। রঙ্গমঞ্চের রং নেই, ঢং নেই। এমনকি রাজা-উজিরের সাজগোজও নেই।

অথচ ভি ফোর্সের কাজের উপর নিভর করছে অন্যান্য সব ইউনিট আর ডিভিসনের সাফল্য। বিশেষ করে জলায় জঙ্গলে যুদ্ধে জাপানীদের সঙ্গে এঁটে ওঠা ভি ফোর্সের কাজ আর খবরাখবর ছাড়া একেবারেই অসম্ভব।

ইয়োরোপে মিত্র শক্তিরা ফার্স্ট আর্মি কম্যাণ্ডো, রয়্যাল মেরিন কম্যাণ্ডো এরকম বিশেষ বাহিনী তৈরী করে কাজ চালিয়েছিল। কিন্তু জার্মান সাবমেরিন সে সব শিক্ষিত বাহিনী জাপানী রণাঙ্গনে পৌছতেই দিচ্ছে না।

কিন্তু স্বয়ম্‌দের নতুন গড়া ভি ফোর্স আসাম বর্মা সীমান্তে দারুণ কাজের কাজ করে যাচ্ছে। তার মধ্যে যেমন বিপদ তেমনি বৈচিত্র্য।

আর ওরা যেটুকু খবর যেমন ভাবে পাঠায় তার মধ্যেকার রস থুড়ি মধু সংগ্রহ করতে হলে মৌমাছি হওয়া দরকার। অথবা বলা চলে মাতাল হওয়া দরকার।

মাতাল যেমন করে ঠেকা দিয়ে থাকবার জন্য ল্যাম্পপোস্ট লেপটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তেমনভাবেই মিটিমিটি প্রকাশিত খবরটুকুতে ঠেকা দিয়ে নিজের অনুভূতি অনুমান এসবকে কাজে লাগাতে হয়। শত্রুপক্ষের পাহারাদারকে এড়াতে হয়।

কিন্তু ভি ফোর্সের খবর বা গুপ্ত যুদ্ধগুলির রিপোর্ট পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে স্পেশ্যাল ডেসপ্যাচে দিল্লী লণ্ডন পৌঁছবে না। যারা আত্মরক্ষার জন্য বা শত্রু ঠেকানোর জন্য হয়ত বুদ্ধি আর ক্ষিপ্রতা ছাড়া কোন হাতিয়ারই ব্যবহার করতে পারবে না তাদের নাম, তাদের কীর্তি থাকবে একেবারে গোপন। স্রেফ যুদ্ধের প্রয়োজনেই।

তবু স্বয়ম্ সব দিক দিয়ে নিজেকে জীবনযুদ্ধে শুধু বিকশিত নয়, প্রকাশিত করবে। তাই সে এই কাজে নিজে যেচে এগিয়ে এসেছিল। সাময়িকভাবে এই বদলীটুকু করিয়ে নিতে বেশ চেষ্টা করতে হয়েছিল।

ময়ূর শিখী পাখা মেলে নিজেকে শুধু বিকাশ করে না, ময়ূরীর সামনে তাকে প্রকাশ করে। রঙের ছটা ছড়িয়ে বৈচিত্র্যে ভরিয়ে নিজে আত্মহারা হয়ে নাচতে থাকে। নাচতে নাচতে আত্মনিবেদনের মধ্যে প্রেম আহরণ করে। কিন্তু তার আগের প্রস্তুতি পর্বের মধ্যে থাকে গোপন সাধনা।

শুধু কম্যাণ্ডোর হামলায় তাই স্বয়মের আর মন ভরছে না। যদি একটা জাপানী বুলেটে সে ইহলোক থেকে লোপাট হয়েই যায়, সম্মানের তালিকায় রোল অব অনারে তার নাম জ্বলজ্বল করে উঠবে কি না তা সে জানে না। স্বাতীর সামনে খবরের কাগজে যে যুদ্ধের খবর বের হবে তাতে জানতেও পারবে না স্বয়ম্ তাতে নিজে ছিল কিনা। তার অবদান কি ছিল।

অ্যাডভেঞ্চার, বৈচিত্র্য, ধরাবাঁধা মারা আর মরার ছকে যে যুদ্ধের ছবি আঁকা থাকে তার বাইরের নতুন আস্বাদের জন্য সে এই দলে এসেছিল। তার প্যারাট্রুপ ফোর্সকে এখন শুধু বসে থাকতে হচ্ছে বলেই সে এই সাময়িক বদলী নিতে পেরেছিল। তা ছাড়া এই অভিজ্ঞতা প্যারা ফোর্সেও ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

কিন্তু এখন অন্য কিছু আস্বাদ করতে হবে। নিজেকে যদি তুলে ধরতে না পারলাম তবে জীবনের প্রকাশ কোথায়?

সে শুধু খবর সংগ্রহ আর সরবরাহ, শুধু স্কাউট প্রশিক্ষণ আর তাদের নিয়ে পর্যবেক্ষণ, কিস্তি আর সাম্পান সরবরাহ বা তাতে চড়ে আঘাটায় অভিযানে আর তৃপ্ত হতে পারছিল না। এমন সময় একটা অপ্রত্যাশিত সুবিধা এসে গেল।

একটা বড় রকমের হঠাৎ হামলার ব্যবস্থা হয়েছে। ওর সবগুলি চেলাকেই

এই কাজে বিভিন্ন উপদলের সঙ্গে ভাগ করে করে যোগ করে দিতে হবে। মন্ত্রগুপ্তি শুধু নয়, বেশ কয়েকদিন থেকে এক সঙ্গে হঠাৎ আক্রমণই এই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল।

বেশ কয়েকটা নতুন ইউনিট এসেছে। জঙ্গলী সবুজ তাদের ইউনিফর্মের রং —যা থেকে পরে এরকম সৈন্যদলের 'সবুজ বেরে' (ফরাসী টুপি) এই নামই হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর তীব্র উৎসাহে তারা সবুজ নরককে হলদে দুশমনের হাত থেকে উদ্ধার করে আবার সাম্রাজ্যের স্বর্গে ফিরিয়ে আনতে ছটফট করছে।

আর এসেছে নিকষ কালো কিছু আফ্রিকান ইউনিট। ৮১ নং ওয়েস্ট আফ্রিকান ডিভিসনের সেনাদল। তাদের বুকে রেজিমেণ্টের নিশানা দেখলেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার যোগাড়। হলদে জমির উপর কালো বীভৎস মাকড়সার ছবি, সেই মাকড়সা যার কামড়ে দুরারোগ্য উৎক্ষেপ অর্থাৎ নাচন রোগের মড়ক ছড়িয়ে পড়ে আফ্রিকা মহাদেশে।

আড়ালে আবডালে থেকে পিছনে বা পাশে সরে এসে বাঘের মত হঠাৎ হামলা করে শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করা আর গুটিকয়েক মাথা খসিয়ে দিয়ে গা ঢাকা দেওয়া ওদের পূর্বপুরুষরা একটা শিল্পকৌশলের মত অভ্যাস করত। সেই খেলার মাতনে ওদের উৎসাহ দেখে কে। ওদের হাতের লম্বা ধারালো দা আফ্রিকার জঙ্গলে গাছের নীচের গুঁড়ি আর মানুষের ঘাড়ের উপরের শির দুটোই সমান অবহেলায় সাবড়িয়ে দিতে পারে।

ওদের দলের নায়ক থাকত প্রায় সবই ইংরেজ। জাতে ও জীবিকাতে সৈন্য বা ন্যাশনাল অ্যাক্টের নাম লেখানো বেসামরিক ইংরেজ এন '-ও। ভারী সামরিক সম্ভার, সিগন্যালের যন্ত্রপাতি আর যানবাহনের সবটাই দলপতি শাদার হেফাজতেই থাকত। কালোরা শুধু যন্ত্র।

ওদের দেখে স্বয়মের মনে হল যে বর্ণবৈচিত্র্যের এমন বাহার বোধহয় সংসারে কোথাও হয়নি। শাদা অফিসার আর কালো সৈন্য এসেছে বাদামী লোকের দেশকে হলদে দুশমনের হাত থেকে উদ্ধার করতে। শিল্পী বিধাতার নিজের হাতের রঙের তুলিগুলি একটি পটে এনে জড়ো করা হয়েছে।

মনে পড়ল প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় রক্তকরবী নাটকের অভিনয়। নাটকের উক্তি : সুন্দরের হাতে রঙের তুলি দিয়েছে বিধাতা।

রক্তকরবীর কবিকে প্রণাম করবার, তাঁর শুভ্র হাসিতে পুরস্কৃত হবার সৌভাগ্য

পেয়েছিল সে জীবনে একবার। তিনি আজ ওকে এই রক্তের খেলায় মাততে দেখলে কি বলতেন ?

থাক। থাক সেসব কাব্য আর বর্ণালীর কথা। আমরা সবাই লড়াইয়ের পরিখার খাতে লুকিয়ে গ্রিনেডে হাত রেখে উপুড় হয়ে পড়ে থাকি। তবু কারো কারো চোখ তারার দিকে হঠাৎ চলে যায়।

মোট কথা এবার সে সৈন্যদলের সঙ্গে অভিযানে যাবার অনুমতি পেয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের শেষ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে যাবে, প্রয়োজনে লড়বে। এবং ওর দলের স্থানীয় রংরুটরাও সবাই যাবে। প্রত্যেক ইউনিটের সঙ্গে ভাগাভাগি করে।

লুঙ্গি ছেড়ে ওরা সবাই খাকি পরে নিল। বেসামরিক পোশাকে ধরা পড়লে ফিফ্‌থ কলাম পঞ্চম বাহিনীর পরিণতি যে কি হয় তা স্বয়ম্ এত উত্তেজনা আর তাড়াহুড়োর মধ্যেও ভোলেনি।

হঠাৎ একটা কথা ওর মনে হল। নানা জাতের আর দেশের লোকে তৈরী এই ইউনিটগুলির সঙ্গে ওর চেলাদের ভাগ করে দেবার সময় কাদের সঙ্গে কাদের ভাল বনে তা ভেবে দেখা দরকার।

কলকাতা নাকি কসমোপলিটান শহর। কিন্তু বাঙালী কলকাতায় বা বাঙালী সমাজে মানুষ হবার মধ্যে সেই বিশ্বমুখীনতার বিশেষ কোন শিক্ষাই হয় না। নানা দেশের নানা দৃষ্টিভঙ্গি বা বিভিন্ন রুচি রীতিনীতির প্রতি সহানুভূতি বা শ্রদ্ধার কথাও হঠাৎ মনে আসে না।

এমনকি বিশ্বকবির ভাষা ছেড়ে কলেজে ইংরেজীতে কথা বললেই অনেকে ট্যারা চোখে তাকাত। কেবল উত্তর কলকাতা ছেড়ে দক্ষিণে উঠে আসার পরেই এই আত্মমুখীতার কথা তার মনে হয়েছিল। তাও মাঝে মাঝে।

তার আগে পর্যন্ত ছত্রিশ জাত কথাটার মধ্যে মোজায়েকের মহিমার চেয়ে তাচ্ছিল্যের তলানিটাই বেশী নজরে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমুখীন অনুভব আর গান্ধীজীর নিখিল ভারতীয় মহামানবতা সত্ত্বেও।

এই যুদ্ধক্ষেত্রেও যেখানে জাত আর বর্ণের আর দেশের পার্থক্যের জন্য মৃত্যু কোন পরোয়া করে না—সেখানেও ভেদাভেদ ভোলা সহজ নয়। কিন্তু সবার বড় হচ্ছে কর্তব্য। আর সেই কর্তব্য সাধনে যেন বাধা না আসে। যেন মানুষের মনের মেশিন মোলায়েম সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সহজে চালু থাকে।

চাটগাঁর স্কাউটদের মুখে আফ্রিকানদের সম্বন্ধে হাবশী এই ডাকনামটা যেভাবে

উচ্চারিত হয় তাতে সে বুঝেছে যে তেলে জলে মিশ খাবে না। হাবশীদের গোগ্রাসে হাপুস হুপুস করে খাওয়া সম্বন্ধে স্কাউটদেব বিদ্রূপ ওর নজর এড়ায়নি। তা ছাড়া ওদের দিলখোলা হাসি আর হৈ-হল্লা গুপ্তি কারবারে দীক্ষিত স্কাউটরা যে পছন্দ কববে না তাও স্বাভাবিক।

তাই সে ওদেব সঙ্গে চাটগাঁযের স্কাউটদের দিল না। নিজে কয়েকজন বর্মী স্কাউট নিয়ে আফ্রিকানদেব ইউনিটগুলির সঙ্গে এগিয়ে গেল।

খবর এল যে মগ গুপ্তচবদেব দেওয়া পথেব হদিস পেয়ে জেনাবেল সাকুবাইয়ের সেনাবাহিনীব একটা ব্রিগেড তানাহাসিব নেতৃত্বে ব্রিটিশ সেনাদলের পাশ কাটিয়ে পিছনে পৌছিযে তাদের বেকাযদায় ফেলেছে। মিত্রশক্তির সপ্তম ডিভিসন জাপানী ফাঁদে পড়েছে।

কিন্তু তানাহাসিব এই পাশ দিযে এসে পিছন অববোধ কি কবে সম্ভব হল? স্বয়ম্ আর অন্যান্য ভি ফোর্সেব অফিসাববা কেন আগে থাকতে জাপানী অগ্রগতিব খবব পায়নি?

পবে সব টুকবো টুকবো পাঠানো খবব খুঁটিয়ে দেখা গেল যে ওরা যেসব খবব আব সন্দেহজনক অনুমান পাঠিযেছিল তাতে কোব কম্যাণ্ডেব ইনটেলিজেন্স স্টাফ কোন গুরুত্বই দেযনি। নিজেবা যে এগিযে যাবাব প্ল্যান আঁটছে তারই মুসাবিদায সবাই মশগুল ছিল।

কিন্তু ওদেব অস্ত্র দিযেই ওদেব ঘায়েল কবতে হবে। স্বযমেব দলেব নানা টুকবো টুকবো খবব জড়ো কবে বেব কবা গেল যে পিছনে হাজিব আব মোতাযেন জাপানীদেবও পিছন আছে এবং সেটা —রক্ষিত। এব রাতারাতি সেখানে পৌছানো সম্ভব।

এদিকে সময় মত তাক কবে মিত্রশক্তিব প্লেন থেকে জাপানীদের উপর আক্রমণেব ব্যবস্থা কবা হয়ে গেল। সময়েব নিখুঁত হিসাব দরকাব। স্বয়ম্ অঙ্ক কষে হিসাব কবে জঙ্গল পথেব গতিসীমা ঠিক কবে বিমান আক্রমণের সময় কখন হওয়া উচিত তাব অভিমত দিল।

কিন্তু সম্মুখ সমব চলবে না। মিত্রবাহিনীব প্রধান ভাগ ঘেবাও হয়ে গেছে। শুধু বেড়াজালেব বাইবেব ইউনিটগুলি দিযে পিছন থেকে হঠাৎ হামলা করতে হবে। তাব ফলে যখন শত্রু পিছু ফিবে হানাদা'দর রুখতে যাবে তখন যেন একটা বিবাট বাহিনী হানাদাবী কবতে এসেছে এমন ভাব দেখিয়ে আওয়াজ, ট্যাঙ্ক হাউটজার প্রভৃতির আওয়াজ নকল করতে হবে।

এমনি সময়ে সশঙ্কিত শত্রুর মাথায় ঝরবে মুস্তাঙ্গ নামের প্লেন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা। শুধু তাই নয়। উপর থেকে হিসাব করে রেডিয়োতে শত্রু-সেনার স্থিতি জানিয়ে দেবে। শত্রু অপ্রস্তুত থাকবে বলে ট্রেঞ্চের আশ্রয় পাবে না।

এদিকে সেই রেডিয়োর খবরে নিজেদের গোলার রেঞ্জ সঠিক হয়ে যাবে। যতক্ষণে শত্রুরা বিশৃঙ্খল হয়ে ছত্রভঙ্গ হবে ততক্ষণ ঘেরাও মিত্র সেনা মুখ ঘুরিয়ে শত্রুকে পাল্টা আক্রমণ করবে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে আসল ওস্তাদি হচ্ছে পরিকল্পনার মধ্যে। তার পরে মনে হয় যেন কত সহজ রণকৌশল। অথচ কত চিন্তা করে, সৈন্যসংখ্যা, অস্ত্র-সংখ্যা, বিমানবহর, হাঁটা পথ আর আকাশপথের গতিসীমা, চাঁদের আলোর উদয়-অস্ত, আবহাওয়ার অবস্থা সব কিছু হিসাব করে তবেই এই কৌশল তৈরী করতে হয়।

তেলে জলে মানুষ বেসামরিক ভালমানুষ স্বয়ম্। এই আধুনিক যুদ্ধের একটা পরিকল্পনায় একটা বিশেষ স্থান পেয়েছে।

তার মধ্যে সেই স্বয়মেরও যে অন্তত কিছু—যদিও অনির্দেশ্য—দান আছে তা ভেবে নিজেকে সার্থক মনে করল।

সার্থক। স্বাতী, আমি সার্থক হতে চলেছি।

আরো সার্থক সে বোধ করল যখন যে তিনটি হামলা দল তিনদিক থেকে একই সময়ে এগোবে তাঁদের মধ্যে তার ইউনিটকেই বাছা হল। এবং সে নিজে প্রথম গ্রিনেড ছুঁড়বার জন্য নির্বাচিত হল। তিন ইউনিটই মারবার জন্য, লড়বার জন্য এগোবে। কিন্তু প্রথম মারণ সঙ্কেত দেবে আমি। অর্থাৎ স্বয়ম্।

সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে একবার সে উপরের দিকে তাকাল। ওই লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলমান মিটিমিটি হাসিতে ভাসমান তারামণ্ডলের মধ্যে কোন্‌টি স্বাতী নক্ষত্র? কোন্ নক্ষত্রের সঙ্গে মিলিয়ে অসীম আকাশ থেকে সসীম ধরণীতে আলোকশিখা নেমে এসেছে তার স্বাতীর নাম ধরে?

'অন্ধকারে শেষ নির্দেশ ঘোষণা হল—প্রথমে গ্রিনেড। তার ঠিক পরেই বেয়নেট ঠাসা। তারপর শুধু চপ করে ফেলা অর্থাৎ টুকরো টুকরো করা। বুঝলে সবাই?

বোঝা খুব সহজ। এতদিন জাপানী লুকোচুরি খেলায় ওরা জেনে নিয়েছে যে হঠাৎ গ্রিনেডের দ্বারা আক্রান্ত হলে জাপানী সৈন্যরা নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে

সামলাতে পারে না। বন্দুক তুলে চালাবার আগেই হুমড়ি খেয়ে ওদের উপর পড়তে হবে। সে ক্ষণটুকুর মধ্যেই বেয়নেট নিয়ে ওদের আক্রমণ করতে হবে ঠেসে।

বাকী কাজ যেটা হাবশীরা করবে সেটা হচ্ছে ওদের লম্বা লম্বা দা দিয়ে শত্রুকে টুকরো টুকরো করা। ওদের একান্ত নিজস্ব সাবেকী প্রথা।

স্বয়ম্ পছন্দ করে চার সেকেণ্ড মার্কা ক্ষিপ্রকর্মা গ্রিনেড। অতি ক্ষিপ্র—বিশেষ করে যে শত্রুর মানসিক রিফ্লেক্স প্রতিক্রিয়া খুব তড়িঘড়ি হয় না তার বিরুদ্ধে একেবারে মোক্ষম। কিন্তু এই গ্রিনেড শুধু ওস্তাদদের হাতেই নিরাপদ। অনভ্যস্ত হলে বা গড়িমসি করলে পিন খুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতেই গ্রিনেড ফেটে যাবে।

মনের মধ্যে স্বাতী। কাজের কুয়াশায় অবগুণ্ঠিতা। মাথার উপরে চন্দ্রমা। গাছের লতাপাতার ছায়ায় কার্পেটের নকৃশা কাটা মাটি। কিন্তু দুজনেই আলো ছড়াচ্ছে ঠিক যেটুকু দরকার। উঁচু-নীচু জলাভূমি প্রায় শেষ হয়ে এল। এখন কিন্তু সামনে একেবারে সমতল জমি—নিরাবরণ আর অনিরাপদ।

হাবশীদের অপেক্ষা করতে বলে সে আর খুনী খান হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। চার দিক নিরীক্ষণ করে নেওয়া দরকার। সামনে গোটা কয়েক বাসা দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ শত্রুদলের পিছনের লাইনে হয় পাহারাদারী না হয় খানাদারী কাজ চলছে।

স্বয়ম্ আরো এগিয়ে গেল। কোন সশস্ত্র পাহাবাদার নেই। শুধু কয়েকটা কামান বসানো আছে বাসাগুলির সামনে। গোলন্দাজরা বোধহয় ভোর রাতের কাজ সারতে ব্যস্ত।

চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। শেষ রাতের কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ছে। মোনা লিসার রহস্যময় হাসি সে কুয়াশায়। কিন্তু সে হাসিটি যিনি অমর করে গেছেন তিনি বহু বহু শতাব্দী আগে অসামান্য সামরিক আবিষ্কার করে আর সমর প্রতিভারও পরিচয় রেখে গেছেন।

স্বয়মের এখন মোনা লিসার জন্য সময় নেই।

হাত উপরে তুলে সে হাবশী দলকে এগোতে নির্দেশ দিল। ওরা শয়ান ভঙ্গি ছেড়ে একসঙ্গে যেন একই রশিতে বাঁধা কাঠের বাণ্ডিলের মত উঠে দাঁড়াল। কাঁধ নীচু আর মাথা হেঁট রেখে নিভন্ত চাঁদের আলোছায়া দিয়ে শিকারের অভিমুখে বিড়ালের মত ওরা খালি পায়ে এগিয়ে চলল।

হঠাৎ একটা আলোক দেখা দিল। একটা বাসার দরজা খুলে গেছে। আর সেখানে একটি ইউনিফর্ম পরা মূর্তি।

স্বয়ম্ সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে আক্রমণের নিশানা দিল। আর কয়েক পা এগিয়ে এসে তার প্রিয় চার সেকেণ্ড মার্কা গ্রিনেড অব্যর্থ লক্ষ্যে সেই মূর্তির উপর ছুঁড়ে মারল। যেন দেওয়ালের গায়ে একটা ঢেলা পড়ল সশব্দে। একটা ভয়ের প্রতিচ্ছবি বিরাট বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে আছড়িয়ে পড়ল।

ঝাঁকে ঝাঁকে গ্রিনেড ঝরতে লাগল। জাপানীরা চিৎকার করতে করতে বাসাগুলি থেকে বাইরে বের হতে লাগল আর গ্রিনেড বিস্ফোরণের মাঝখানে ধরা পড়তে লাগল। হঠাৎ হামলার ফলে দিশেহারা ওদের হাতের রাইফেলের গুলীর চেয়ে মুখের গালি বেশী তেড়ে বেরোতে লাগল—বেটা নোংরা রোমশ বেজন্মার দল। ডার্টি হেয়ারী বাস্টার্ড।

স্বয়ম্ চেঁচাল, আর নয়, গ্রিনেড বন্ধ। বেয়নেট চালাও। এখনি চপ করতে শুরু করো না। ডোণ্ট চপ্, এম্ আপ রাইট নাও।

উৎসাহে রক্ত টগবগ করতে লাগল। সহজাত দিলখোলা হৈ হৈ হাসি ওদের স্বভাব। তার বদলে পিলে-চমকানো চিৎকার করতে করতে এখন আফ্রিকানরা তেড়ে ধেয়ে এল।

জাপানী যারা অক্ষত ছিল তারা বন্দুক তুলে নেবে কি, আধো অন্ধকারে নিকষ কালো দৈত্য আকারের মারমূর্তিগুলি দেখে তারা আর্তনাদ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিতে শুরু করল।

সেই আর্তনাদ আর তাজা রক্ত আর বারুদের মেশানো গন্ধে আফ্রিকানরা একেবারে পাগলা হাতীর মত 'মস্ত' হয়ে উঠল। পাগলের মত তারা ভূপাতিত বা মৃত বা জীবন্ত বিচার না করেই জাপানীদের বেয়নেট বিঁধাতে ও তার পর 'চপ' করতে শুরু করল। আধুনিকতম যুদ্ধশাস্ত্রে যে আদিম প্রবৃত্তি আর পুরনো অভ্যাস অচল তা ভুলেই গেল।

অথচ আধুনিক যুদ্ধে প্রতিটি মুহূর্তের দাম আছে।

স্বয়ম্ কড়া হুকুম দিল—যারা জখম আর মৃত তাদের ছেড়ে যারা পালাচ্ছে তাদের ধাওয়া কর।

এমন কঠোর হুকুমে ওরা অভ্যস্ত নয়। সাদা প্রভুর জাতের নয় অথচ প্রভুত্বের হুঙ্কারে হঠাৎ হুকুম দিচ্ছে একজন ভারতীয়। এমন দৃশ্য কখনো দেখা যায়নি।

তবু যুদ্ধক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রই। বিশৃঙ্খল জঙ্গলের নিজের খুশীমাফিক নিয়ম এখানে চলবে না। ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওরা চপ করার সহজাত অভ্যাস ছেড়ে সামনে তেড়ে গেল।

গেল না শুধু একজন। স্বয়ম্‌কে দা হাতে রুখে দাঁড়াল। আর যাই হোক এই বাদামী দলপতি আর হলদে দুশমনে তফাৎই বা কতটুকু। একই রকম ছোটখাটো শরীর, হালকা রং আর নরম স্বভাব। এক ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

হুকুমের তীব্র গর্জনে স্বয়ম্‌ বিভলবার হাতে নিয়ে এগিয়ে এল। দৃঢ় পদক্ষেপে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

সেই স্থির দৃষ্টির সামনে হাবশীর মাথা নিচু হয়ে গেল। হাতেব দা নামিয়ে সে তার সহকর্মীদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। দুয়েক মুহূর্ত পরে ছুটে গিয়ে ওদের সঙ্গ ধরল।

অন্ধকাব এখনো দূর হয়ে যায়নি। ওর পাশ থেকে ছুটতে ছুটতে এল খুনী খান।

এই রকম হঠাৎ হামলার রাত্রি অভিসারে প্রকাশ্যে এমনভাবে ছোটা ঠিক নয়। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ নিয়ম চলে না।

খান নিবেদন কবল যে আর এগোনো ঠিক হবে না। একটু সামনেই জাপানীদের খোঁড়া সারি সারি বাঙ্কার আছে। তার আশ্রয়ে প্রবল ঘাঁটি বানিয়ে ওরা রাইফেল হাতে অপেক্ষা করছে। সংখ্যায় কত তা বোঝার সময় ছিল না।

সামনে এগিয়ে—ওরই হুকুমে ধেয়ে চলেছে আফ্রিকান দল। ওদের নিরাপত্তা ওদের যুদ্ধক্ষমতার সঠিক ব্যবহারের দায়িত্ব ওর। এমন কি যে দুর্বিনীত দুর্ধর্ষ হাবশী ওকেই এখনি শেষ করে দিত তারও জীবন যেন বিনা কারণে বিনা পরোয়াতে নষ্ট না হয় সে দায়িত্বও তার।

স্বয়ম্‌ ছুটে এগিয়ে গেল। এত জোরে যে সাধারণ হুঁশিয়ারীর নিয়মে তা পড়ে না। কিন্তু তারই পরিচালনার উপর নির্ভর করে সামনে ধেয়ে যাওয়া সৈন্যদের নিরাপত্তা।

আই মাস্ট রাইজ টু দি অকেশন।

এবং সে ঠিকই ওই ঘটনার মুখোমুখি মোকাবিলা করতে পারল। এই বিরাট দেহ দীর্ঘ পদ ও দ্রুত দৌড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আশ্চর্য রকম ভাবে সে

তাদের কাছাকাছি গিয়ে পৌছল। তাদের থামাল। কিন্তু তারপর কি করতে হবে?

সারপ্রাইজ দেওয়া অর্থাৎ চকিতে ঝটিতি আক্রমণ আর তো সম্ভব নয়।

এদিকে ভোরও হয়ে এল।

সে ভেবে ঠিক করল এমন ভাব দেখাতে হবে যে হঠাৎ সামান্য একটু হামলা করে তার দল থমকিয়ে গিয়েছে। এবং ভড়কিয়ে গিয়ে ফিরে পালাবার পথ খুঁজছে। বেপাড়ার গলির মুখে হঠাৎ এসে গোটাকতক ইট-পাটকেল ছুঁড়ে সটকে যাবার আধুনিক যুদ্ধ সংস্করণ।

অতএব গোটাকয়েক বাসাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া যাক। ওগুলো যতক্ষণ দাউ দাউ করে ভোরের কুয়াশা-ঢাকা অন্ধকারে জ্বলতে লাগল এদের দলের চোখ ততক্ষণ বাজপাখীর মত শত্রুর পরিখা ঘাঁটির দিকে দেখতে লাগল।

সেয়ানে সেয়ানে লড়াই সংসারের সেরা লড়াই।

ঘরপোড়া আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে জায়গাটা। চেষ্টা করলে হয়ত পেরিস্কোপ লাগিয়ে বাঙ্কার থেকেই এদের লুকানো জায়গাগুলো দেখার চেষ্টা করা যায়। চাই কি কোন গাছের বা পাথরের আড়ালে গা ঢেকে এক-আধজনকে স্নাইপ করারও চেষ্টা করা যায়।

কিন্তু জাপানীরা তা কিছুই করল না। ওরা নিজেদের স্থিতির গোপন আড্ডাগুলি ফাঁস করে দেবে না। এমন কি দুয়েক জন স্কাউট পাঠিয়ে তাদের হঠাৎ সাপটে মারার মত অ্যাম্বুশের বিপদেও ফেলবে না। বজ্জাত হাবশীর দল নিশ্চিন্ত মনে খানিক পরে যখন পিছন ফিরবে তখন বরং দেখা যাবে।

ততক্ষণ বাসাগুলি পুড়তে থাকুক। নিজেদের কিছু মালপত্র আর গোলাগুলি বৃষ্টিতে ভেজার হাত থেকে রক্ষার জন্য সেখানে রাখা ছিল। মানুষের চেয়ে সেগুলির দাম এই দূরদুর্গম সরবরাহ রেখার শেষ প্রান্তে অনেক বেশী। তবুও।

স্ট্রাটেজির জন্য আগাম লোকসানে ক্ষতি নেই।

ততক্ষণে স্বয়মের স্ট্রাটেজিও ঠিক হয়ে গেছে। জাপানী বাঙ্কারের উপর হঠাৎ মর্টার এসে লাগল। সপ্রেমে আলাপের মত ফিসফিস করতে করতে বাতাসে ভেসে যেন মর্টারটা তার লক্ষ্যস্থানে অর্থাৎ প্রেমাস্পদের মর্মে এসে পড়ল।

শাদা শাদা গভীর ধোঁয়ার পুঞ্জ তরঙ্গে তরঙ্গে ফুলে ছড়িয়ে পড়ল। হেলে-

ছুলে সে কুহেলী মালা কুঞ্চিত কেশদামের শোভা নিয়ে যেন মাটির উপরে আর চারদিক ঘিরে মায়াজাল রচনা করল।

একটার পর একটা আরও মর্টার ঝরতে লাগল।

ততক্ষণে সেই মোহিনী মায়ার আড়ালে মেঘনাদের মত বীর হাবশীরা নিঃশব্দে এগোতে লাগল। সেই কুহেলী কমে এলে স্বয়ম্ প্রথম গ্রিনেডটি তাক করে বাঙ্কারের উপর অব্যর্থ লক্ষ্য নিয়ে ঝাড়ল। দলেব সৈন্যরাও সঙ্গে সঙ্গে গ্রিনেড ছুঁডতে লাগল।

তার পরেই এগোল ওরা যমদূতের মত বেয়নেট চার্জ করবার জন্য।

কিন্তু কি আশ্চর্য।

প্রথম সারির বাঙ্কাবগুলি সব খালি। সেয়ানা তো জাপানীরা কম নয়। বাঙ্কাবগুলি লতাপাতায় ঢেকে কামোফ্লাজ কবে রাখা। শত্রুর চার্জ তাতে ব্যাহত হবে। কিছু শত্রু হাঁটু ভেঙে পডেও যাবে।

তবু ওরা দাঁড়বে না। আক্রমণ থেকে ক্ষান্ত হবে না। পবিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই কৌশল আগে থেকে অনুমান করে ওবা দ্বিতীয় সারিব বাঙ্কারে ঘাঁটি বেঁধেছে। আব আশা করছে যে আক্রমণকারী দল নিজেদের ধোঁয়ায় নিজেরা নাকাল হয়ে কাশতে কাশতে কাবু হতে থাকবে।

আব ততক্ষণে জাপানীদের লম্বা নলওয়ালা রাইফেলগুলি ··

কিন্তু হঠাৎ চমকিয়ে দিয়ে হামলা করা একবাবই সম্ভব। মির‍্যাকলের মত সারপ্রাইজও বারবাব হয় না।

অতএব স্বয়ম্ আবার হুকুম দিল। এগিয়ে যাও। হামলা চালাও। নাকে রুমাল চাপা দাও। হাওয়া আব ধোঁয়া শত্রুর বাঙ্কারেব দিকেই বয়ে যাচ্ছে। তাব সুযোগও নিতে হবে।

আফ্রিকানবা যেন মাবণ মন্ত্রে জেগে উঠে যন্ত্রেব মত এগিয়ে যেতে লাগল।

এবার শত্রুর গুলি আবাকানেব বারিধারার মত ছুটে আসতে লাগল। কিন্তু কোন্ দিক থেকে আসছে তা পরিষ্কার হলেও কোন্ খান থেকে আসছে তা বোঝা যাচ্ছে না। কাজেই ধোঁয়ার আডাল থেকে আফ্রিকানরাও গুলি চালাতে যুত পাচ্ছে না।

শেষে বোঝা গেল যে একটা জায়গায় মাটির উপর ধানক্ষেতের আলের মত আল রয়েছে। তারই মধ্যে নানা কোণের মত য়্যাঙ্গল করা ফুটো। সেইসব ফুটো থেকে রাইফেলের নল কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এবার শুরু হল গ্রিনেডের পালা। চড়া বিস্ফোরকে ভরা গ্রিনেড শ্ঁ। শ্ঁ। করে বাতাসের বুক চিরে এগোতে লাগল। কাঁচা মাটির আল আর বাঙ্কারের আড়াল জাপানী অবস্থানকে খানখান করে দিল।

তারপরই শুরু হল বেয়নেটের পালা। বীভৎস উল্লাসে ভোরের আবহাওয়াকে উচ্চকিত করে তুলল তারা। প্রায় আজানুলম্বিত দৃঢ় বাহুর দৃঢ়তর মুঠির বেয়নেট চালনার সামনে শত্রুপক্ষ কেঁচোর মত কুঁকড়ে যেতে লাগল।

এক জায়গায় দুজন জাপানী হাঁটু গেড়ে নিচু হয়ে রয়েছে। যেন আত্মসমর্পণ করতে চায়। কিন্তু ভি ফোর্সের শিক্ষায় অভিজ্ঞ স্বয়ম্ জানে যে এই রকম ভঙ্গি করে ওরা বিপক্ষকে নিশ্চিন্ত হয়ে সামনে এগিয়ে আসতে দেয়। এবং কাছে এলেই আচমকা অব্যর্থ রিভলভার চালায়।

এদিকে ওর সৈন্যরা বিনা সন্দেহে এগোচ্ছে। কাজেই এক লাফে সে এগিয়ে গিয়ে আগুয়ান আফ্রিকানদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাল। সে গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতজানু জাপানীর দল হাঁটুর নীচে লুকানো রিভলভার চালাল। কিন্তু ত্বরিৎগতির রাইফেলের গুলি তার আগেই কাজ করেছে।

তারই পরমুহূর্তে একটা ফক্স হো অর্থাৎ শিয়ালের গর্তের মত লতাপাতায় ঢাকা গর্ত থেকে একটা রাইফেলের নল উঁকি মারল। দলপতির দিকে তাক করে একেবারে মুখোমুখি। খুট খুট।

স্বয়ম্ চোখ বুজে ফেলল।

কিন্তু একি? হঠাৎ ওর আর রাইফেলের নলের মাঝখানে প্রেতমূর্তির মত ধেয়ে এসেছে কে একজন! নিজের বিরাট দেহ দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে দিয়েছে।

সেই দেহ ওরই ওপর ঢলে পড়ল। তার ধাক্কা সামলাতে না পেরে স্বয়ম্ নিজেও ঢলে পড়ল। কিন্তু আশ্চর্য! তার নিজের কি হল? ব্যথা, গুলির ব্যথাটা কোথায় লাগল?

দু হাতে চাড়া দিয়ে উঠতে গিয়ে ওই ভূপাতিত বিশাল দেহের দিকে নজর পড়ল। নিকষ কালো একটি মুখ। রাতের হিংস্রতার বক্ষ নিরাবরণ করে ওই মুখখানা যেন বড় মায়ায় ঘেরা। মমতায় ভরা।

মনে হল সেই মুখের বাতায়ন হয়ে খোলা রয়েছে দুটি নীল পদ্মের মত চোখ। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র বোধ হয় ওরই দেশে যুদ্ধজয়ের আগে দেবীপূজার

জন্য নীল পদ্মের সন্ধান করতে পাঠিয়েছিলেন। সেই পদ্ম দুটি অকালবোধনের পূজায় ধীরে ধীরে মুদে আসছে।

এই সেই হাবশী যে সামান্য ক্ষণ আগে আদেশ অমান্য করে নিজের কম্যাণ্ডারের উপরই দা তুলতে গিয়েছিল।

মুদে আসা নীল পদ্ম দুটির উপর ভোরের নীলাকাশের হাসি-হাসি আলো এসে পড়েছে।

স্বয়ম্ তার মাথা থেকে টুপি নামিয়ে নিল।

জীবন আর জাপানীদের মধ্যে মোট কতটুকু দূরত্ব? কতটুকু তফাৎ?

সেদিনের মৃত্যুর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খণ্ডযুদ্ধের পর স্বয়মের এই প্রশ্নটা প্রায়ই মনে আসছে।

জীবনের চেয়ে বড় কিছুর সন্ধানে সে বাঙালীর তেলে জলে লালিত জীবন থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সেই বড় কিছুর একটি ঝলক সে দেখেছে ওই সম্পূর্ণ অচেনা ভিনদেশী নিকষ কালো নাইজেরিয়ানের চোখে। সেই চোখের শেষ চাহনী সে কোন দিন ভুলতে পারবে না। ভোলা অসম্ভব।

সেই জীবনের চেয়ে বড কিছুব খোঁজেই তো সে নিজে থেকে 'ভি' ফোর্সের ইনটেলিজেন্স অর্গ্যানাইজেশনে অফিসাব হয়ে এসেছিল। ওর দলের প্রায় হাজার জন স্থানীয় লোক বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর জোগাড করে ওকে জানিয়েছিল যে জাপানী সৈন্যদের রসদের জন্য হাজার হাজার গরু-বাছুর আর অস্ত্রশস্ত্র বইবার জন্য অনেক হাতী জড়ো করা হয়েছে।

কিন্তু ঠিক সেই দিনই ব্রিগেড কম্যাণ্ডার ট্রেনিং প্রোগ্রাম আর প্রশাসন সমস্যা নিয়েই নিশ্চিন্তে মিটিং করছিলেন।

তিনি খবরই পাননি যে মিত্র শক্তির ১৭ নং ডিভিশন ঘেরাও হয়ে আছে। এখন তাদের বের করে আনার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে। আবার অন্য দিকে পূর্ব অঞ্চল থেকে দুটো জাপানী ডিভিশন তাড়াতাড়ি আরো এগিয়ে আসছে।

তাদেরই হঠাৎ হামলায় জড়িয়ে পড়ে দুটো পাঞ্জাবী কোম্পানী সৈন্যদলের কি অবস্থা হয়েছিল তা স্বয়ম্ শুনেছে লেফটেনাণ্ট দত্তর মুখে।

স্বয়ম্‌কে বিশ্রাম দেবার জন্য বেজক্যাম্পে সরিয়ে আনা হয়েছিল। সেই ক্যাম্পের হাসপাতালে, মানে বাঁশ আর ইকড়ার অর্থাৎ বেতের তৈবী বাসা হাসপাতালে শুয়েছিল আহত লেফটেনাণ্ট দত্ত। "ওয়াস্‌বি", অর্থাৎ উইমেনস অক্জিলিয়ারী সার্ভিস অব বার্মা অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ার নার্সরা স্বয়ম্‌কে খবর দিয়েছিল যে আরেক জন বাঙালী অফিসার তাদের শুশ্রূষায় ওখানে আছে। তার সঙ্গে

নিজের মাতৃভাষায় গল্প করলে রোগীর পক্ষে ভাল হবে। সহানুভূতির সঙ্গে মাতৃভাষায় গল্প হবে মানসিক দাওয়াই।

বাঁশের চাঁচির খাটিয়ায় শুয়ে দত্ত তার অভিসারের গল্প স্বয়ম্‌কে শোনাচ্ছিল। স্বয়মের নিজের জীবনের সঙ্গে বেশ অনেকখানি মিল রয়েছে।

জীবনের লীলা বড আশ্চর্য।

* * * *

জীবন আর জাপানীদের মধ্যে মোট তুশো গজের তফাৎ।

মাঝে মাঝে মনে হয় বোধ হয় সেটুকুও নয়। জাপানী জিরো বম্বারগুলো জুম জুম কবে নেমে আসে। বাজ-পাখীর মত কঠিন ডাক বরে তীব্র হাঁক দিয়ে ছোঁ মেরে উডে যায়। ফটাশ্‌ ফটাশ্‌ ফট্‌ কবে গুলীর তুবডী ছড়িযে দেয়।

আমবা তুশো জন সৈন্যের তুটো কোম্পানী ট্রেঞ্চের উপর লতাপাতা ডালের ক্যামোফ্লাজ করা ঢাকনার তলায় লম্বা হয়ে কডিকাঠ গুণি।

না। ঠিক হল না। মুখ মাটিব মধ্যে সেঁধিয়ে আমাদের কোল্‌ড মাটন অর্থাৎ ঠাণ্ডা মাংসপিণ্ডটাকে জিইয়ে রাখবার সাধনা করি।

তু-পাশ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে বেখেছে তুটো বিরাট 'বুম' অর্থাৎ পাহাড়ের চূডার লাইন। জংলী গাছ আব লতাপাতায় ভরা এই বুম তুটো পার হয়ে পাশ থেকে আক্রমণ হবে না। জাপানী শত্রুও তা করবে না। আর এই তুই পাহাডের লাইনের মাঝখানের প্রায় সমতল জমিটুকু আমবা আগে থেকেই দখল করে রেখেছি। আমরা মানে আমাদের এই নতুন গডা আনকোরা কোম্পানী তুটো।

এগোবাব আশা নেই। সামনে জাপানী সৈন্যদল চিন্দুইন নদীর বন্যার মত তুর্বাব ভাবে এগিয়ে আসছে।

পেছোবার পথ নেই। পিছনে আমাদেব প্রায় ভেঙে ছনছান হয়ে যাওয়া ব্রিগেড কতগুলো ছোট নদীর উপর রবারের ডোঙা দিয়ে ভাসানো পুল তৈরী করার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ সেই অছিলায় প্রথমে আপনা প্রাণ বাঁচাবার পথ ঠিক করছে।

জিরো বম্বারগুলো পাহাড়ের চূড়োব উপর দিয়ে ডিঙিয়ে এসে বোমা দিয়ে পোলগুলো ভেঙে নস্যাৎ করে গেছে কদিন আগে। গোটা ডিভিশনটাই ইঁতুর কলের মধ্যে ধরা পড়ত; কিন্তু কি ভাগ্যিস ইংরেজ সৈন্যরাই পথ দেখিয়ে আগুয়ান হয়ে যাচ্ছিল।

শ্‌ শ্‌ কেউ যেন না বলে বসে যে ওরা সবার আগে পালাচ্ছিল। ওরা সাম্রাজ্য তৈরী করবার জন্য এগিয়ে এসেছিল প্রায় দুশো বছর আগে। এখনো সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যই পেছন পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

গা বাঁচিয়ে হটে যাওয়াকে হার বলা যায় না। আগুয়ান শত্রুকে পিঠ দেখানোকে পালানো বলা যায় না।

মোট কথা আমাদের এই ব্রিগেডটাই পেছু হটা লড়াইয়ে সবাব পেছনে অর্থাৎ আগে ছিল। আন্‌কোরা রঙরুট সব লাস্ট কাম লাস্ট সার্ভড—থুড়ি লাস্ট সেভড—এতে অন্যায় কিছু নেই।

এই দুটো কোম্পানীই আবার তাব মধ্যে সবার শেষে অর্থাৎ জাপানী বন্যাস্রোতের একেবাবে সামনে সবাব প্রথমে। আমাদের উপর কড়া হুকুম: যেমন কবেই পার ট্রেঞ্চ খুঁড়ে এই ফাঁকটা আটকিয়ে রাখতে হবে। আমাদের উপরই সমস্তটা ডিভিশনের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। আমাদেব অপাবেশন অর্ডারের মধ্যে রয়েছে একটা মহান মিশন।

রেঙ্গুনে যখন প্রথম এ আব পি দল তৈবী হল, সেখানকার অসামরিক লোকরা কি হাসিই না হাসত! বলত—এ আর. পি নয়। ওটাব মানে হচ্ছে এলো রে পালা।

আর আমাদের বর্তমান এই ব্রিগেডের পালানোর তৎপরতা দেখলে বর্মার বাঙালীরা বোধ হয় হাসতেও ভুলে যেত।

কিন্তু আমরাও হাসতে ভুলে গেছি।

এই নো-ম্যানস্‌ ল্যাণ্ডে—যেখানে শুধু আমি আছি আর আমার শত্রু আছে, সেখানে হয় সে আমাকে মারবে অথবা নিজে বাঁচবাব জন্য আমি তাকে মারব। তাই আমরা এই রাতে হাসতেও পাবছি না।

সেদিন ভোরে আমাদের দুটো কোম্পানীব সবে ধন অভিজ্ঞ যোদ্ধা আর ক্যাপ্টেন্‌ একটি জাপানী শেলে ঘায়েল হয়েছেন।

শুধু যদি মরে যেতেন তাতেও ক্ষতি ছিল সাংঘাতিক। কিন্তু ওব ব্যাটল ড্রেসের একটা হাতা শেলের ঘায়ে জামা আর হাত থেকে ছিঁড়ে গিয়ে আমাদের ক্যামোফ্লাজের একটা উঁচু ডালের উপর আটকিয়ে গেছে।

আমরা সামনে তাকাতে সাহস পাই না। ফিল্ড টেলিস্কোপে জাপানীদের নড়াচড়া দেখলেও শিরদাঁড়া সিরসির করে ওঠে। পেছনে তাকালেও ভয় হয় ক্যাপ্টেনের ওই হাতাটা ঝুলতে দেখে।

কোম্পানীর নেতা, একমাত্র ইংরেজ, অপরাজেয় ইংরেজ। তার হাতাটা যে দক্ষিণ দুয়ার দেখিয়ে দিচ্ছে। অন্য কোম্পানীর অফিসার আগেই ঘায়েল হয়েছিলেন।

তাই আমরা ভয়ে কোন দিকেই তাকাচ্ছি না। সারাদিন জাপানীরা ওই হাতাটা তাক করে ফায়ার করেছে। ওটাকে ফালি ফালি করে আমাদের বুকগুলোও ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। ওটারই নিশানা ধরে নিজেদের লাইনের পেছনে যে মেশিনগানগুলো ছিল সেগুলি দিয়ে আমাদের ট্রেঞ্চের লাইনটা টুকরো টুকরো করে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। শুধু আমার চারপাশে এই লাইনটুকু টিকে আছে তখনো।

সেখানেই দু-পাশ থেকে যারা তখনো বেঁচে আছে তারা হামাগুড়ি দিয়ে জড়ো হয়েছে। ফিস ফিস করে, কিন্তু পাগলের মত উত্তেজিত হয়ে বলছে— কি করব, কি করে বাঁচব বলে দিন, লেফটেনাণ্ট সাব। আমিই এখন ওদের অফিসার কম্যাণ্ডিং।

আমি লেফটেনাণ্ট দত্ত, কলকাতায় হগ-মার্কেটের দোকানে সার্ডিন মাছের টিন জানলার পাশে শো-কেশে সাজানো দেখতাম। প্যাক্‌ড লাইক সার্ডিনস কথাটা বইয়ে পড়েছিলাম।

মিলিটারী মেসে খেতে বসে যখন সার্ডিনের ইলিশের মত আঁশটে গন্ধে আকুল হয়ে উঠেছি তখন কিন্তু কথাটির মানে মনে হয়নি। এখন এই রাতে এই ট্রেঞ্চে গাদাগাদি করে আমার জোয়ানরা যখন চারদিকে চেপ্টে আমার কাছে এসে শুয়ে পড়েছে তখন কথাটার মানে মনে এল।

আমি ছাড়া আর কোন অফিসার—ছোট, মেজো, বড় কেউ আর এই কোম্পানীতে বেঁচে নেই।

এমন সময় আবার শেল পড়তে শুরু হল। হঠাৎ ভিজে স্যাঁতসেতে মাটিতেই আমরা মাথা প্রায় কবরস্থ করে শুয়ে পড়লাম। শেল পড়তে শুরু হয়েছে। এই মাটি, এই মাটির ভেজা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ নিয়ে কলকাতায় কত কাব্য করেছি। এই মাটিতে নতুন চেরাই করা কাঠের পরিচিত মিঠে গন্ধ, বসন্তের শরতের বর্ষার আদুরে শিরশিরে পরশ। কিন্তু তারই মধ্যে নতুন একটা অনুভূতি এসে গেল।

হঠাৎ যেন সব চেয়ে তুচ্ছ, সব চেয়ে স্বল্পায়ু জীব হয়ে জগতের তলায় নেমে এলাম। পোকামাকড় যারা হতচ্ছাড়াভাবে মাটিতে হামা দিয়ে বেড়ায় তাদের

চেয়ে বড় আমি কিছু নই। এই ট্রেঞ্চের মধ্যে এই কদিন ধরে শেল পড়া, মেশিনগানের গুলী চলা সব কিছু সত্ত্বেও ওরা নিশ্চিন্তভাবে চলাফেরা করেছে। আমাদের ভয়, চকিত চমক এদের বিচলিত করেনি। মাছি মশারা পরম নিশ্চিন্তভাবে উদাসীনভাবে ভোঁ ভোঁ করে উড়ে বেড়িয়েছে। আবার দু-পশলা গোলা বৃষ্টির মাঝে নিশীথিনীর নীরবতা ভেঙে দুয়েকটা পাপিয়া পাল্লা দিয়ে গেয়ে উঠেছে—পিউ কাঁহা।

এদিকে ততক্ষণে আমরা ফাইটিং নাইফ অর্থাৎ কুকরী দিয়ে আরো মাটি খুঁড়ছি। নীরবে, কিন্তু ভূতে পাওয়া উত্তেজনায়। শ্রাৎ শ্রাৎ শা এক একটা গোলা যেন কান ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই যেমন করেই হোক আরো খানিকটা মাটি খুঁড়ে অন্ততঃ মাথা আর কানদুটো তার মধ্যে সেঁধিয়ে দিতে হবে।

হঠাৎ কুকরীটা হাত থেকে ফস্কে কোথায় ছিটকে পড়ল। টর্চ জ্বালিয়ে দেখা সম্ভব নয়। পাগলের মত দশটা আঙুল দিয়েই আরো মাটি খুঁড়তে লাগলাম। ট্রেঞ্চ হচ্ছে পুরো শরীরের কবর। কিন্তু তাতে কুলোবে না। মাথার জন্য আলাদা আরো গভীর কবর চাই।

হঠাৎ মনে হল এই কান ফাটানো গোলাগুলীই হচ্ছে জীবনের চিহ্ন। এই পাখী, এই পোকামাকড় এরাই মৃত্যু। মৃত্যুর হাতছানি। একবার মনে হল ছুটে এই ক্যামোফ্লাজের ছাউনি থেকে বেরিয়ে যাই। এই গাছপালা ডালের আড়ালই আমাদের আসল দুশমন। উপরের সুন্দর পৃথিবী, আলো বাতাস বসন্ত শ্যামল মাটি আর সুনীল আকাশ এই সমস্ত জীবনের লক্ষণ থেকে আড়াল করে রেখেছে এই শত্রু।

আম্বক সিং অন্য জোয়ানদের চেয়ে বেশী লেখাপড়া জানে। মুখে মুখে অঙ্ক কষে বলল যে, জাপানীরা আমাদের পাল্লা ঠিক মত পেয়ে ফেলেছে। তাই দু-পাশের ট্রেঞ্চের লাইন গুঁড়িয়ে দিয়ে পেছনের পালাবার পথ তছনছ করে দিচ্ছে।

ওদের শেলের পাল্লা হিসাব করে আমাদের উপর কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

মিনিটখানেক পরে বলল, ওই দেখুন, লেফটেনান্ট, গাছগুলো মড় মড় করে উঠছে শেলের বাতাসের ধাক্কায়। ওদের পাল্লা আরো ছোট করে গুটিয়ে আনছে। আর পাঁচ মিনিট।

শুধু মুখটা জোর করে গর্তে সেঁধিয়ে দিলাম।

গ্রীবাল আমার পা জড়িয়ে ধরল, ওই শেলগুলো বর্তানীয়ার স্টীল ওয়ার্কসের তৈরী।

দাঁত চেপে শাসালাম, কি করে জানলে কোন্ স্টীলে ওগুলো তৈরী? চুপ করে পড়ে থাক।

ও শুনল না। ভেজা স্বরে শুকনো গলায় বলল, আমি সায়ান্টিফিক ভাবে যাচাই করে দেখেছি। না হলে অত হাড়-কাঁপানো আওয়াজ হয় না।

ততক্ষণে আরেকটা শেলের টুকরোগুলো আমাদের মাথায় প্রায় উপরে লোহার বৃষ্টি ঝরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু ডালপালা ছাউনী উড়িয়ে নিয়ে গেল।

আর একজন প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠতে গিয়ে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিল। যেন জ্যান্ত কবরের ভিতর থেকে ওর আওয়াজ বেরিয়ে এল—আমার টাক, মেরা গাঞ্জা। আমার টাকটা এত চকচকে যে, জাপানীরা দূর থেকেই ওটা দেখে নিশানা করতে পারবে।

পাগলের মত দু হাত দিয়ে সে মাথার উপর মাটি চাপা দিতে লাগল।

আম্বক সিং একবার মিনতি করে আমায় জিজ্ঞেস করল, মরে যাবার আগে এখান থেকে একবার বেরোবার চেষ্টা করলে হয় না? অর্ডার দিন, অর্ডার দিন, লেফটেনাণ্ট সাব। চুহা কা তবহ্ মবনা নাহি চাহতা।

চুপ—চুপ করে রইলাম। পিছনে ক্যাপ্টেনের হাতের হাতাটা এখনো দক্ষিণের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে কি না কে জানে। একটু পরে বললাম, মরার ভান করে পড়ে থাক, কোম্পানী।

ওর দাড়ি গোঁফের মধ্যে দিয়ে যে কথাগুলি ফিস ফিস করে বেরোল তাদের মানে আমি হলফ করে বলতে পারব না। তবে সম্ভবতঃ আম্বক বলে ছিল, অন্ততঃ ভেবেছিল—শালার অফিসার, ভেতো আর ধুতো বাঙালী। পালাবার হুকুমও দিতে পারে না। ভীতু কোথাকার।

যাই বলে থাকুক, হজম করে গেলাম। আমার নেই বাকী কোন কম্যাণ্ডের জোর। কোম্পানীর নেই কোন ডিসিপ্লিন।

তারপর—তারপর একটা নিরন্ধ্র নীরবতা নামল। সমস্তটা জগৎ, আমাদের জগৎ, আমাদের জীবন জুড়ে। শত্রুপক্ষের শেল দাগা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এই নীরবতা আমাদের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে আনল। এ তো আমাদের চেনা গ্রামের মাঠ ঘাটের শান্তিময় নীরবতা নয়, মধ্যরাতের তারার হাসিতে ভরা

অন্ধকার। আগে যে মৃত-নীরবতা অনুভব করেছি তা ছিল শব্দহীনতা, নিঃশব্দতা। আর এখন মনে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে শব্দ শুনতে পারার অক্ষমতা।

শব্দ যেন আমাদের চারপাশে অরণ্যের হিংস্র পশুর মত ওৎ পেতে অপেক্ষা করছে। ঘিঁরে রয়েছে আমাদের ওই দুপাশের বুম পাহাড়ের চূড়াগুলো, সামনের ওই জাপানীদের ট্রেঞ্চ মায় কামানঘাঁটি, পিছনের ওই ভাঙা পোলের তলায় কলোচ্ছ্বসিত মৃত্যুস্রোতগুলোর সব কিছুতে ছড়িয়ে, জড়িয়ে।

অনেক দূরে হঠাৎ যেন একবার নিঃশব্দতার বুক চিরে একটা মর্টার বা অন্য কিছুর আর্তনাদ বেরিয়ে এল। আমরা চমকিয়ে উঠলাম। সচকিত হয়ে বুঝলাম যে, না, মর্টার নয়।

জাপানীদের কোন ফিল্ড মাইন ওদেরই দলের কারো অন্ধকারে পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে শেষ করে দিয়েছে। না। এও ঠিক শব্দ হল না। এ তো যেন শুধু নিঃশব্দতা কথা কয়ে উঠল। তারপর আবার সব চুপচাপ।

ঈশ্বর নামে যে অর্কেস্ট্রার কণ্ডাক্টর এই পৃথিবীর বিশ্বসঙ্গীতি বাজায় তার হাতের মায়াকাঠিটা স্তব্ধ হযে গেছে।

স্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে সেই মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বন্দনা। পাড়ার মেয়ে বললে কিছুই বলা হয় না। সমস্তটা অঞ্চলের স্বপ্ন। ধনে প্রতিষ্ঠায় শিক্ষায় সবচেয়ে মানী অভিজাতের তরুণী কন্যা।

তার পরের কথাগুলি আর পুনরাবৃত্তি না-ই কবলাম। সে তো বহু বাঙালীর আর্ত অন্তবের আর ব্যর্থ যৌবনের পরাজয়ের পরিচিত কাহিনী। তা শুনতে মধুর; শোনাতে আরো মধুব। আর সাহিত্যিকদের কারো কানে কাহিনীটা একবার পৌছালে তো একখানা উপন্যাসই হয়ে যাবে।

সেই বন্দনা।

সংসারে আর কোন দিকেই কোন সুবিধা করতে পারলাম না। সে বিমুখ ছিল না। কিন্তু কোন্ মুখে তার বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াব? বলব যে তাঁর মেয়েকে পেয়ে জীবন ধন্য করতে চাই। কি দেখাব সম্পদ, দেবো কোন্ পরিচয়?

বাপের হোটেলের দৌলতে দেহ রক্ষা চলে, দেহলী ভরে তোলা যায় না। মুখ চালানো চলে; কিন্তু মুখ্য থাকে না। আর এই যুদ্ধের বাজারে চাকরি একটা জোটানো চলে; কিন্তু বরমাল্যের জন্য যোগ্যতর প্রার্থীর অভাব নেই।

আধুনিকা বাঙালিনীরাও কেমন যেন বরনারীর চেয়ে বীর নারী অর্থাৎ বীরদের গলায় বরমাল্য দিতে উৎসুক হয়ে উঠেছে এই যুদ্ধের বাজারে। শুধু চাকুরে

শান্তশিষ্ট বর আর বরনারীদের প্রার্থনার বর হিসাবে ঠাঁই পাচ্ছে না। মরিয়া হয়ে এমার্জেন্সী কমিশনের জন্য দরখাস্ত করব বলে বন্দনাকে জানিয়েছিলাম।

হেসে বন্দনা উড়িয়ে দিয়েছিল। আর বলেছিল, আহা দেখো যেন ফুলের ঘায়ে মুচ্ছো যেয়ো না। জাপানী ক্রিসানথিমামগুলো আবার তাবড় তাবড় সাইজের হয়। তা নিশ্চয়ই জান, কবি।

কবিতা লেখার জন্য এমন দাম নিশ্চয়ই আর কোন বাঙালী যুবকের দুর্ভাগ্যে জোটেনি।

মনে পড়ল যে কিছুদিন থেকে যত্ন করে ধুতি কুঁচিয়ে পরার দিকে নজর গিয়েছিল। তাতে বাড়তি খরচ ছিল না, ছিল বরণীয় রুচির বিজ্ঞাপন। কোনদিনই কবি কবি চেহারা ছিল না। হ্যাংলা হালকা দেহ অবশ্য ছিল না। কবিদের মত ভাবের তুফানে উড়ে যাবারও ভয় ছিল না। মাথার চুলের প্রাচুর্য আর ঢেউ কবিত্বের অভাব পুষিয়ে দিয়েছিল।

বন্দনা 'এধা: একটা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ কবে বলেছিল, বাইবেলের স্যামসন আর ডিলাইলাব গল্প জান তো। ঝাঁকড়া চুলেব মধ্যেই স্যামসনের যত জোর ছিল। তুমিও বোধ হয় চুল ঝাঁকড়িয়েই জাপুদের···।

সইতে না পেরে সরে এসেছিলাম। আমি কবি দুর্বল, অপদার্থ। তাই মুখ ফুটে এটুকুও বলতে পারিনি,—দেখে নিয়ো তুমি, একদিন সত্যি যুদ্ধ জিতে ফিরে আসব। সেদিন পর্যন্ত তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কবো।

কিন্তু আমি পেছন ফিরে রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দনা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ও যেন নতুন আর কেউ। গভীরভাবে বলেছিল, আমি তো রইলাম ওই জানলার গরাদের ওপারে বন্দিনী। যদি তুমি বীর হও, যদি তুমি বড় হও ··

তারপর সেও মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিল। শিকের ওপারে বন্দিনী। এমনভাবে আর কোনদিন সে নিজের মনকে খুলে দেখায়নি। আমায় অবশ্যই এমার্জেন্সী কমিশন যোগাড় করতে হবে।

* * * *

বো-ও, বো-ও, বো-ও করে বোমারু বিমানগুলো আমার চারদিকে নেমে আসছে। তাক করে, নির্ঘাৎ আমাকেই তাক করে নেমে আসছে। না, শুধু যে নেমে এল তা নয়, আমায় চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। উপরে নীচে পাশে সর্বত্র। কিন্তু আওয়াজ খুব বেশী নয়। বোধ হয় হঠাৎ হামলার জন্য

ইঞ্জিনগুলোতে সাইলেন্সার লাগিয়ে নিয়েছে। আর ঝুম ঝুম করে মেশিনগান থেকে বুলেটও ছুঁড়েছে না। বোধ হয় জীবন্ত বন্দী করে নিয়ে যাবে। আর বিদ্যুতের মত গতিতে আমাকে ছাড়িয়ে পিছনে ফেলে এগিয়েও যাচ্ছে না। শুধু আমার চারদিকেই বো-ও, বো-ও করে ঘুরে ফিরে তাকাচ্ছে। যমদূতের ষাঁড়গুলো সম্ভবতঃ এরকম করেই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কোথায় আগুনের হল্কা ভরা গুলী, কোথায়? এর চেয়ে আমায় না হয় একটা নাইন-পাউণ্ডার বোমা দিয়েই সাবড়ে দাও।

আমি আছি রাজী
অভিসারে সাজি
মরণ মহোৎসবে……

আরো কি সব কবিতা লিখেছিলাম। সত্যি আমি আজ রাজী আছি। কই, নাইন-পাউণ্ডার একখানা ঝেড়ে দাও।

* * * *

অস্থির হয়ে তন্দ্রা ভেঙে উঠে পড়লাম। কোথায় বন্দনা, কোথায় বোমারু বিমান। চারদিকে শুধু মশার দঙ্গল, কামান দাগছে। বো-ও, বো-ও করে দলে দলে নেমে এসে কামড়াচ্ছে, আবার উড়ে যাচ্ছে। মশার হাত থেকে বাঁচবার জন্য মশারী, মুখ ঢাকবার জাল, সিট্রোনেলা মলম সবই কম্যাণ্ড থেকে দিয়েছিল। সেসব লটবহর চাপিয়ে বড়দিনের রাতে স্যাণ্টা ক্লজের মত মূর্তি নিয়ে বর্মা ফ্রণ্টে রওনা হয়েছিলাম বটে। কিন্তু এখন শুধু সাবমেশিন গান আর জান নিয়েও পালাতে পথ পাচ্ছি না।

ধড়ফড় করে উঠে পড়লাম। একটা ভেরী লাইটের হাউই উড়িয়েছে জাপানীরা আমাদের লাইনের পিছনে। সবুজ সবুজ, টকটকে সবুজ আলোর একটি ফোয়ারা যেন আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। ফিল্ড টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে প্রাণপণে সামনের দিকটি নজর করে দেখলাম। আমাদের ট্রেঞ্চের ঠিক সামনে ওই দুশো গজ দূরে মেশিনগান বেশ জুৎসই করে বসানো হয়ে গেছে। তাদের নলের চোঙাগুলো যমদূতের দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। রক্ত-চক্ষু থেকে আগুন একবার ছাড়লেই হল।

সবই পরিষ্কার হয়ে গেল। অত যে শেল ছোঁড়া হচ্ছিল সেটা শুধু বাইরের আবরণ। শেলের ছাতার আড়ালে মেশিনগান বসানো হচ্ছিল। আজ শেষ রাতেই · শেষ রাতেই।

তার আগে আমাদের একটু ধোঁকা দিয়ে ঠাণ্ডা করে ভুলিয়ে রাখার জন্যই ওই নীরবতা। ততক্ষণে জাপানীরাও বোধ হয় একটু খেয়ে জিরিয়ে নিয়েছে। এইবার।

ওই ভেরী লাইটের সবুজ আলোয় শ্যামকান্তি বুম আর বনজঙ্গলকে ভাসিয়ে ওরা একবার যাচাই করে নিল এই ট্রেঞ্চ ছাড়া আমাদের আর কোন ঘাঁটি বা নতুন সরবরাহ করা রি-ইনফোর্সমেণ্ট আছে কিনা। এইবার।

একবার আমার ব্যাটল ড্রেসের উপর কাঁধে বোনাই করা তারা, আমার অফিসার পদের চিহ্ন তারার উপর হাত বুলিয়ে নিলাম। মা যেমন করে তার শিশু সন্তানের কপালে হাত বুলিয়ে তাকে রক্ষা করতে চায়। তারপর অন্ধকারেই কোম্পানীর বাকী সব সৈন্যদের ফিস ফিস করে তৈরী হবার অর্ডার মুখে মুখে চালু করে দিলাম।

ওরা হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেল। পালাতে চেয়েছিল; তাব হুকুম দি৻ত পাবার মত হিম্মত হয়নি। বাঁচতে চেয়েছিল; মরবার ভান করে পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছু হুকুম দেবাব সাহস হয়নি। আর এখন কিনা বলছি পেটে হামাগুড়ি দিয়ে বেয়ে বেয়ে ট্রেঞ্চ থেকে উঠে ওই মেশিনগানের নীড়গুলো দখল করতে হবে।

আম্বক সিং অবিশ্বাসেব সুরে জিজ্ঞেস কবল, সত্যি, অফসার সাব, সত্যি? ওরা কিন্তু কচুকাটা করে ফেলবে মেশিনগান চালিয়ে।

দাঁতে দাঁত চেপে হিস হিস কবে বললাম, ঠিক সেই জন্যই হামলা করব এখনি। এখনই ওই মেশিনগান নেস্ট দখল করব। ওগুলির মুখ ও... ট্রেঞ্চের দিকে ঘুরিয়ে ফায়ার করব। কোম্পানী-ই-ই—অ্যাডভ্যান্স।

নিরন্ধ্র অন্ধকার আমাদের চারদিক থেকে পিষে শ্বাসরোধ করে দিতে চাচ্ছে। তবু হামা দিয়ে হামলা করতে এগিয়ে চলেছি। আমায় আমার নেতাহীন কোম্পানী অন্ধের মত অনুসরণ করে চলেছে।

আমার সামনের জায়গাটা যেন একটা অন্ধকারের চলন্ত ঢ্যালা। আমার সঙ্গে সঙ্গে সামনে দিয়ে সাঁতরে সাঁতরে এগিয়ে চলেছে। একবার ভয়ানক প্রস্রাব পেল; মাত্র একবার। তারপর চেপে গেলাম। হাজার আষ্টেক ফুট উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়াগুলো ইস্পাত-নীল আকাশে মাথা তুলে চোখ তুলে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। দুপাশে মহামার বোমায় উৎখাত জংলা জমিগুলিতে যেন ছায়ায় ছায়ায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তাদের নজরের সামনে কি……? ছিঃ!

পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে আমৃক সিং, আসছে গ্রীবাল, আসছে গোটা নিউ পাঞ্জাব লাইট ইনফ্যান্ট্রির 'সি' কোম্পানী। ওরা আমায় ভেতো আর ধুতো বলেছিল, ভীতু ভেবেছিল। ওদের পালাতে হুকুম দেবারও সাহস আমার ছিল না।

আর পিছনে আরো কে যেন আসছে। না। পিছনে নয়, সামনে। না, সামনে নয়, চারপাশে।

বন্দনার বর্ণনার ওই বড় বড় ক্রিসানথিমাম ফুলগুলো নয় তো? একবার ওর মুখখানা মনে করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সময় হল না। জানলার গরাদের ওপারে বন্দনা বন্দী হয়ে আছে। ওকে মুক্ত করে আনতে হবে। আমার যৌবনের পরম রাত্রির চরম অভিসার।

এবার মেশিনগানগুলোর প্রায় সামনে এসে পড়েছি। আর পেটে পেটে হাঁটা নয়। একবার হাঁটুতে হাতেতে চাপ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। হঠাৎ আবার একটা ভেরী লাইটের হাউই আকাশে উড়ে গেল। সব সবুজে সবুজ। আশার রঙ, আশ্বাসের রঙ। মেশিনগানগুলির সামনে, একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে হুইল ঘুরিয়ে ওগুলোর মুখ ঘুরিয়ে দিলাম।

মুখোমুখি। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। বন্দনা জানলার গবাদের ওপারে বন্দিনী। আমার হাতে তার কাবাগার ভাঙবার অস্ত্র। ট্রেঞ্চের জমাট সোঁদা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ আর নাকে লাগছে না। ক্রিসানথিমামে গন্ধ আছে না কি? তার সাইজ কত বড়?

থাক। হিসেবে দরকার নেই। কোম্পানী-ই, ফা-য়া-র।

২৬

নরম ঠোঁটের উপর লিপস্টিক বুলিয়ে নিয়েছিল স্বাতী একদিন ওর সামনেই।

আশ্চর্য, লিপস্টিক বুলানোটা যে এত আদরের, এত সাধনার ধন মনে করে সুন্দরী তরুণীরা তা স্বয়ম্ আগে কখনো বুঝতে পারেনি।

প্রিয়প্রসাধনরতা নাগরীদের বর্ণনা সে বহু সংস্কৃত কাব্যে পড়েছে। ছায়াছবিতে দেখেছে। একবার—একবার তা সে নিজের ওষ্ঠের উপর অনুভবও করেছে। প্রথম কদম ফুলের শিহরণ জাগানো সেই অনুভব।

আজ কিন্তু স্বয়ম্ নিজেই সেদিনের মমতা আর সাধনার সঙ্গে লিপস্টিক বুলানোর নিগূঢ়তা উপলব্ধি করল। দিক্‌বধূর ওষ্ঠের উপর। বহু যত্নে, বহু মমতায়, বহু ব্যাকুলতা ভরা নিষ্ঠায় সে ফিল্ড গ্লাস চোখের উপর রেখে ঘোরাচ্ছিল।

ওপারে, চড়াইয়ের ওপারে সূর্য ঢলে পড়েছে। তার লালিমা ইভনিং ইন প্যারিসের 'অরেঞ্জ মিস্ট' অর্থাৎ কুয়াশা মাখা কমলা রঙের লিপস্টিকের কথা মনে করিয়ে দিল। স্বাতী ওই ছোট্ট রঞ্জনী আধারটা ওকে দেখিয়ে বলেছিল—অরেঞ্জ মিস্ট, এই রঙের শেডটা বোধ হয় এদেশে এখনো আসেনি।

বলেই একটু মিষ্টি হেসে নিজের ঠোঁটে পরম আবেশে একটু বুলিয়ে নিয়েছিল।

আজ যুদ্ধক্ষেত্রে আগুয়ান এলাকায় স্বয়ম্ যেমন করে মাথা হেলাচ্ছে তেমনি করে মাথা ডাইনে বাঁয়ে মৃদু হেলিয়ে হিসাব করে কমলা রঙের কুয়াশা নিজের অধরোষ্ঠে বুলিয়ে নিচ্ছিল স্বাতী। এখন সেটা মনে পড়ল।

নিমেষের একটু মন্ত্র গুঞ্জরণে স্বয়মেব মনে হল স্বাতী নক্ষত্রেরই সন্ধানে সে এখন মাথা হেলিয়ে নিচ্ছে। আর দিগন্তে, দূর দিগন্তে বুলিয়ে নিচ্ছে ··।

লিপস্টিক নয়, ফিল্ড গ্লাস।

এটুকু মিত্রশক্তির সব কটা আগুয়ান ইউনিটই বুঝতে পেরেছে যে জাপানী সৈন্যদল ওদের আউট ম্যানোভার করে ফেলেছে। তাদের সঙ্গে সম্ভবত আছে 'জিফে'র দল অর্থাৎ জাপানীজ ইণ্ডিয়ান ফোর্স।

সেটাই আরো বেশী চিন্তার কারণ। যদি ব্রিটিশ আর মার্কিন ফ্রন্ট লাইনের পিছনে দেশের লোক জানতে পারে যে সুভাষ বোসের নেতৃত্বে ভারতীয় সৈন্যরা জাপানী সহায়তা নিয়ে ভারতে ঢুকে পড়েছে তাহলে ইংরেজ ও আমেরিকান পক্ষের আর রক্ষা নেই। ওদের সমরসম্ভার থাকতে পারে অফুরন্ত। কিন্তু সাপ্লাই লাইন লোপ পেয়ে যাবে।' এমন কি গান্ধীজীর কংগ্রেস আন্দোলনেরও আর প্রয়োজন হবে না। যারা তাতে যোগ দেয়নি তারা পর্যন্ত রুখে দাঁড়াবে। কুইট ইণ্ডিয়া স্লোগান আর শুধু স্বাধীনতার জন্য দাবীর ধ্বনি থাকবে না। আসমুদ্র হিমাচল প্রত্যেকের মর্মবাণী হয়ে উঠবে।

যুদ্ধ চিরকালই চলে শুধু সৈন্য নিয়ে নয়। সরবরাহ বিহনে সৈন্য অচল। জাপানীরা অবশ্য দেখিয়েছে কেমন করে সাপ্লাই লাইন ক্ষীণ হয়ে গেলেও "লিভিং অন দি ল্যাণ্ড" জমির উপরে খেয়ে পরে লড়াই করা যায়। তারও আগে চীনেরা দেখিয়েছিল যে শুধু মাত্র তিন দিনের রসদ চাল বন্দুকের গুলির মত 'ব্যাণ্ডোলিয়েরে' ঝুলিয়ে নিলেই পুরো সরবরাহ হয়ে গেল। ব্রাহ্মণের পৈতের মত কাঁধের পাশ থেকে বুকের উপর ঝুলবে চামড়ার বেল্ট। তাতে বারোটা গুলি আর বারুদ রাখার ব্যবস্থা। মাস্কেটও তা থেকেই ঝুলবে। আর চীনেরা তার সঙ্গে যোগ দিল তিন দিনের খোরাক চাল। ব্যাস, এবার তুমি সাপ্লাই কোর নামক প্রতিষ্ঠান ভুলে যাও। যাকে বলে, নিজের ব্যবস্থা নিজে করে চরে খাও।

অবশ্য দায়ে পড়ে ইংরেজরাও এখন ভোল পালটিয়েছে। সাম্রাজ্যই টলমল, তার ভোলকে সামাল দেবে কে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একটা আর্মি কোরের কম্যাণ্ড নেওয়া ছিল লাট-বেলাটের মত এলাহি কারবার। প্রথমেই দখল কর একটা 'স্যাটো' অর্থাৎ প্রমোদ প্রাসাদ, অশ্বশালা, মোটর বাহিনী, আরো কত কি। সমস্ত 'কোর' খুঁজে সেরা রাঁধুনী আর সহিস আর স্তোফার হাজির করতে হবে। জেনারেল সাহেব উদয় হবেন মাত্র জন তিনেক এ. ডি সি. আর সাতাশ মণ নিজস্ব লটবহর নিয়ে।

হায়! সাম্রাজ্য আজ ধুকধুক করছে। তাই জেনারেল স্লিম জাপানীদের রুখতে যখন কম্যাণ্ড নিলেন তখন সঙ্গে মাত্র তিনখানা শার্ট, তিনটে খাকি প্যাণ্টালুন, একটা গুর্খা হাট আর এক বাণ্ডিল বিছানা। একজন মাত্র পার্সোনাল স্টাফ যার হাতে একটি টমি গান আর একটা বাড়তি মেস টিন।

ঢাকাই কুট্টিদের রসিকতায় ভরা মাটির সরার মত। খাবার থালা আর মাথার টুপি থুড়ি মুখের জল দু কাজেই লাগতে পারে।

আপাতত স্বয়ম্‌ও বলতে গেলে একখানা খুদে জেনারেল। অর্থাৎ নিজের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব। এবং সেই কর্তৃত্বের সাফল্যের উপর নির্ভর করছে এই সেকটরে মিত্র বাহিনীর অগ্রগতি। খবর আছে যে সামনের পাটকাই গিরিমালার কতগুলি চূড়াতে জাপানীরা মেশিন গান নেস্ট অর্থাৎ সংক্ষেপে এম. জি. বাসা বেঁধেছে। ঠিক পাখীর বাসার মত। সেগুলির স্থিতি ঠিক না করতে পারা পর্যন্ত সৈন্যদের এগোবার পথ ঠিক করা যাবে না। আর বোমারু বিমানও পাঠানো যাবে না। গহন পাহাড়ী জঙ্গলে ক্যামোফ্লাজের দরকারই নেই।

সেজন্যই কয়েকটা ও. পি. অর্থাৎ অবজার্ভেশন পোস্ট বসানো হয়েছে। সেগুলির দায়িত্ব আর সেখান থেকে প্রয়োজন মত সামরিক স্কাউট বা শাদা-মাটা স্থানীয় লোক বা সন্ধানী লোক পাঠানোর দায়িত্বও তার। সে সযত্নে নিজের চাহনী বুলিয়ে নিচ্ছে দিগন্তে। বেশ হুঁশিয়ারীতে, শেষ হিসাবের মত সাবধানে।

চকিতে চকিতে খবরের প্রতীক্ষা আর খবরের সূত্র ধবে ধরে তার শিকড়ের মূল পর্যন্ত পৌছানোর মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ অবসর সময় এসে হাজির হয়। তখন বসন্ত বাতাসের দমকা যেন নিকট অতীতের উপর থেকে যবনিকাটাকে টেনে সরিয়ে দিয়ে যায়।

এই নিষ্ঠুর নরকে পায়ে হেঁটে হেঁটে বা জীপের আছাড়িপিছাড়ি দোলায় দুলতে দুলতে হঠাৎ যেন পিছনে ফেলে আসা স্নিগ্ধ সমতল ভূমির প্রান্তরেখা দেখতে পায়।

সামরিক কাজকর্ম তো সাহিত্য আর জীবনকে একেবারে পুরোপুরি ঢেকে দিতে পারেনি। তাই ফিল্ড গ্লাস দিগন্তে বুলোতে বুলোতে কেমন করে লিপ-স্টিকের কথা মনে এসে গেল। কেমন করে ক্ষণিকের জন্য সরসতায় ভরিয়ে দিল মন।

না। স্বয়ম্‌ বেঁচে আছে। সামরিক শৃঙ্খলা আর সংযম আর দলগত নৈর্ব্যক্তিক ভাব তাকে নিঃশেষ করে দেয়নি।

এই একটি নিমেষ—যখন ধরণী আর অম্বর একাকার হয়ে চাঁদের হাসিতে স্নিগ্ধ সুন্দর হয়ে রয়েছে তখন, মাত্র একটি নিমেষ সে নিজেকে খুঁজে পেতে চায়। একটু পরেই হয়ত সন্ধানী দলের লোক না ফিরে এলে নিজেকেই বের হতে হবে। আর দেরী করা হয়ত ঠিক হবে না।

তার হঠাৎ কেন জানি না রামের বনবাসের কথা মনে এল। তিনিও কি

এমনি করে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে কেবল বাহুবল ও মানসিক সাহসের উপর ভরসা করে ঘুরে বেড়াতেন ?

তাঁরও তো শত্রুর অভাব ছিল না। রাক্ষস দানব যাদের বলা হত তারাও আসলে মানুষ ছিল। অলৌকিক্ কিছু নয়। তবে তারা আর্যদের শত্রু ছিল। বহু বিপদ ও বাধা সৃষ্টি করে জঙ্গলে বিচরণ করত। তবুও রাম এমন একটি সন্ধ্যায় দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—

চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিত-তারকা
অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতু স্বয়মম্বরম্।

আহা অন্তরাগে রঞ্জিত সন্ধ্যা চঞ্চল চন্দ্র-কিরণেব স্পর্শে হৃষ্ট হয়ে নক্ষত্র মেলে ধরেছে। এখন সে নিজেই আকাশ ত্যাগ করুক।

সাহিত্যিক মন একটা কোমল ভাবের আভাসে আনন্দে একটি রসস্নিগ্ধ ব্যাখ্যাও তৈরী করে নিল। আহা অনুরাগিণী সন্ধ্যা চঞ্চল হাতের পরশে অভিভূত হয়ে চোখের তারা মেলে ধরেছে। এখন সে নিজেকে উন্মোচন করুক।

আদি কবি বাল্মীকি কি তাব স্বাতীর কথা ভেবে এই সন্ধ্যার বর্ণনা করেছিলেন ? স্বয়ম্ গভীর ভাবে নিজের অন্তরে একথা নিয়ে নাডাচাডা করতে লাগল।

আরো গভীরভাবে।

অথচ চোখের দৃষ্টি দূরবীনের ভিতর দিয়ে সামনে গভীর মনোযোগের দাবী করছে। মনের দৃষ্টিতে এখন ঢেকে রাখতে হবে। সবার উপরে হচ্ছে এই মুহূর্তের কর্তব্য।

হালকা মেঘ চাঁদের আলোকে মাঝে ম'ঝে ঢেকে দিচ্ছে। বর্ষা শীঘ্র এসে পড়বে। জাপানী বাহিনী দ্রুত ইম্ফলের দিকে এগিয়ে আসছে। এখন রামচন্দ্র ও রামায়ণ নিয়ে ভাবার সময় নেই। সীতা আর স্বাতী দুই-ই সুদূর। এই মুহূর্তে সামনে আর সবার উপরে হচ্ছে কর্তব্য।

একটি নিঃশ্বাস ফেলে স্বয়ম্ সটান হয়ে দাঁড়াল। এই শ্লোকটির নূতন একটা অর্থ তার কাছে ফুটে উঠল। আহা সন্ধ্যার লালিমায় ছোপানো রঙে উঠতি সূর্যমার্কাদের চঞ্চল গতিবিধি তার সন্ধানী স্পর্শে খুশী হয়ে চোখের তারা খুলুক; নিজেদের সব গোপন প্ল্যান তার সামনে মেলে ধরুক। এই তো প্রকৃষ্ট সময়। ব্রহ্মদেশ, প্রাচীন কালের নাম সুবর্ণভূমি। সেই বর্মাই হচ্ছে তার কাছে স্বর্ণলঙ্কা।

অতএব সে রামচন্দ্রের মতই নির্ভয় হয়ে গভীর জঙ্গলে নিজেই প্রবেশ করবে। ওই তো মাঝে মাঝে চাঁদের আলোর সাহায্যে সে পথ করে নিতে পারবে। নিস্তব্ধ বনভূমিতে নিঃসঙ্গ স্বয়ম্ যেন রামচন্দ্রের মত নির্ভয়ে চলেছে।

ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং
নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্বত সন্নিরুদ্ধং
রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্থ।

মেঘ এলোমেলো ভাবে উড়ছে। কোথাও আকাশ দেখা যাচ্ছে। কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ে ঘেরা নিস্তরঙ্গ সাগরের মত বনভূমি কি দারুণ গোপন রহস্য ঢেকে রেখেছে। মাল্যবান পর্বত নয়। মণিপুর কোহিমার উত্তরে পাটকাই বুম গিরিমালা।

তার স্কাউটরা কেউ এখনো ফিরল না। কে জানে হয়ত সবাই ধরা পড়েছে। অথবা পথ হারিয়েছে। কিন্তু আজ রাতের মধ্যে খবর পাওয়া দরকার। সে তার বেতার যন্ত্রগুলি গোপন গর্তে লুকিয়ে ঢেকে রাখল। আগে থেকে ঠিক করা জায়গায় স্কাউটদের জন্য সাংকেতিক নির্দেশ রেখে দিল। তার পর যে অভিযানে সে বের হল কে জানে সেটা তার অগস্ত্য যাত্রা কিনা।

তারপর সে একেবারে একা। আমরা প্রায় সবাই নিঃসঙ্গ বন্দিদশার দণ্ডে —নিজেদের দেহের নীচে, মনের গহনে সঙ্গহীনতার জন্য—সারাজীবন ধরে দণ্ডিত। যার নিজের জীবন্ত তারুণ্যে ভরা মন আছে কেবল সে-ই একথা বুঝবে। মানবে যে জীবন ভরে এই যাবজ্জীবন নিঃসঙ্গতার দণ্ড ভোগ করতেই হবে। সৌভাগ্য এই যে সেই দণ্ডটা সদাসর্বদা নিজেরই সামনে ধরা পড়ে না। তাই তো আমরা হাসি, কাজ করি, প্রেমে পড়ি।

আজকের এই নিযুতি রাতের একক অভিযান ওর অভিজ্ঞতায় প্রথম নয়। সবচেয়ে বিপদজনকও নয়। তবু আজ নিজেকে বড় একা মনে হল। বড় এ-কা।

চকিতে মনে হল ছেলেবেলার কথা। চাঁদের মত স্বল্প কিন্তু স্নিগ্ধ আলোর প্রদীপে ছেলেবেলায় শান্ত পল্লীগ্রামে ওর মা রামায়ণ পড়ে শোনাতেন। কৃত্তিবাসের মিষ্টি পয়ার কবিতা ওর কানে মধু ঢেলে দিত। মায়ের আদরের পাঠ সাহিত্যের অনুরাগকে বাড়িয়ে দিত। তাইতো বড় হয়ে সে সংস্কৃত মূল রামায়ণ পড়তে শুরু করেছিল। এবং কলকাতায় আত্মীয়-বাড়িতে

চাকুরিপ্রার্থী বেকার জীবনে কখনো নিজেকে তুচ্ছ বা কৃপার পাত্র মনে হয়নি। বাল্মীকির রসৈশ্বর্য তার মনে।

একবার হঠাৎ সে মায়ের কথা মনে করল। মা যদি বেঁচে থাকতেন হয়ত যুদ্ধের জন্য নাম লেখাতে আপত্তি করতেন না। হয়ত যা বলতেন তা বাল্মীকি মায়ের মুখ থেকে নিঃসৃত হবার জন্যই রচনা করে গিয়েছিলেন

শ্রেয়সে বৃদ্ধয়ে তাত পুনরাগমনায় চ
গচ্ছস্বারিষ্টমব্যগ্রঃ পন্থানমকুতোভয়ম্

বাছা আমার, শ্রেয় আর শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যাকুলতাহীন মনে নির্ভয়ে শুভপথে যাও; আবার ফিরে এসো।

সত্যি তো সে তো একা নয়। তার মায়ের আশীর্বাদে ভরা দুটি আঁখিও এই আঁধার অজানা জঙ্গলে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে পথ দেখিয়ে। শুধু তো ইহলোকের প্রেয়সীই নয়, পরলোকের শ্রেয়সীও তো তার সঙ্গে, মনের গহনে অবিরাম সঙ্গী।

যে নিঃসঙ্গ বন্দীদশার ভাব তার একটু আগেই মনে এসেছিল তা ঘুচে গেল।

শুধু তাই নয়। সে যাদের শিক্ষা দিয়েছে, যারা তার নির্দেশে প্যাট্রল করতে, টহলদারী করতে বেরিয়েছে তারা সবাই তার অভিযানের সঙ্গী। এক সঙ্গে এক পথে না গিয়ে থাকুক, একই উদ্দেশ্যে একই পথের পথিক তারা। সে ইচ্ছা করলে শুধু তাদের দিয়েই ও. পি. পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি তৈরী করে নিজে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে পারত।

সামরিক শাস্ত্র অনুসারে সে স্বাভাবিকভাবেই নিজে পিছনে দূরত্বে থেকে কম্যাণ্ড পোস্টে ঘাঁটি পেতে বাকী সবাইকে তদন্ত করতে পাঠাতে পারত। 'রেকি' করবার অর্থাৎ নিরীক্ষণ করবার জন্য প্রাইভেটদের পাঠালেই চলত। ওয়াটার্লু যুদ্ধ ডিউক অব ওয়েলিংটন পঞ্চাশ মাইল দূরে রাজধানী ব্রাসেলসে ডাচেস অব বেলমণ্টের পার্টিতে নাচতে নাচতে জিতেছিলেন এহেন সুবাদ আছে।

সে কথা তার কম্যাণ্ডের একজন তরুণ ইংরেজ প্রাইভেট মনেও করিয়ে দিয়েছিল। কেরামত আলি—বেসামরিক কিন্তু সংবাদ সংগ্রহে বিশেষ ওস্তাদ চাটগাঁইয়া মানুষটিও সে কাহিনী শুনে সেই অনুরোধই করেছিল।

কিন্তু নীচু চাপা স্বরে দৃঢ়ভাবে স্বয়ম্ বলেছিল, ওয়েলিংটনের মত আমারও একটা ডান্সের চান্স এসেছে। খাস নিম্ননীদের নূপুর নিক্কণের তালে তালে। ওয়েল। ওয়েল।

অতএব সে একেবারে আগুয়ান এলাকাতেই নিজের কম্যাণ্ড পোস্ট খাটিয়েছিল। তার নিজস্ব অভিমত হচ্ছে যে তার প্রথম কর্তব্য নিজের দলের লোকদের যথাসম্ভব পুরো ট্রেনিং দেওয়া। আর দেওয়া জয়ের ভরসা। একজন সৈনিক বা সেনাদলকে এর চেয়ে বড কিছু দেবার নেই।

সেই বড় দান স্বয়ম্ তার দলকে নিঃশর্তে উপহার দিয়েছে।

আব নিজেকে শিখিয়েছে যে কম্যাণ্ডারকে এমন জায়গায় থাকতে হবে যেখান থেকে সে দলের আর যুদ্ধেব গতির নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বিলেতে সাম্রাজ্যবাদের বিশাল ছাতার তলায় শেখানো হয়েছিল কি করে মাটির নীচের কুঠরী, চোরাকুঠরী 'সেলাব' থেকে একটি ব্যাটালিয়ন চালনা করা যায়। কিন্তু সে নিজেকে শিখিয়েছে কি কবে মিলিটাবী কমেণ্টেটার না হয়ে কম্যাণ্ডার হওয়া যায়। যুদ্ধেব ধাবাবিবরণীর পোস্ট-অফিস অথবা ভাষ্যকার হবে না সে। যুদ্ধের ধারা, মোড ঘুরিয়ে দেবার সুযোগ এসেছে তার হাতে।

সে সঞ্জয় হবে না।

হবে অর্জুন।

২৭

নিচু ঝোপের লতাপাতা দু হাতে সরাতে সবাতে স্বয়ম্ নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছিল।

চাঁদ আস্তে আস্তে ঢাকা পড়ে গেল। কিন্তু অসংখ্য তারা আর মিটিমিটি জোনাকী যেন ভেলভেটের মত নরম আকাশকে কাশ্মীরী চুমকীর কাজে ভরিয়ে দিয়েছে। টিলাগুলি গাছে আব লতাগুল্মে ভবা। মাঝে মাঝে বড পাথরেব চাঙড়। এখানে সেখানে লিলির মত চেহারার ফুল। বুনো বাসন্তী সুবাসে বাতাস বেশ মিঠে মিঠে লাগছে।

বনের নৈশ জীবন কিন্তু চঞ্চল। হঠাৎ হঠাৎ অজানা পাখী ডেকে উঠছে। হঠাৎ কোন ছোট পশু প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। আর মাথার উপবে গাছে বসে তক্ষক সাপ ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করছে, ও কে? ও কে?

একমাত্র স্বয়মূই নীরব। কোন প্রশ্ন, কোন চলমান প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ করা চলবে না।

একটু থেমে সে চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে নিল। হঠাৎ যেন ভয়ের মত কিছু একটা অনুভূতি তার শিরদাঁড়াকে ঠাণ্ডা করে জমিয়ে দিল। যেন সে চারদিকে সাজানো শত্রুর গুলির সামনে নিজেকে চাঁদমারির মত মেলে ধরেছে।

কিন্তু নিজেকে সটান করে সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। যেন এখনি সে একটা নূতন সূর্য খুঁজে বের করতে পারবে। নতুন সাহস নতুন বিশ্বাসে ভরা তেজস্বী সূর্য এই নিস্তব্ধ নিঃসহায় আকাশে হবে তার নিজস্ব আবিষ্কার।

নিঃসন্দেহে একটা কিছু অশরীরী ব্যাপাব যেন এইখানে কাছে পিঠে কোথাও ঘটে গেছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যাকে ধরা ছোঁয়া যায় না তাব হিসাব যেন সে ষষ্ঠ একটা অদৃশ্য অজ্ঞাত বোধ দিয়ে ধরতে পারছে।

হ্যাঁ, ঠিক।

জংলী লতাপাতার উপর পা পড়তেই ক্যাঁচ করে কি রকম একটা আওয়াজ হয়েছিল।

ঘন অন্ধকারের ভিতরেও নজর করতে অভ্যস্ত চোখে সে একটি দুমড়ানো পোঁটলা দেখতে পেল। প্রায় পাহাড়ী গেরি মাটির মত রঙের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু পোঁটলাটি কি?

কোন ছোটখাট 'মাইন' নয়তো? শত্রুর নজর এড়িয়ে তাকে অতর্কিতে ঘায়েল করবার জন্য কাপড়ে মুড়ে রেখে গিয়েছে হয়ত।

খুব সাবধানে তাকিয়ে চার দিক দেখে স্বয়ম্ একটু এগিয়ে গেল।

এবং পোঁটলাটি দেখে সে পাথর বনে গেল। যেন মাটিতে ওর পা দুখানা পুঁতে ওকে প্রস্তরীভূত মূর্তি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শত্রুর হাতে খুন হওয়া একটি মৃত দেহ। যুদ্ধে নিহত নয়। বেসামরিক স্থানীয় লোকের পোশাকে প্যাট্রল করতে বেরিয়েছিল আর জাপানী হাতে ধরা পড়েছিল। তারপর নানাবিধ প্রক্রিয়ার অত্যাচার—যা এখনো অন্য জগতে প্রচলিত নয়—করে শেষ পর্যন্ত মুণ্ডটা তাচ্ছিল্যভরে এক কোপে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। গোটা ধড়খানা নিয়ে মরার সম্মানও যেন সে না পায়।

এই প্রথম সে ঠাণ্ডা মাথায় ঠাণ্ডা রক্তে খুনের মৃত দেহ দেখল। যুদ্ধে মৃত্যুর জন্য ভাববার বা ভয় করবার সময় থাকে না, প্রয়োজনও থাকে না। সে মৃত্যু সহজ, ভীতিপ্রদ নয়। কিন্তু এমনভাবে তিলে তিলে তাল তাল অত্যাচার করে হত্যা মৃত্যুর চেয়ে অনেক ভিন্ন বস্তু।

জাপানী সামরিক শাস্ত্রে এই ব্যবহারই প্রচলিত। শত্রুপক্ষের যে ধরা পড়ে, যে হারাকিরি করে নিজের সত্তা ও বিজয়ীর সমস্যা নিজে থেকে শেষ করে না দেয় তার প্রতি অতি মানী জাপানী জাতির অসীম ঘৃণা। সে বাঁচার অযোগ্য। তাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখা একটা বিরাট অপচয়। যে ইহলোকে পৌরুষের সব চেয়ে চূড়ান্ত অপমান মাথা পেতে নিয়েছে, পরলোকে তার আত্মা শুধু অভিশাপই পাবে।

তার উপর পাশ্চাত্ত্য শক্তি শতাব্দী ধরে প্রাচ্যের আত্মাকে দলন আর সম্পদকে শোষণ করেছে। তার প্রতিশোধে একটা পুণ্যও আছে।

কিন্তু ওই মুণ্ডহীন দেহের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, সময় নষ্ট করা চলে না। অথচ তার শেষ সৎকার একটু কিছু অবশ্য করা উচিত। তার দেহ পাশ ফিরে পড়ে আছে। হাঁটু দুটো বুক পর্যন্ত উঠানো। হাতের পাতা দুটো দুটো গালের পাশে আলগোছে রাখা। কাপড়ের টুপীটা যেটা এককালে মাথায় ছিল, সেটা পাশে পড়ে আছে। যেন মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে সে জন্মের আগের

জ্ঞানের অবস্থাতে ফিরে গিয়েছিল। যে মৃত্যু তাকে আঁকড়িয়ে ধরেছে তাকে পিছু ফিরে, জীবনের সব কটা পরিচ্ছেদ অতিক্রম করে সেই মৃত্যুকে এড়াতে চেয়েছিল।

স্বয়ম্ অপরিসীম মমতায় এক টুকরো মাটি আর দুয়েকটা জংলী ফুল সেই দেহের উপর ফেলে দিল। মুখ নেই, কিন্তু দেহ যেন একটি বিদায়বাণী বহন করছে। স্বয়ম্‌কে ওপার থেকে দেখছে। কে জানে হয়ত বা আহ্বান করছে।

কিন্তু না। তা হতে পারে না। নিঃশব্দ পৃথিবীর প্রতিকৃতি আর নিঃসঙ্গ আকাশের আত্মা দুজনকেই হাতছানি দিয়ে কর্তব্য করে যেতে বলছে। দুটো জীবনের দুটো পথ এক হয়ে মিলে যেতে পারে না।

সে শুধু বলল, আমি এগিয়ে চললাম। আমার কাজে। তুমিও তো তোমার কাজেই—যেটি আমারও কাজের অংশ—এগিয়ে যেতে যেতে দেহত্যাগ করেছ। কিন্তু আমার ধর্মে যা বলে তাই তোমাকে শুনিয়ে যাচ্ছি—তোমার আত্মাকে খর্ব করতে, ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। তোমার উৎসর্গের মধ্যে তুমি শাশ্বত। ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

সব জীবনের যা অলঙ্ঘ্য পরিণতি তাই তোমার হয়েছে। কিন্তু তুমি কর্তব্যের মধ্য দিয়ে জীবনের ঊর্ধ্বে উঠে গেছ।

জীবন মানেই যুদ্ধ। যুদ্ধ মানেই মৃত্যু। সুখশয্যায় হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে বা রোগযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে স্তব্ধ হয়ে যাবার চেয়ে বড পরিণতি তোমার হয়েছে। তুমি সার্থক।

এগিয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে স্বয়ম্ ভাবল যে মৃতের সনাক্ত করা সম্ভব কিনা দেখা দরকার। সামরিক কাগজপত্রে 'জাপানী এলাকায় নিখোঁজ' তালিকায় থাকার চেয়ে মৃতের তালিকায় থাকাটা আত্মীয়স্বজনের কাছেও স্বস্তি।

সনাক্ত করবার কাগজ খোঁজ করতে গিয়ে স্বয়ম্ চমকিয়ে উঠল। একি!

এ যে তারই নিজের দলের বেসামরিক স্কাউট কেরামত!

কেরামতের মত সফল সন্ধানী বোধহয় কেউ হবে না। সারা জীবন সে মিলিটারীদের সঙ্গে ওঠা বসা করেছিল। তাদের মতিগতি নিজের নখদর্পণে। অথচ বেসামরিক নিজে। চাটগাঁয়ের লোক বলে লুসাই মগ বর্মী, পাহাড়ী মঙ্গোলীয় ছত্রিশ জাতের সঙ্গে মিশে যেতে পারত। আর কি জীবন্ত চরিত্র তার!

কেরামতকে ভোলা অসম্ভব। এমন কি অসম্ভব তার জীবনের ছোটখাটো ঘটনাগুলিও ভুলে থাকা। স্বয়ম্ নিমেষের জন্য কেরামতের নিজের মুখে বলা অতীতের দিকে মনকে ঘোরাল।

মন ঘোরাতে গিয়ে পৌছল একেবারে মেসোপটেমিয়ায়।

এই সন্ধ্যাসূর্যের আকাশের মত সেখানকার আকাশও লালে লাল ছিল। তবে সূর্যের আলোয় নয়। কামানের আগুনে। গ্যালিপলিতে সৈন্যদের ল্যাণ্ডিং চলছে। তবে তফাতের মধ্যে এই যে অন্য আকাশে সূর্য ডুবে যাবার পর আর আলো থাকে না। চাঁদ অবশ্য একটু-আধটু মায়ার পরশ বুলিয়ে যায়। আর তারাগুলি সুবিধামত মিটিমিটি হাসে। কিন্তু মেসোপটেমিয়ার আকাশে স্টার-শেলগুলি মিটিমিটি হাসে না। হাউই বাজির মত তেড়ে ফুঁড়ে আকাশে উঠে সব আলোয় আলোময় করে দেয়। দুশমনের হদিশ দিয়ে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে স্নাইপার চালায় গুলি। গোলন্দাজ চালায় গোলা।

সেই আজব আকাশের নীচে হাজির হয়েছিল কেরামত। পেটের দায়ে, বেকারীর জ্বালায়।

ম্যাট্রিক ফেল কেরামতের কেরানীর চাকরীও জুটল না। মামা নেই, মুরুব্বি নেই। পিছু টানও নেই। এদিকে যুদ্ধের বাজার গরম। মেসোপটেমিয়াতে বাবুর্চি চালান দিচ্ছে সরকার চাটগাঁ আরাকান থেকে। কেরামত রঙরুট অফিসে গিয়ে বাবুর্চির কাজের জন্য নাম লিখিয়ে দিল। কি হবে মিছিমিছি আরো বই ঘাঁটাঘাঁটি করে! ইউনিভারসিটি করায় না পাস। বাবুরা দেয় না চাকরী।

কেরামতের কথিত কাহিনী।

যেমন তার ভাষা, তেমনি তার ভাষ্য।

এবং তার কাহিনী অকপটে সে স্বয়ম্‌কে খুলে বলেছিল। তার নিজের হাতে বাছাই করা খবর—খোঁজা আর যোগাড় করার ওস্তাদ এই কেরামত।

বেকার বসে থাকার চেয়ে বাবুর্চিগিরি অনেক ভাল। গাঁয়ের আর পাঁচটা ভাইবেরাদর কলকাতার হোটেলে কাজ করে। কেরামত তাদের রান্নার তালিম দেওয়া দেখেছে। কিন্তু তাদের চেয়ে সে বড় হবে। সে যে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে।

তাই সে বিলেত না হোক, বিলেতের কাছাকাছি যাবে। সরকারী মাইনে, মোটা বকশিশ, মিলিটারী উর্দি, আর গোরা পল্টনের ভাষা উর্দু। জীবনে আর কি চাই।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে সারা চাটগাঁ আরাকান খুঁজলে কেরামতের চেয়ে ওস্তাদ বাবুর্চি পাওয়া যাবে না। সমস্তটা রেজিমেণ্টাল স্ট্রেংথ অর্থাৎ নাম লেখানো তালিকায় তার মত চৌকশ বাবুর্চি আর ছিল না।

শুধু তো রান্না নয়। রসের রসায়ন, রেসিপির অদল বদল করে গোরা মিলিটারীর মর্জি যোগানো রান্নার চেয়ে অনেক বড় বিদ্যা। সে অবশ্য ওডহাউসের ইংরেজী বই পড়েনি। কিন্তু মেসোপটেমিয়ার ইংরেজ মিলিটারী মহলে তার কদর জীভ্‌সের চেয়ে কম ছিল না।

গোরা মিলিটারী অফিসাররা যখন 'রাম' মদের নেশায় মজে যায় তখন বলে সে নাকি একাধারে বয়স্য আর বাবুর্চি।

এদিকে তার ম্যাট্রিকের বিদ্যায় যত মরচে পড়তে লাগল খানা বানানো আর খিস্তি হজমে তত হাত পাকাতে লাগল। টমি মহলেই শুধু নয়, গোরা অফিসার মহলেও খিস্তি ফোটে খইয়ের মত। কেরামত অদ্ভুতভাবে সে সব হজম করতে শিখেছিল। তখনো গোরা প্রফেসন্যাল আর্মিতে শিক্ষিত তরুণদের আমদানী বিশেষ হয়নি।

কেরামত নিজের এই নতুন জীবনটা মেনে নিয়েছিল। একে রাজার জাত, তায় মহারাণীর মনসবদার। নিজের দেশেই বড় বড় মহাশয় লোক। রাজা-ভুজোরা হাতজোড় করে থাকে। সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ না সাহেবরা তাদের বসবার হুকুম দেয়। দেশে গাঁয়ে চা বাগিচায় সে দেখেছে যেঁ যত ভদ্দর বা বুড়োই হোক না কেন, কোন লোক সাদা আদমীর সামনে দিয়ে খোলা ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে পারবে না। আইনের বাইরের নিয়ম।

সেটা নাকি মহারানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সামিল।

তা মহারানী কোন্ না কোন্ বছর পনের আগে সগ্‌গে চলে গেছেন। কিন্তু তার রাজপাট তো চলছে সমান ঠাটেই। কাজেই গাঁয়েভূঁয়ে ওরা গোরা মিলিটারীদের মহারানীর মনসবদারই বলে থাকে এখনো।

সেই মনসবদারের দল যদি মেস নাইটে একটু খিস্তি দিয়ে 'সেভারী' 'স্ন্যাক্স' প্রভৃতি চুটকী খাবারগুলোকে একটু খাস্তা করে তুলতে চায় কেরামত তাতে আপত্তি করবে কোন্ সাহসে ?

সে তো আর্মি মেসের বাবুর্চি হয়ে নাম লেখানোর সময় ম্যাট্রিক পর্যন্ত লেখা-পড়া করার কথাটা বেমালুম চেপে গিয়েছিল। লেখাপড়া জানা বাবুর্চি নিশ্চয়ই স্বদেশী এমন একটা সন্দেহ হবে। শুধু কি বেশী মাইনের আশাতেই ফিল্ড

সার্ভিসে সে এসেছে! আলবৎ তাহলে স্পাই। অনেক বাঙালীই গোপনে, অন্তত মনে মনে দুশমন জার্মানকে মদত দেয়।

তাছাড়া কে না জানে যে তুর্কীর খলিফার উপর দুনিয়াসুদ্ধ মুসলমানের মনে মনে ভক্তি আছে। তিনি আবার জার্মান দুশমনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়তে নেমেছেন। সে রকম অবস্থায় লেখাপড়া জানা বাবুর্চি কেরামতের যদি টিকটিকির কাজ করবার মতলব থেকে থাকে! এরকম সব সন্দেহ এড়িয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে।

অতএব সে সেজে গেল যাকে বলে একেবারে আনপড় আদমী।

এমন সময় খাস বিলেতের আমদানী লেখাপড়া জানা কিছু গোরা অফিসার মেসোপটেমিয়ায় ইংরেজ সৈন্যদলে চালান এল। তাদের হাঁকডাকের মধ্যে কেরামত নতুন একটা সভ্যতার ইশারা পেল।

তারা যখন আদর করে তাকে কেরামতের বদলে ক্রাম বলে ডাকতে শুরু করল তখন সে প্রায় বেহেশ্‌তে পৌঁছে গেল।

কিন্তু সে সুখটুকু কপালে সইল না।

তুর্কী আর জার্মান সাঁড়াশী অভিযান পিনসার মুভমেণ্টের জাঁতাকলে পড়ে ইংরেজ সেনার তখন ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। যত শত্রুর হাতে মার খায় ততই ওরা খিদমদগারদের উপর মারমুখো হয়ে ওঠে।

মনে মনে তাও মেনে নিল ক্রাম। সাহেবরা মার খাচ্ছে। সামনে বিরাট জলরাশি। তাতে ওদের ভরাডুবি হতে বসেছে। দেশে গাঁয়ে বান ডাকলে কলাগাছের গুঁড়ি ভরসা করে ওরা জলে নামে। আর এই তুর্কী নদীগুলিতে খেজুর গাছ পর্যন্ত ভাসে না। ক্রাম মনিবদের দুঃখে খুবই দুঃখ পেত। চাকরীতে টিকে থাকার উপায় এনে দিল এই সহানুভূতি।

তাই সে ওদের খোশ মেজাজে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সেটাই যে তার জীবন।

রসদ সরবরাহ যখন প্রায় বন্ধ হয়ে এল তখন সে ঘোড়ার মাংস দিয়ে হরেক রকম কাবাব বানিয়ে অফিসারদের একদিন তাক করে দিল। এমনি তাক করে দিল যে তারা খিস্তি করতে ভুলে গেল।

ক্রাম মনের খুশীতে সেদিন খাবার টেবিলে সাজিয়ে রাখা স্কচ হুইস্কির গ্লাসগুলিতে একটু বেশী করে তরল হজমী জল ঢালার ব্যবস্থা করবে ভাবছিল।

এমন সময়—এমন সময় খাস ককনী ইংরেজীতে একখানা চোস্ত খিস্তি

বেরিয়ে এল। এস ও বি অর্থাৎ কুকুরীর ছানা নাকি স্যুপের বদলে উটের পেচ্ছাব পরিবেশন করেছে।

গালাগালির বন্যায় হাবুডুবু খেতে লাগল কর্ণফুলী নদীতে সাঁতার কাটতে অভ্যস্ত ক্রাম।

তবু সে ডুববে না। কারণ সাহেবরা গ্যালিপোলিতে পারে নামতে গিয়ে ডুবতে বসেছে। এখন মরণ যদিও নির্ভর করছে তুর্কীদের উপর তার নিজের উপর নির্ভর করছে সাহেবদের জীবন।

সে মাটি পর্যন্ত নুয়ে সেলাম করে বলেছিল, হুজুর গরীব পরবররা যদি একটা উট কোরবানী করে দিতে পারেন তাহলে তার পেচ্ছাব নয়, পায়ার গোস্ত দিয়ে এমন খানা বানাতে পারে যার কাছে বেহেস্তের নাস্তাও কিছু নয়। আর, আর হুজুরদের পেয়ারের বুলি বীফ তো তুলনায় মাটির ঢেলা।

সে যাত্রা মনিবদের মান রক্ষা হয়নি। কিন্তু জান বেঁচেছিল। অনেকটা ক্রামের কেরামতিতে। কারণ পালাবার সময়ও সে তাদের উপোস থাকতে দেয়নি। তারা খেয়েছিল, খুশী হয়েছিল আর অবশ্যই প্রাণ ভরে খাস ককনীতে গালমন্দ করেছিল।

মোট কথা যুদ্ধ শেষ হবার পর সে চাকরীতে পাকাভাবে বহাল হল। তখন তার বয়স ঠিক মত লেখানোর দরকার হল। এদিকে মেঘে মেঘে এর মধ্যেই বেশ বেলা হয়েছিল।

ততদিনে তার বুদ্ধিশুদ্ধিও পেকেছে। ঠিক বয়স লেখালে ঠিক সময়ে 'পেন্সন' নিতে হবে। অথচ যুদ্ধটা যখন নেই আর জীবনটা আছে বহাল তবিয়তে, তখন মিলিটারী নিয়ম অনুসারে অল্প বয়সে রিটায়ার করাটা নেহাৎ বোকামি। ওকে তো আর হাতে-কলমে লড়াই করতে হবে না।

কাজেই সে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ার কথা যেমন চেপে গিয়েছিল তেমনি বয়সটাও ভুলে গেল। লেখাল যে সে শিবঠাকুরের সমবয়সী। রেজিমেণ্টাল ক্লার্ক অম্লান বদনে খাতায় লিখে নিল যে বয়স ঠিক করা গেল না। সাপোজড্ টু বি সেম এজ য়্যাজ ওয়ান শিভা ইন হিজ ভিলেজ।

মেস ম্যানেজার থেকে রেজিমেণ্টাল কর্নেল সবাই ওর তৈরী খানায় এত খুশী যে শিভাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। তস্মিন কথাটার মধ্যে আসল মাল হচ্ছে পেটে। যার জন্য লোকে সব কিছুই করে। নিজে মরে, অপরকে মারে।

কেরামতের সাহেব দিয়ে ভরা আর সেলাম দিয়ে ঘেরা যৌবন কালটা কাটছিল ভাল।

অবশ্য নিজের জীবন যৌবন সে-ই আটপৌরে মামুলী বাঁধি গতে বাঁধা।

তবে হ্যাঁ।

সে যৌবনের নমুনা একখানা দেখেছিল বটে এক সময় সেই বর্মা মুলুকে। রেঙ্গুনে।

তা-ও লড়াইয়ের কল্যাণে। যুদ্ধ না হলে যৌবন খোলে না। আর যৌবন না হলে জীবনটাই বরবাদ। ধনও তার মতে 'বেরথা'। ধন তো আর কেউ ধুয়ে খায় না।

কিন্তু রেঙ্গুনে সে দেখেছিল যে জীবনটাকে খরচের খাতায় তুলে রেখে যৌবন আর ধন দুটো বস্তুই ধুয়ে খাওয়া যায়।

সেখানেও সাহেব মনিবদের জীবন আর মান নিয়ে টানাটানি শুরু হল। জাপানী হামলার ফলে সামাল সামাল রব উঠল। পালাবার পথও রইল না।

এমন সময় রেঙ্গুনে উড়ে এল এক ঝাঁক উড়ুক্কু পায়রা। পায়রা নয় ঠিক, আসলে নাম ফ্লাইং টাইগারস। আমেরিকান ভাড়াটে পাইলট-ফাইটার। ঠিক যেন কোন হলিউডের ছবি থেকে সদ্য নেমে এসেছে। গায়ে জিপ ফাসেনার লাগানো চামড়ার জ্যাকেট। গরম লাগলে হরেক রঙের হাওয়া শার্ট। পায়ের গুলি পর্যন্ত উঁচু বুট আর গলায় চকরাবকরা নক্সার রংদার রুমাল।

সব চেয়ে বড় কথা যে তাদের আঁটোসাঁটো হিপ পকেটে সব সময় থাকে চ্যাপ্টা লাল পানির বোতল। আর দিল নামক খোলামেলা দরিয়াতে ভাসে ফুর্তির লাল ডিঙা।

বর্মার আর্মি মেসে ঝাঁকে ঝাঁকে বোতল খোলার ফাঁকে ফাঁকে ক্রাম কিপলিং বলে কোন এক সাহেবের কেতাবের কথা প্রায় শুনত। সে নাকি লিখেছে যে ধবধবে শাদা ঝাঝরা ব্লাউস আর গরগরে রাঙা রেশমী লুঙ্গি পরা বর্মী মেয়েরা রূপের ঠাটে রেঙ্গুনের হাট মাতিয়ে রাখে। ওই কেতাব পড়েই বোধ হয় এই উড়ুক্কু বাঘের দল বর্মার উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। লড়াই কিনা।

ক্রামের তখন মনে পড়েছিল যে ইস্কুলেই সে কোন কবির একটা লেখা পড়ে খুব মজা পেয়েছিল। লড়াই আর পিরীত এই দুটো চীজের বেলা সব কিছুই চল।

তাতে বেইমানি হয় না।

ওদের জীবনটা নিজের। সাবালক হবার পর বাপ-মায়ের আর কোন এক্তিয়ার থাকে না সাহেবসুবোদের সমাজে।

ওদের যৌবনটাও তাই। লড়াইয়ের কারবারে যাকে বলে ফেল কড়ি, মাখ তেল। নগদ বিদায় দাও, তোমার হয়ে লড়ে যাব। মার্কিনরা তো আর মিশনারী রূপে হাজির হয়নি।

কিন্তু ধনের বেলায় নগদ বিদায়টা মোটেই ফেলনা ছিল না। যে দেশে চাল বিকোয় টংকা প্রতি আধ মণ সেখানে উড়ুক্কু মার্কিনরা মাইনে পায় মাসে সোয়া তিন হাজার। উপরি বোনাস মাসে আড়াই হাজার। অবশ্য গোটা ধনটাই উড়ুক্কুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হয়ে যেত যাকে বলে এক নিঃশ্বাসে হাওয়া।

তবু তার মধ্যে কোন বেইমানি ক্রামের নজরে পড়েনি। ওরা নিশ্চয়ই ভাবত জীবন যৌবন ধন মান এই চারটের মধ্যে টিকিয়ে রাখার মত মাল শুধু শেষেরটা। প্রথম তিনটেই খরচের খাতায় পাকা রসিদে নথি করা ছিল। কালস্রোতে ভেসে যাবার জন্য।

ফেঁসে গেল অবশ্য ক্রামের নিজের মনিবের দল। তাও বেইমানি করে।

না হলে কিনা জার্নেল সাহেব একটা পাহাড়ের শিরদাঁড়ায় চড়ে শুধু বাইনোকুলারে দেখে আর সরেজমিনে তদন্ত না করেই নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

জার্নেল মানে জেনারেল।

কোথায় দেখবেন দুশমনের গোপন প্ল্যান আর ফন্দিফিকির। তার বদলে দেখলেন মেঘের সারি-সারি ঢেউয়ের উপর কালো আর বেগুনী খেলা। মন এত খুশী হয়ে গেল যে ভাবলেন এই রঙীন সময়টুকু হেলাফেলা করবেন না। তাই যুদ্ধের অপারেশন অর্ডার লিখে ফেললেন এক লহমায়।

টেবিল নেই, অর্ডারের ফর্ম নেই। কিন্তু খেয়াল খুশী বলে তো একটা জবর চীজ আছে। জার্নেল সাহেব তার এডিকম্প সাহেবের পিঠটাকে টেবিলের কাজে লাগালেন। এ. ডি. সি. হাঁটু গেড়ে রইল। একটা চোতা কাগজের টুকরোতে তিনি ২৩ নং ইণ্ডিয়ান ডিভিসনকে অর্ডার লিখে দিলেন যে জাপানী সৈন্যদের থামাও, হ্ঠাও আর ভাগাও।

মনের খুশীতে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে হেড কোয়ার্টারে এসে তিনি কেরামতের বানানো সেভারী চুট্‌কী টুকরো চাটের সঙ্গে খেয়ে নিলেন প্রকাণ্ড এক গ্লাস রাম।

জার্নেল সাহেবের নামই ছিল জেনারেল সেভারী। আর কেরামতের নাম ছিল ক্রাম।

ইস্কুলে সে পড়েছিল যে বাংলায় কানু ছাড়া গীত নেই। কেরামতের জীবন সার্থক হয়ে উঠেছিল এটুকু জেনে যে ক্রাম ছাড়া মোবাইল আর্মি মেস অচল। অর্থাৎ গোঠে গোঠে শুধু ক্রামের বানানো খানাই গোটা ক্যাম্পের পছন্দ।

এ হেন গোষ্ঠ বর্মায় সিতাং নদীর তীরে একেবারে শুকনো মাঠে পরিণত হল। জাপানী চাবুক নয়, বন্দুকের ভয়ে ইংলিশ বাহিনী ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত চার ঠ্যাঙে পালাচ্ছে।

জিন দিয়ে যারা ছোটা হাজরি শুরু করত তারা তেষ্টায় ছটফট করতে করতে আঁজলা ভরে সিতাঙের জল খেতে লাগল। ক্রাম কি নাস্তা বানাচ্ছে তা দেখবার জন্য অপেক্ষা করল না। সাহেবদের কাছা-খোলা হয়ে পালানোর উপায় ছিল না। কিন্তু পাৎলুন খুলে শুধু কাছা সম্বল করে—যে কজন বেঁচে ছিল অনেকেই কাঠের পাটাতন না হয় কলাগাছের গুঁড়ি সম্বল করে ভবনদীর জ্যান্ত পারে চলে আসবার চেষ্টা করল।

এদিকে চুপিসাড়ে জাপানী সেনার এগিয়ে আসা ঠেকিয়ে রাখার জন্য জেনারেল সাহেব রাতের আঁধারে সবে ধন সাঁকোটি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফলে পিছনে ইঁদুরের মত জাঁতাকলে আটকিয়ে রইল নিজেরই তিন তিনটে ব্রিগেড।

তাদের পিছনে ঝড়ের মত ছুটে আসছে জাপানী সৈন্য। সামনে খলখল করে হাসি মস্করা করে লুটোপুটি খাচ্ছে সিতাং নদীর দুরন্ত ঢেউ।

এই প্রথম জীবনের জন্য আফসোস করল ক্রাম। জীবন বড় আদরের। তেলে জলে লালিত। তার চেয়ে আরো বেশী আদরের হচ্ছে পেনসন। কিন্তু যে সাহেবদের সেবায় সে অতীতে বয়সটার দৈর্ঘ্য ছোট করে দেখিয়েছিল আর পেনসনের ঘুন্‌সিটা লম্বা করে টানছিল সেই সাহেবরাই যে বেশীর ভাগ ওপারে। ভব নদীর অথবা সিতাং নদীর।

যারা এপারে আটকিয়ে গিয়েছে তারাও ভাগলবা হয়েছে বনে-জঙ্গলে। একেবারে লোপাট যাকে বলে। ক্রাম জানত যে তাকে আর ভোরে কারো জন্য হাজরি বা ছোটা হাজরি বানাতে হবে না। তার মস্তব সিংহাসন যে মেস ট্রাক অর্থাৎ খানা রসদের লরী তাতেও খাবার জিনিসপত্র কিছু বাকী নেই।

শুধু বাকী কয়েকটা স্কচের বোতল।

সাহেবরা যে চার অক্ষরের কথাটা আর যে চারপেয়ে মহিলা জন্তুটির কথা

একসঙ্গে জড়িয়ে স্কচে ভেজানো আধো-আধো স্বরে আদর করে প্রায়ই ওকে ঝাড়ত সেটা মনে পড়ল। শুকনো চোখে রঙীন জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্রামের মাথায় বুদ্ধি এল। সে বেচারা জন্মে কখনো হুইস্কি খায়নি। শরিয়তের বারণ। তার উপর মেসের তদারকী লেফটেনাণ্ট সাহেবের কড়া নজর। আজ সেই স্কচের বাচ্ছা আর হিসাব নিতে আসবে না।

কিন্তু সাহেবরা যে কত চাঙ্গা হয়ে উঠত এই স্কচের কল্যাণে তা ক্রাম জীবন-ভোর দেখেছে। এখন ভবনদীর পারে দাঁড়িয়ে সিতাঙের ওপারে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সাহেবরা নেই। কিন্তু তাদের মাল আছে।

তা-ই সই। সেলাম সাহেব—জীবনে এবং মরণে।

পুরো বোতল তৃষ্ণার জলের মত শেষ হয়ে গেল। নিমেষে।

আরো দুটো বোতল তুলে নিয়ে বগলের তলায় চেপে ধরল। এ'ডেনের মরুভূমি আর ফ্রণ্টিয়ারের পাহাড় চূড়ায় বিহার করতে করতে সে সাঁতার কাটতে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু দুই বগলে দুই বোতল নিয়ে চিৎ সাঁতারের ভঙ্গিতে সিতাং নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে সে কেমন করে পশ্চিম পারে এসে হাজির হল তা কাউকে বলতে পারবে না।

যেন শবাসনে কোন যোগিরাজ পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গায় ভাসমান ছিল।

আশ্চর্য! নদী পার হবার সময় রোদে পোড় খাওয়া আর্মি শত্রুর তাড়া খাওয়া অনেক ইংরেজ বহু দূরে গাছের চূড়ায় লুকানো জাপানী স্নাইপারের গুলিতে সাবাড় হয়ে গিয়েছিল।

ক্রাম কিন্তু শবাসনে কারণবারির মন্ত্রে নতুন দীক্ষিত তান্ত্রিক। তাকে দেখে কোন স্নাইপার না করল সন্দেহ, না চাঁদমারি প্র্যাকটিশ।

এর পর ক্রাম মর্মে মর্মে বুঝে নিল যে সাহেবরা বৃথাই হুইস্কির প্রশস্তি গায় না।

কিন্তু সাহেবদের প্রশস্তি সেই সময় থেকে সে ছেড়ে দিল। গ্রামে ফিরে এসে খুলে ফেলল ক্রাম নামের খোলস। অবশ্য জীবন তাকে ছাড়ল না।

জাপানী হামলা হাজির হল আরাকানে চাটগাঁয়। সে পূবে পশ্চিমে বিদেশ-বিভুঁয়ে লড়াই দেখেছে নিজের চোখে, হাতের কাছে। সে কি করে এখন নিস্তরঙ্গ নিশ্চিন্ত জীবনে ফিরে যাবে?

সাহেবরা হারছে হারুক। কিন্তু তা বলে দেশটা যাবে ওই বেঁটে বজ্জাতদের

বুটের তলায় ? যাদের সে সিতাং নদীতে কলার ভেলা ছাড়াই কলা দেখিয়ে এসেছে ?

অসম্ভব ! আসল যুদ্ধ যখন দেশের সীমানায় পৌঁছে গেছে সে ফৌজীতেই কাজ নেবে। অবশ্য আর্মি মেসে মশা তাড়ানোতে আর সে থাকবে না।

কাজের মত কাজ হচ্ছে খবর যোগাড়।

সেই সময় সে স্বয়মের নজরে পড়েছিল। সে আজ কিন্তু সবার নজর এড়িয়ে শেষ নদীটি পার হয়ে চলে গেছে।

এ জন্মের মত।

কিন্তু তার দেহের ক্ষতগুলি নজর করে দেখে স্বয়ম্ বুঝল যে তার উপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল। খুব সম্ভবত বেয়নেট প্র্যাকটিশ করেছে ওর উপর। বন্দীকে জ্যান্ত অবস্থায় গাছের সঙ্গে বেঁধে আনকোরা জাপানী সৈন্যরা তার সর্বাঙ্গে বেয়নেট ঢুকিয়ে দিয়ে চট করে বের করে নেওয়া অভ্যাস করে শোনা গেছে। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বন্দী খবর প্রকাশ করে ফেলে।

কিন্তু কেবামত নিজের মান রক্ষা করেছে। তার সব জমানো ধন বর্মার ব্যাঙ্কে লোপাট হয়েছিল। যৌবন কেটেছিল সামান্য বাবুর্চির কাজে কঠোর ডিসিপ্লিনে। জীবনটা দিয়েছে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে। কিন্তু মান নষ্ট করেনি।

সেই মানী বীরের জন্য সে একটু প্রার্থনা করল।

তার পর মুখ ফেরাতেই···

মুখ ফেরাতেই বুকের উপর বন্দুকের নলের ছোঁয়া।

কিন্তু এই কাজে যোগ দেবার আগে স্বয়ম্ জাপানী 'জুডো' শিখেছিল। বিদ্যুতের মত দেহটা নামিয়ে নলের নিচে পর্যন্ত নেমে গিয়ে সে হাতের ধাক্কায় বন্দুক সরিয়ে দিল। মায়াবী চাঁদের আলো শত্রুর মুখের উপর এসে পড়ল।

এ কি ? এ কি ?

তুমি ? ..তুমি, নীরেনদা ? মেজর নীরেন চৌধুরী ?

তুমি ? তুমি ?—হাতের বন্দুক আবার যথাস্থানে তাক করতে গিয়ে শত্রু থেমে বলল, তুমি ? তুমি, স্বয়ম্ ?

মায়াবী চাঁদ একটু আগেই রামায়ণের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। সেই চাঁদ, বাল্মীকির বর্ণনার "ক্বচিৎ প্রকাশং" চাঁদ মাথার উপরে।

আর নিচে সামনা সামনি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই শত্রু পক্ষের সেনানী।

দুই শত্রু।

১৮

নীরেনদা, তুমি—তুমি জি…

'জিফ' অর্থাৎ জাপানীজ ইণ্ডিয়ান ফোর্স এই কথাটা ব্রিটিশ কেন, সমস্তটা মিত্রশক্তি মহলেই একটা তাচ্ছিল্যের ভাবে ব্যবহার করা হত। শুধু তাচ্ছিল্য কেন, ঘৃণাও বলা চলে। মিলিটারী মেসে, বিশেষ করে যুদ্ধের আওয়ান এলাকায় ওরা 'জিফ' কথাটাকে বিশ্বাসঘাতক, এমন কি বিভীষণের সমগোত্র বলে আলোচনা করত।

স্বয়ম্ মোটেই তা করতে পারেনি। বিভীষণ বৃত্তিকে সে কম ঘৃণা করে না। কিন্তু ইংরেজ শক্তি দেশকে পরাধীন রেখেছে। দেশকে এমন চূড়ান্ত টালমাটালের সময়ে পর্যন্ত স্বাধীনতা দেবার কোন খোলাখুলি লক্ষণ দেখায়নি।

নেতাজীর গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সেই ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোকে সে তাই বিভীষণ ভাব বলে কখনো মনে করতে পারেনি। যে আত্মোৎসর্গ তার নিজের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি তাকে দূর থেকে মনে মনে শ্রদ্ধাই করেছে।

এবং সুভাষচন্দ্র যে বাহিনী সৃষ্টি করেছেন তা যে শুধু মিত্রশক্তির বিরোধিতা করবার বা জাপানীদের সহায়তা করবার জন্য নয় তা সে ভাল করেই বোঝে। ১৯৩৯ থেকে তিনি সমস্ত রাজরোষের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে, রাজদ্রোহীর শাস্তি উপেক্ষা করে খোলাখুলি ঘোষণা করেছিলেন যে এই যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের বিপদই হচ্ছে আমাদের সুযোগ।

তাঁকে যখন গৃহবন্দী করে রাখা হয় তখন, গোপন রহস্যে দেশ থেকে অন্তর্ধানের অল্প আগে, তিনি বাংলাদেশের গভর্ণরকে লিখেছিলেন, ভুলবেন না যে ক্রীতদাস থাকাই হচ্ছে জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ। সেই অভিশাপের নাগপাশ ছিন্ন করবার জন্য তিনি বর্মার পতনের সময় জার্মানী থেকে আজাদ হিন্দ রেডিয়ো থেকে দেশকে যে আহ্বান করেছিলেন তাও স্বয়ম্ কলকাতায় বসে লুকিয়ে শুনেছিল :—

"এই সংগ্রামে এবং এর পরের পুনর্গঠনের সময় যারা আমাদের উভয় পক্ষেরই শত্রুকে ধ্বংস করতে সহায়তা করবে তাদের সকলের সঙ্গেই আমরা সহযোগিতা করব।"[১০]

এই আহ্বানের পর সুভাষচন্দ্র ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

নিরুপায়, নিরস্ত্র, বলতে গেলে নির্বীর্য এক বেকার তরুণের মনে সেদিন নতুন করে আগুন জ্বলে উঠেছিল।

সেই তরুণ আরো পরে একদিন হঠাৎ রেডিয়োতে লুকিয়ে শুনেছিল :

"আমি 'একসিস' পক্ষের সাফাই গাইছি না। ভারতই আমার একমাত্র চিন্তা। এবং ভারতের স্বাধীনতা। এই ব্রত উদ্‌যাপিত হলেই আমি দেশে ফিরব।"

সেই তরুণ আরো শুনেছিল :

"আমরা তরুণ এবং আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ আছে। নিজ বাহুবলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করব। স্বাধীনতা কেহ দেয় না। নিতে হয়।"

এই সব বাণী ও ঘোষণা শুনেও সে ব্রিটিশ পক্ষের সেনাদলে যোগ দিয়েছিল। মনের মধ্যে ছিল বহু বাধা, বহু দ্বন্দ্ব। তবু সে এমার্জেন্সী কমিশনের জন্য হাজির হয়েছিল।

যেদিন সে দিল্লীতে উপস্থিত হয় সেই দিনই আবার জার্মানী থেকে প্রচারিত আজাদ হিন্দ বেডিয়োতে সুভাষচন্দ্রের ভারতীয় মুক্তি বাহিনীর শপথ গোপনে শুনেছিল। ভারতীয় বাহিনী শপথ নিচ্ছে, ঈশ্বরের নামে পবিত্র শপথ নিচ্ছে যে :

"...ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে, যে যুদ্ধের নেতা সুভাষচন্দ্র বোস—সাহসী সৈনিক হিসাবে আমি এই শপথের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে অঙ্গীকার করছি।"

শেষ মুহূর্তেও স্বয়ম্ মনে একটা ধাক্কা খেয়েছিল। বাহির বিশ্বে বিরাট এই ভারতীয় দেশের স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য সর্বস্ব পণ করে বাহিনী গঠন করেছেন। কটূক্তি, কারাগার, এমন কি মহামানব গান্ধীজীর বিরাগ পর্যন্ত তাঁকে সেই মহান্ লক্ষ্য থেকে বিচলিত করতে পারেনি। স্বেচ্ছানির্বাসনের আত্ম-বিসর্জনের দিক দিয়ে সাংসারিক মানুষ স্বয়মের চোখে নেতাজী রামায়ণের নায়কের মতো বড। তাঁর আহ্বানের বিপরীত পথে, বিরুদ্ধতা করবার জন্য সে কমিশন নিতে যাচ্ছে। স্বদেশসেবার মন্ত্রে সে উদ্বুদ্ধ না হলেও উৎফুল্ল হয়ে থাকে। সে কি সেই মন্ত্রের বিপক্ষে যেতে চাইছে?

সংশয় আর আত্মবিশ্লেষণের দোলায় অস্থির হয়ে সে ভোরবেলা রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে গিয়ে মন্দিরে অনেক, অনেক ক্ষণ বসেছিল।

একজন স্বামীজী দূর থেকে স্থির আসনে ধ্যানমগ্নের মত অথচ অশান্ত এই

যুবককে অনেক ক্ষণ লক্ষ্য করেছিলেন। সে যখন উঠে পড়ল তখন তাকে সস্নেহে কাছে ডাকলেন। গভীর স্নেহ ভরে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার মনে কি খুব একটা অশান্তি আছে, বাবা? যদি পার, অকপটে ৺ঠাকুরের কাছে নিবেদন করে দাও। তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করবেন।

স্বামীজীর স্নেহ ও আন্তরিকতা তার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। সে একটু কথাবার্তার পরে স্বামীজীকে তার সমস্যাটা সংক্ষেপে জানাল।

সে নিজের দেশকে ভালবাসে—যদিও এ পর্যন্ত দেশের জন্য হাতে কলমে কিছু করেনি। আজ দেশ নতুন এক বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হতে চলেছে। সে আক্রমণকে যে শক্তি প্রতিরোধ করছে সে শক্তিও পদে পদে লড়ে দেশটাকে লণ্ডভণ্ড করে ফেলবে। ডিনায়্যাল পলিসি চালাবে। কিন্তু স্বেচ্ছায় সহজে দেশের উপর প্রভুত্ব ছাড়বে না। এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশের সৈন্যদলে কমিশন নেওয়ার সম্বন্ধে ঠাকুরের কি নির্দেশ তা সে বুঝতে পারছে না। তাই তার মনে এত অশান্তি।

ইচ্ছা করেই সে সুভাষচন্দ্রের বেতার আহ্বানের কথা উল্লেখ করল না। সত্যিই তিনি স্বাধীনতা ফৌজ গঠন করেছেন কিনা, ভারত উদ্ধারের জন্য আদপেই ব্রিটিশের ভারতীয় সেনার মুখোমুখি হবেন কি না, অথবা জার্মানী থেকে ভারতে কখনো আসবেন কিনা এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর সেদিন ছিল না। কাজেই সে সব কথা সে তোলেনি।

স্বামীজী খুব মমতাভরে বললেন,—বাবা, ৺ঠাকুরের কি নির্দেশ হত এ অবস্থায় তা আমি হঠাৎ বুঝে বলতে পারব না। হিংসা হানাহানির সংসারের প্রশ্ন হয়ত কখনো তাঁর কাছে কেউ নিয়ে আসত না। তবে একটা তুলনামূলক উদাহরণের কথা আমি জানি। আমাদের চেনা একজন খুব বিশিষ্ট সরকারী চাকুরে স্বদেশী হওয়া সত্ত্বেও সর্বোচ্চ সরকারী চাকরীর জন্য বিলেতে পরীক্ষা দিতে যাবেন কি না এই প্রশ্ন নিয়ে ঠাকুরের এক মন্ত্রশিষ্যের কাছে এসেছিলেন। সেই ছাত্রকে তিনি বলেছিলেন যে দেশ এক কালে স্বাধীন হবে; তখন ৺ঠাকুরের কথা হৃদয়ে নিয়ে চলে এমন অভিজ্ঞ লোক দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনের জন্য লাগবে। অতএব সরকারী চাকরীকে এড়িয়ে যেয়ো না। আমরা মনে মনে জানি সেই উপদেশ ব্যর্থ হয়নি। আপনিও এই উদাহরণ মনে রেখে নিজের পথ নিজেই বেছে নিন। রাজনীতির চেয়ে দেশ আর মানুষ বড়।

একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে স্বামীজী আবার বলেছিলেন, আর দেখুন,

স্বামীজী নিজে ছিলেন কর্মযোগী, কর্মবীর। আপনার কর্ম যদি যুদ্ধের পথে নিয়ে যায়, সে পথেও তো আপনি দেশের সেবা, দেশের জীবের সেবা করতে পারেন। জানেন তো, যত মত তত পথ।

এবার স্বয়মের মনে আর কোন দ্বিধা রইল না। লিভ এ লিটল, একটু-খানি বাঁচো। উজ্জ্বল উৎসাহ ও সুন্দর স্বাস্থ্যে ভরপুর সে। তবু বাঁচার কোন সম্মানজনক উপায় সে এই দেশে এই মুহূর্তে আর কোন পথে খুঁজে পায়নি। কিন্তু এই পথও একটা পথ।

ভারতকে রক্ষা করবার জন্য সব প্রদেশের লোকই পাওয়া যাবে। যাবে না শুধু বাঙালীকে। সে চাকরীর ভিখারী হয়ে দরখাস্ত হাতে ডালহাউসীতে, আর ভাতের ভিখারী হয়ে ফ্যানের টিন হাতে অলিতে গলিতে বিচরণ করছে। স্বয়ম্ বেছে নিয়েছে অন্য এলাকা। যদি সে কমিশন পায়—যদি সে যুদ্ধে জয়ী দলের একজন হয়ে ফিরে আসে—যদি দেশ স্বাধীনতা পায়···

সেই স্বাধীনতা দেবার জন্য অশেষ দুঃখ বিপদ বরণ করে মরণের পথ বেয়ে যারা শেষ পর্যন্ত ভারতের ভিতরে এগিয়ে এসেছে তাদেরই একজন সামনে দাঁড়িয়ে।

তাকে দেখে নীরেন চৌধুরী একটু বিহ্বল হয়ে গেছে। সেই সুযোগে সে শত্রুনিপাত করতে পারে। অথবা তাকে বন্দী করবার চেষ্টা করতে পারে। কোন সন্দেহ নেই যে মনে যতই সাহস থাকুক নীরেনের দেহে অপুষ্টি আর ক্লান্তির চিহ্ন খুব পরিষ্কার। এবং তার হাতের বন্দুকটি মিত্রশক্তির নতুন বন্দুকের তুলনায় অত ক্ষিপ্র বা মারাত্মক হবে না। জ্বি···

না। সে 'জিফ' বলে নীরেনদাকে অমর্যাদা করবে না।

কিন্তু সামরিক শপথ, আনুগত্যের শপথ নিয়ে যে রেগুলার কমিশনে সেনা বাহিনীতে ঢুকেছিল সেই মেজর নীরেন চৌধুরীকে সে মর্যাদা দেবে কি করে? মেজরের বীরবপু, সামরিক জৌলুস, দৃপ্ত পদক্ষেপ তার কাছে প্রশংসার বস্তু ছিল। হঠাৎ যখন তাকে অজ্ঞাত অপারেশন্যাল এরিয়াতে যুদ্ধের এলাকায় বদলী হতে হল তখন স্বয়ম্ তাকে কি শ্রদ্ধার চোখেই না দেখেছিল। হোক না বিদেশী প্রভুর সেনানী, তবু সামরিক বীর তো বটে। নির্বীর্য নিষ্কর্মা নিষ্ফল বাঙালী জগতে নীরেন একজন ব্যতিক্রম ছিল।

সেই নীরেনদা সামরিক শপথ ভেঙেছে? কি করে সম্ভব হল?

আশ্চর্য নীরেনদার চোখে কিন্তু হিংসার আভাস নেই। স্বয়মের কোন ক্ষতি করা বা তাকে গুলি করার কোন চেষ্টা নেই। এই অবসরে তার মনের কথা জেনে

নেবে। তাকে পালাতে দেবে না, মারতে দেবে না। বরং তার কাছ থেকে কোন সামরিক খবর বের করতে পারলে নিজের কর্তব্যেরই সুরাহা হবে। রিভলভারটা যথাস্থানে তৈরী রইল।

সাইকলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার স্কুলের শিক্ষা অনুসারে সে প্রথমেই আঁতে ঘা দিল।

—নীরেনদা তুমি রেগুলার কমিশনের উঁচু অফিসার ছিলে। তুমি সামরিক শপথ...

এতক্ষণে নীরেনের যেন প্রাণ ফিরে এল। কলেজের নামকরা ছাত্র, পাড়ার আদর্শ যুবক স্বয়ম্‌কে দেখে ওর মনে একটা বিরাট বিহ্বলতা এসেছিল। সেই স্বয়ম্ আজ ওর শত্রুপক্ষ। স্বয়ম্ অত ক্ষিপ্র না হলে নির্ঘাৎ নীরেনেব গুলির আঘাতে এখনি শেষ হয়ে যেত।

ভাইয়ে ভাইয়ে সাক্ষাৎ যুদ্ধেব এই প্রত্যক্ষ সম্ভাবনা, আশ্চর্যের কথা, নীরেনের একবারও মনে হয়নি। ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩এ, সিঙ্গাপুরে নেতাজী সমস্ত আজাদ হিন্দ ফৌজ আর জেনারেল য়ামামোটোর বাহিনীর সামনে মহা সমারোহে যে শপথ নিয়েছিলেন আর যে আহ্বান প্রচার করেছিলেন তার মাত্র একটিই ফল হবার কথা।

নেতাজী সেদিন আবেগরুদ্ধ গদগদ কণ্ঠে বলেছিলেন,—

"ঈশ্বরের নামে আমি এই পবিত্র শপথ করছি যে ভারতের আটত্রিশ কোটি স্বদেশবাসীকে স্বাধীন করবার জন্য আমি, সুভাষচন্দ্র বোস, আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত স্বাধীনতার পবিত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাব।"

সেটা হচ্ছে প্রাণের শপথ, পেটের শপথ নয়।

সেদিন থেকে সব আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বপ্ন ছিল যে ওরা যখনি শত্রুপক্ষের ভারতীয় সৈন্যদের মুখোমুখি হবে তারা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য, ব্রিটিশের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলবার জন্য আজাদী ফৌজের সঙ্গে হাত মেলাবে। সেই ভরসাতেই তো এত কম সৈন্যদল, আরো কম অস্ত্রশস্ত্র এবং তার চেয়ে আরো কম খাদ্য সরবরাহ নিয়েই দুর্গম বর্মার আসামের বন আর পাহাড় উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছে। আগুয়ান এলাকায়।

শুধু নেতাজীর নয়, জাপানী সেনাপতি মুটাগুচিরও সেই আশা। প্রধান-মন্ত্রী তোজো সেই আশা করেই টোকিয়োতে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীন অস্তিত্ব আর ক্ষমতা মেনে নিয়েছিলেন।

আর এখন তার ছোট ভাইয়ের মত স্বয়ম্ কিনা তাকেই জিজ্ঞেস করছে সামরিক শপথ আর আনুগত্যের কথা!

হায়! দেশ তো জানে না সেই শপথ আর সেই আনুগত্যের বন্ধন থেকে ব্রিটিশ প্রভুরাই তাদের মুক্তি দিয়েছে। নিজেদের কাজ ও ব্যবহার দিয়ে।

সে কথা কি আজাদ হিন্দ রেডিয়োতে বোঝান হয় নি?

যদি না-ও হয়ে থাকে একে অন্তত সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিই। আর এই যুদ্ধের এলাকায় পালেল গ্রামের কাছেই বিমানঘাঁটি। ওটা দখল হয়ে গেলেই এই শপথের কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে ইস্তাহার ছড়িয়ে দিতে হবে ব্রিটিশ পক্ষের ভারতীয় জন্দীদের ঘাঁটিগুলিতে। তাহলেই আমাদের সেনাদল, অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য সরবরাহ আর জয়যাত্রা সবই হাতে এসে যাবে।

নীরেন স্বয়ম্‌কে বলল, তুমি সামরিক শপথের কথা তুলেছ। আমিও সে কথাই তুলব। তোমার আনুগত্য আসলে কোথায় আছে সে কথাও তুলব। এই এলাকাতে এখন আমি ছাড়া আর কেউ আমার রেজিমেণ্টের নেই। জাপানী একটা কোম্পানী দুপুর পর্যন্ত এখানে ছিল। তারা তোমাদের দলের সবাইকে সাফ করে দিয়েছে বলে আমায় রিপোর্ট দিয়ে ও আমাদের উপর এখানকার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সরে গেছে। তোমার আমার মধ্যে একটুখানি সময়ের 'ট্রুস' যুদ্ধ বিরতি হোক। তারপর আবার আমাদের পথ আলাদা। আলাদা পথে যাবার আধ ঘণ্টা পরে আমরা আবার শত্রু হব। ও. কে.?

—ও. কে. নীরেনদা। ইট্‌স্ এ ডিল। এই চুক্তি হল।

—তবে শোন, স্বয়ম্। আমাদের আনুগত্যের শপথ থেকে আমাদের তখনকার কর্তারাই মুক্তি দিয়ে গিয়েছিল। দি গ্রেট সিঙ্গাপুর 'দারেণ্ডার' যে কি বস্তু ছিল তা তোমরা কেউ দেশে জানতে পারনি। জানলে আর শপথের কথা তুলতে না। এবং ইংরেজের সৈন্যদলে নামও লেখাতে না। সিঙ্গাপুরে ইংরেজ আর অস্ট্রেলিয়ানরা যুদ্ধবন্দী হল। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে ওরা সৈনিকের রক্ষাকবচ সৈনিকের রক্ষণাবেক্ষণ খানাপিনা সব পেল। আর আমরা ভারতীয় ফৌজ? আমাদের কোন বাপ মা রইল না। আমরা যুদ্ধবন্দী নই। আমাদের জন্য বন্দীকারীর কোন দায় দায়িত্ব নেই।

—এ অসম্ভব কথা। নিশ্চয়ই এরকম হয়নি।

—হয়েছে, স্বয়ম্, হয়েছে। ট্রুথ ইজ স্ট্রেন্‌জার দ্যান ফিকসন। তুমি জান না হয়ত যে আমি সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণের আগেই মালয়ে সত্যিকারের যুদ্ধে

বন্দী হয়েছিলাম। আমার উপর জাপানীদের জীবন্তে বেয়নেট প্র্যাকটিশের অর্ডার হয়েছিল আমার মুখ থেকে কোন কথা বের না হওয়ার জন্য। সেই আমাকেও গোঠে মাঠে অনাথ ছাগলের মত ছেড়ে দিল জাপানীরা। তুমিই বল, আমি কি যোদ্ধা রইলাম? আমি কি যুদ্ধবন্দী রইলাম? কার প্রতি থাকবে আমার লয়্যালটি?

—অসম্ভব!

—হ্যাঁ, ভাবতেও অসম্ভব লাগবে বই কি। কিন্তু যে প্রভুর প্রতি লয়্যালটির শপথ ছিল সেই প্রভু নিজেই সে শপথ থেকে তার কাজে, তার ব্যবহারে, তার আত্মসমর্পণের চুক্তিতে আমাদের মুক্তি দিয়েছিল। যোদ্ধার আনুগত্য থাকে রাজার কাছে আর দেশের কাছে। রাজা মুক্তি দিয়েছে এবং দেশও সেই রাজার পথ থেকে সরে এসেছে। অহিংসভাবে গান্ধীজী আর সামরিকভাবে নেতাজী দেশের প্রতি আমাদের আনুগত্য দাবী করেছেন। আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজ সে শপথ নিয়েছি। তোমরাও তোমাদের শপথ পরিবর্তন করে আমাদের সঙ্গে বিজয় অভিযানে চলো। নেতাজীর আহ্বান। দিল্লী চলো।

—না, নীরেনদা, তা হয় না। একজন ইংরেজ সেনানী ভুল করেছে, ভয়ে ভেড়া হয়ে গেছে। তা বলে বাঘের দল তাদের আত্মসম্মান ভুলে যায় না। তোমাদের তেরঙা পতাকাতে চরখার বদলে বাঘ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, লাফ দিচ্ছে এই দেখিয়েছ। তোমরা হচ্ছ বাঘ। তোমরা শপথ ভাঙবে? এটা কি স্বপ্নেও কল্পনা করা যায়?

—আমাদের শপথ আমাদের দেশের কাছে, ভাই। তোমার শপথও তারই কাছে। তোমরা সবাই আমাদের সঙ্গে এক পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে দিল্লী চলো। আমাদের ফার্স্ট আই. এন. এ. ডিভিসন তোমাদের সঙ্গে পেলে এক দিনে পালেলের বিমানঘাঁটি দখল করে নিতে পারবে। তার পরের দিন ইম্ফল। তার পরেই সারা ভারতে শুধু একটি ধ্বনি থাকবে—জয় হিন্দ।

বলতে বলতে নীরেন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল। এই উদ্দীপনার কল্যাণেই ওদের সেকেণ্ড গেরিলা রেজিমেণ্ট একটা অসম্ভব দুঃসাহসী কাজ করে বসেছিল। মেইমিও শহরের নিভৃত আরামে বসে জেনারেল মুটাগুচি ডিভিসনাল কম্যাণ্ডার কর্নেল কিয়ানীকে বলেছিলেন যে ৩৩ নম্বর জাপানী ডিভিসনের সঙ্গে ইম্ফল বিজয়ের গৌরবের অধিকারী যদি হতে চান তাহলে এখনি সসৈন্যে ইম্ফলের দিকে ছুটুন। এখনি পালেল অভিযানের বাঁদিকের লাইন ধরে

চামোলের গিরিপথগুলি রোধ করে এগিয়ে যান। ১লা মে আমরা পূর্ব থেকে বিমানঘাঁটি আক্রমণ করব আর আপনারা করবেন দক্ষিণ থেকে।

দ্বিতীয় গেরিলা রেজিমেণ্ট সেই আশাভরা উদ্দীপনায় সব ভারী জিনিসপত্র মায় মর্টার আর মেশিন গান পর্যন্ত পিছনে ছেড়ে দিয়ে মাথা পিছু একটা কম্বল, একটা রাইফেল আর মাত্র পঞ্চাশ রাউণ্ড করে গুলি নিয়ে পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছিল।

সে খবর শত্রুর কাছে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু নিজের ছোট ভাইয়ের মত যাকে মনে করে সেই আনকোরা নতুন শত্রুসৈন্যের অফিসারের কাছে এখন আনুগত্যের, সৈনিকের কর্তব্যের কথা শুনতে হচ্ছে।

উত্তেজিত হয়ে নীরেন বলল, শোন লক্ষ্মীটি, তুমি আমাব ছোট ভাই। ব্রিটিশ দলে মাত্র সম্প্রতি যোগ দিযেই যে ফরোয়ার্ড এরিয়াতে আসার জন্য নির্বাচিত হয়েছ তাতে তোমার বুদ্ধি আব বীর্যের পরিচয় আছে। তোমার বীর্যকে আমি সম্মান দিচ্ছি। তোমার বুদ্ধি দিয়ে আমার কথাটা শোন।

—না, নীবেনদা, তুমি আমায় প্রশংসা করে দুর্বল কবে তুলো না। তোমার প্রভুধর্মেব দোহাই। তুমি তো জান আমি কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ার ছিলাম। মনে-প্রাণে দেশেব সেবক ছিলাম।

একটু চুপ কবে থেকে যোগ কবে দিল, এবং এখনো আছি।

—তুমি আমার ছোট ভাই। মানুষকে অহবহ জীবন আর মরণের মধ্যে একটা বাছাই কবে নিতে বাধ্য হতে হয়। যতক্ষণ মবণ সীমানা পর্যন্ত এসে না পড়ে ততক্ষণ সে বাঁচতে চায়। কিন্তু যে কোন সময় মরতে হতে পা''র, কারণ সৈন্যরা শুধু হুকুমের পুতুল। এই আজাদ হিন্দ হচ্ছে একমাত্র সেনাদল যারা পুতুল নয়, যারা অন্নদাস নয়। যুদ্ধে তারা মার্সিনারী নয়, ব্রতে তারা মিশনারী।

মাথা নীচু কবে স্বয়ম্ চুপ করে রইল। মনে তার উদ্বেলিত অতলান্ত সাগরের বিক্ষোভ।

নীরেন তা লক্ষ্য করে বলে চলল, শোন, ভাই, তুমি ১৯২৮ সনে নেতাজীর অধীনে বালসেনা হয়ে কলকাতা কংগ্রেসে কাজ করেছিলে। সেদিনকার জি. ও. সি. আজ নেতাজী। এই তেসরা ফেব্রুয়ারী তিনি আমাদের যুদ্ধযাত্রা সম্ভাষণে কি বলেছিলেন তাই বলছি। আমার কথ. য়। নেতাজীর বাণী:

"রক্ত রক্তকে আহ্বান করছে। নষ্ট করাব মত সময় আমাদের নেই। অস্ত্র তুলে নাও। যে পথ পূর্বসূরীরা তৈরী করেছিলেন সে পথ তোমাদের সামনে।

শত্রুসেনার মধ্য দিয়ে কেটে আমরা পথ করে নিব। অথবা ভগবান্ যদি চান তবে আমরা শহীদের মৃত্যু বরণ করব। এবং আমাদের শেষ নিদ্রায় যে পথ আমাদের সৈন্যদলকে দিল্লীতে নিয়ে যাবে সেই পথকে চুম্বন করব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। দিল্লী চলো।"

নীরেন বাইরে শান্ত স্বয়মের মনের অশান্তি বুঝতে পেরে আরো বলল, জাপানী প্রধান সেনাপতি জেনারেল কয়াবেকে নেতাজী বলেছেন যে ভারতের ভূমিতে প্রথম যে রক্তবিন্দু পড়বে তা হবে আই. এন. এ. সেনার। সেই আনন্দে আমি এগিয়ে এসেছি। তুমিও এসো ভাই।

ওকে তবু চুপ করে থাকতে দেখে নীরেন বলল, শোন, স্বয়ম্, আজ সব চেয়ে বড়, বলতে গেলে ইতিহাসে এই একমাত্র, সুযোগ এসেছে আমাদের দেশকে স্বাধীন করবার। আমার সঙ্গে এখনি চলে আসতে না চাও, না হয় এসো না। কিন্তু নতুন মন্ত্র এখনি নাও। তোমায় ব্রিটিশ লাইনে ফিরে যেতে হবে। বোঝাতে হবে সব ভারতীয় অফিসার আর আদার র‍্যাঙ্ককে অর্থাৎ সাধারণ সেনাদের যে যাঁর জন্য তারা শপথ নিয়েছে তিনি হচ্ছেন মা, দেশমাতা, ভাড়াটে মনিব নয়। তোমরা শুদু অন্নদাস মার্সিনারী নও, শুধু বৃত্তিধারী প্রফেসন্যাল নও, তোমরা মায়ের সন্তান। সব চেয়ে বড পরিচয়। তার মূল্য তোমাদের প্রত্যেককেই দিতে হবে। এই হচ্ছে মহাজন্মের লগ্ন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা মুহূর্তের জন্য স্বয়মের মনকে ওলট পালট করে দিল।

কে বড়? মা, না মনিব?

সন্দেহ নেই যে মা বড। চন্দ্রগুপ্ত সেই মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন পাহাড়ী বাজার সহায়তায় আর ম্লেচ্ছ আলেকজাণ্ডারের সমর শিক্ষায়। মায়ের মুক্তি ও নিজের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল একাধারে। এ যুগের স্বাধীনতার মর্যাদা আরো অনেক বেশী। কারণ এই বিদ্রোহের কারণ ব্যক্তিগত নয়; জাতিগত, নীতিগত।

কিন্তু এখনো সমরশিক্ষাও যে সম্পূর্ণ হয়নি। না জুটেছে যুদ্ধের সরঞ্জাম।

যদিও গান্ধীজীও বলেছিলেন যে চেনা দানবের চেয়ে অচেনা দানবই শ্রেয়, এই অচেনা জাপানীরা তাদের আজকের দিনের সহকারী আজাদ হিন্দ ফৌজকে যে কি হাস্যকর নামমাত্র সহায়তা দিচ্ছে, কি নির্মম বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তা স্বয়ম্ খুব ভাল করেই জানতে পেরেছে। সব খবর পেয়েছে বন্দী আজাদ হিন্দ সৈন্যদের কাছ থেকে।

কণ্টকৈব কণ্টকম্ এই নীতি শুধু সবলের হাতেই সফল হয়।

সে সব তর্কের সময় এখন নয়। ব্রিটিশের সঙ্গে আজ শুধু ভারতীয় নয়, মার্কিন আর সাম্রাজ্যের সব দেশের সৈন্যদল আর সমরসম্ভার আছে। জাপানী সরবরাহ রেখা যে রবারের মত টানতে টানতে সরু হয়ে প্রায় ছিঁড়ে এসেছে তা ওদের এয়ার রিকনয়সান্সে, বিমান পর্যবেক্ষণে, ভাল ভাবেই ধরা পড়েছে।

এত অসহায় এই আজাদ হিন্দ ফৌজ। ওরা জানে না বা ভাবতে চায় না যে প্রচারে নয়, পরাক্রমে মিত্রশক্তিকে হঠাতে হবে। অন্তত সীমান্ত পার হয়ে বাংলা দেশ পর্যন্ত পৌছবার আগে দেশমাতার বন্দনা গান কামান গর্জনকে স্তব্ধ করতে পারবে না। কিন্তু সে হিম্মত জাপানীদের হবে না। ইম্ফল কোহিমার গিরিমালা পার হবার প্লেন ও যান তাদের নেই।

তার আগে বালুচ পাঠান থেকে গুর্খা মার্কিন আফ্রিকান সৈন্যদল একমাত্র যে ভাষা বুঝবে তা হচ্ছে বুলি নয়, গুলির।

সবার উপরে সবচেয়ে কঠোব সত্য এই যে ভাবতীয় সৈন্যদলের সামরিক শপথও এক দিনে ভোলানো যাবে না। আজাদী ফৌজের সেই শপথ থেকে মুক্তিব যে কারণ ঘটেছিল ভারতীয় ফৌজেব মনে তার ঝঙ্কার উঠতে সময় লাগবে। যুদ্ধেব মধ্যে যোদ্ধার মনে মহতের আহ্বানে সাড়া দেবার সময় নেই।

হায়, সে সময় পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের অস্তিত্বের মেয়াদ হয়ত নেই। নীরেনদা, বীর উন্নতদেহ উদ্ধতবক্ষ নীবেনদার হাতে মাত্র একটা পুরানো রাইফেল আর মুখে অপুষ্টির রুক্ষ ছাপ। এর মধ্যে মিত্রশক্তির সব সৈন্যকে জঙ্গলী জলপাই রঙের ইউনিফর্ম দেওয়া হয়েছে। তাতে শত্রুর দৃষ্টি এড়ানো যায়। আজাদ হিন্দের গায়ে সেই পুরানো ছিঁড়ে-আসা খাকী ইউনিফর্ম।

হায়, উৎসাহে উদ্দীপনায় মন জ্বালানো যায়। কিন্তু কামান চালানো যায় না।

নিরুপায় নেতাজী। অস্ত্র আর যানবাহনের সামান্য দাবীগুলিও পূর্ণ হলে অসামান্য দান দিতে পারতেন। কিন্তু তা হবার নয়।

মাত্র বছর তিনেক আগেই বর্মা থেকে পালানো সৈন্যদের যে মর্মান্তিক অবস্থা হয়েছিল রাশিয়া থেকে হেরে আসা নেপোলিয়নের বাহিনীরও তা হয়নি। হাই তুলে 'হরি হে দয়া কর' এই প্রার্থনাটুকু করারও সময় মেলেনি। 'কট উইথ দেয়াব প্যাণ্টস্ ডাউন', মুক্তকচ্ছ অবস্থায় বেসামাল ব্রিটিশ সেনাদল প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল।

অত্যন্ত নোংরা, ঘামে ধূলোয় কালো পলেস্তারাপড়া শার্ট আর ম্যালেরিয়ায় ভরা জঙ্গলের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত শর্ট পরে পালাচ্ছে ব্রিটিশের সেনাদল। বেশীর ভাগেরই পায়ে বুট পর্যন্ত নেই। যদি বা আছে তার উপরের চামড়া পটাপট ,আর্তনাদ করে নীচের হীল ছেড়ে পালাই পালাই করছে। অনেকেরই থরথর কাঁপা শুকনো ঠোঁটে আর আগুনরাঙা চোখে ম্যালেরিয়ার নিশানা। কারো বা হলদে চোখমুখে ন্যাবার নিশানা। রক্ত-আমাশার গন্ধ আব চিহ্ন জঙ্গলী হাঁটাপথে রাখতে রাখতে তারা ধুঁকছে আর এগোবার চেষ্টা করছে। একটু বসবার বা উবু হয়ে মলত্যাগের সাহস নেই, কারণ একবার বসলে হয়ত আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। পায়ে গায়ে দুর্গন্ধ ঘা আর তাব উপর ভনভন করছে মাছি আর গজাচ্ছে পোকা। বীভৎসতার চূড়ান্ত প্রতিমূর্তি হয়ে গেল হিজ ম্যাজেস্টিস ইম্পিরিয়াল আর্মি।

শুধু পরাজিত নয়, পদাহত। শুধু পদাহত নয়, বিতাড়িত। ইংলণ্ডের সৌখিন সমাজের ফক্স হান্টিংয়ের মত শিকারী কুকুর দিয়ে খেদানো শিয়ালেব দলের মত।

মোটেই মনোহর চিত্র নয়।

পরাজয়ের চিত্র কখনো তা হয় না।

হায় নেতাজী!

সেদিনই ছিল মহাজন্মের লগ্ন।

আজ সে লগ্ন বয়ে গেছে। সুযোগ ভগবান শুধু একবারই বোধ হয় দেন।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের এলাকায় শত্রুপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবিতাব কথার একটি হঠাৎ বাসন্তী দোলাকে মনের মধ্যে লালন করা চলে না। পৃথিবী নিষ্ঠুর। সময় আরো নিষ্ঠুর।

গহন বনের লতাপাতার মধ্য দিয়ে নতুন চাঁদের, আলো নয়, বেখা বর্শার ফলার মত এদিক-সেদিক এসে মাটিতে বিঁধছে। বাতাস ঘন জঙ্গলেব মধ্যেও হঠাৎ হঠাৎ কেঁপে উঠছে। মর্টার ছোঁড়ার পর যেমন কবে হঠাৎ কেপে ওঠে সেরকম ভাবে। জোনাকীগুলি গাছের নীচে নেমে এসে তারার খেলা শুরু করেছে।

সীমান্তের সবুজ নরকে একটুখানি স্বর্গের পরশ, মধুরের সুবাস ওরা দুজনেই পেয়েছিল মাত্র মুহূর্তের জন্য।

কিন্তু আর নয়। হঠাৎ হয়ত দূরে কোন লাল স্টার শেল আকাশ ফুঁড়ে

তেড়ে আসবে। হঠাৎ হয়ত কোন স্নাইপারের রাইফেল বনভূমিকে উচ্চকিত করে ওদের দুজনকেই নির্বিচারে লুটিয়ে দেবে। নীরেনের নিজের কথা যে একটিও বলা হয়নি এখনো।

যদি তা বলতে হয়, এখনি, এই নিমেষেই, লগ্নের রেশ নিঃশেষ হয়ে যাবার আগেই তা বলতে হবে।

ইউনিফর্ম মানুষটার দেহ বদলিয়ে দিয়েছে। কর্তব্য তার জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু মন তো সব কিছুর বাইরে। সব কিছুর উপরে। তাই তো ওদের দুজনেরই মনে এত দোলা, এত আলোড়ন। শত্রুর সামনে। মৃত্যুর সামনে।

নীরেনই ওদের নিঃশব্দ নিস্তব্ধতা প্রথম ভাঙল। বলল, বুঝেছি স্বয়ম্। তোমার সঙ্গে শত্রুর বদলে বন্ধু হিসাবে মিলিত হওয়া আর সম্ভব নয়। ভাই হিসাবে এই দেশই শেষ দেখা। যুদ্ধের মধ্যেই সত্যিকারের দেখা হবে। তবু, তবু একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

গভীর মমতায় স্বয়ম্ ওর দিকে তাকাল।

নীরেনদা, প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের চোখে নীরো আর দূর থেকে তরুণদের চোখে হীরো, নীরেনদার নাম মিলিটারী ক্যাজুয়ালটির তালিকায় নেই। মিসিং, বিলিভড কিলড ইন য়্যাকশন এই অনির্দিষ্ট নিয়তির তালিকায় আছে।

সেই নীরেনদা দু বছর অশেষ দুঃখ দুর্গতি আর পরে অসম্ভব এক দুরাশার ব্রত গ্রহণ করেছে। সেই দুরাশাতেই দেশের দিকে এগিয়ে এসেছে। মানুষ নীরেনদা কি জিজ্ঞেস করবে তা সে নিজেই, নিজে থেকেই অনুমান করে বলে দেবে।

—নীরেনদা, সীমাদির খবর আমি জানি। শেষ দেখা দিল্লীতে। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে ব্যাকুল হয়ে তোমার খোঁজে যাতায়াত করছেন।

—তুমি ঠিক বলছ, ভাই? সত্যি? সত্যি?

—হ্যাঁ, নীরেনদা। একেবারে সত্য কথা। আমি তখন দিল্লীতে এসেছিলাম কাজে। উনি আমার খবর পেয়ে আমায় সঙ্গে নিয়ে এ. আই. আর.-এ গিয়েছেন প্রথম বার। যদি আমার ইউনিফর্মের ন্যাণে ওরা একটু বেশী যত্ন করে আজাদ হিন্দ রেডিয়ো থেকে তোমার খবর ধরবার চেষ্টা করে সেই আশায়।

—কেমন আছে?

—এমন অবস্থায় যেমন থাকা সম্ভব তেমন। কিন্তু নীরেনদা, তুমি এই হিসাবে ভাগ্যবান। সীমাদি তোমারই জন্য অপেক্ষা করছেন। তুমি শুধু দেশে ফিরে এসো।

তারপর একটু ইতস্তত করে শ্যাম্ ফিসফিস করে বলল, তোমার নতুন শপথ ভাঙতে আমি বলব না। কিন্তু তুমি নিজের মন নিজে আরেক বার বিচার করে নাও। পরে আর সুযোগ পাবে না।

—না ভাই, তোমার আর আমার পথ পৃথক। সম্পূর্ণ বিপরীত সে পথ। যদিও শেষ পর্যন্ত বিরোধ নেই আমাদের উদ্দেশ্যে। তবুও। আচ্ছা, এই শেষ। লেট আস পার্ট। আধ ঘণ্টা পরে আবার যদি দেখা হয় আমাদের নিজেদের আলাদা ধর্ম হিসাবে কাজ অর্থাৎ যুদ্ধ করব। আর ভুলে যাব যে তোমার আমার মধ্যে এখন কোন দেখা হয়েছিল। গুড বাই য়্যাণ্ড গুড লাক।

ওরা দুজনে বিপরীত পথে চলে গেল। আধ ঘণ্টা পরে আবার ওরা দুই শত্রুপক্ষ হয়ে যাবে।

চাঁদের আলো তখনো জঙ্গলী লতাপাতার মধ্য দিয়া ঝরে পড়ছে।

কিন্তু তীক্ষ্ণ বর্শার মত নয়, স্নিগ্ধ বর্ষার মত।

২৯

চিনি গো চিনি।

না। কোন মিঠে প্রেমের স্মৃতি নয়।

ব্যর্থ প্রেমের মৃদু হাহাকারও নয়।

একজন পাগলের প্রলাপ। আত্মবিস্মৃত জীবনের গানের রেশ। চিনি গো চিনি।

যে মৃদুস্বরে গান করে সে এই গানের পুরোটা জানে কিনা সন্দেহ। সুরটা যে ঠিক মত জানে না তা তো বোঝাই যাচ্ছে। শুধু আপন মনে এই যুদ্ধে আহত ঘরে ফেরা পাগল গেয়ে যায়—চিনি গো চিনি।

এই ক'টা কথাই সে রোজ গায়। হামেশাই গুনগুন করে। কখনো বেশ জোরে। সুরে নয়, বেসুরে। পাড়ার ছেলে ছোকরারাও বেশ মজা পায়। অনেক সময় মুখ ভেংচিয়ে ওরাও সুর করে বলেছে—চিনি গো চিনি।

তার বেশী কিছু ওরা ভাবেনি।

তবু ওরাও শেষ পর্যন্ত পাগলের একঘেয়ে গান পাগলামীতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

রতন বলল, ভাল্লাগে না, ভাই। রোজ এই এক ভ্যানভ্যানানি। এই রকে আর পাগলাটা বসতে দেবে না দেখছি।

এই ছোট্ট গলির ছোট্টতর পুরনো বাড়িগুলোর কুলতিলক ওরা। ওদের অন্য কোথাও বিকেলে যাবার বা বসবার জায়গা নেই। দূরে বড় রাস্তার কাছে এক কালে পার্ক বলে একটি খোলা জায়গা ছিল। এখন সেটা এ. আর. পি. ট্রেঞ্চ আর ব্যাফল ওয়ালের কল্যাণে পাইকারী পায়খানা। এবং খুবই স্বাস্থ্য-সম্মত অর্থাৎ হাইজিনিক। ওপেন এয়ার যাকে বলে।

রতনের মত ওরাও এই রকের শান্তিভঙ্গে দুঃখিত। মিলিটারীরা পাগলকে নাকি হোম ট্রিটমেন্টে ভাল হবে এই অজুহাতে শ্বশুর বাড়িতে গছিয়ে দিয়ে গেছে। পাগলের বৌ আগে থেকেই নিজের বাপের বাড়িতে এসে আশ্রয়

নিয়েছিল। এখন যুদ্ধফেরৎ পাগলকে কর্তারাই এখানে তুলে দিয়ে নিজেদের দায় কাটিয়ে নিয়েছে।

ফৌজী থেকে অবশ্য চিকিৎসার নামে ভাল মাসোহারা দিচ্ছে। কাজেই শ্বশুর বাড়ির কোন আপত্তি হয়নি। সেই সুবাদে র‍্যাশনটারও সস্তা বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। যুদ্ধের বাজারে এইটুকুর জন্য শত্রুকেও পোষা চলে। আর এ তো শুধু গরীব হাঘরে জামাই। হলোই বা শেলের ঘায়ে পাগল হয়ে যুদ্ধ-ফেরৎ। পাগল আর শক-গল দুই-ই একই চীজ মোদ্দা কথা।

তবু সমীর বলল, শোন, আমরা হচ্ছি একনিষ্ঠ পতিব্রতা যাকে বলে। বাড়ির ভিতরে পাগলই থাক আর ভূতই থাক আর আমাদের যতই অসুবিধা হোক আমরা গলির রকখানার দখল ছাড়ছি না।

রতন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, অবশ্য না। এমনকি বে-পাড়ার কাউকেও ভাগ বসাতে দেব না। আমরা লড়তে হিম্মত রাখি বাবা। ইংরেজ বর্মার দখল ছেড়েছে। আবার চুরি করে ঢুকবার চেষ্টাও করছে। কিন্তু আমরা ওদের চেয়ে বেশী মিলিটারী। এমন কি য়্যামেরিকান শ্যাঙাৎদের চেয়েও বেশী।

কুঙ্কুম কবিতা টবিতা পড়ে। সময় মত আউড়িয়ে থাকে। সে আওড়াল—এর সূত্রে গাঁথিয়াছি সহস্রটি মন। কে বলে বাঙালীর ইউনিটি নেই?

—অফ ফোর্স আছে। আর আমরা তো জাপানীদের মত পরের সাম্রাজ্যে হামলা করতে যাচ্ছি না। পাগলটা ঘরের ভিতর নিজের মনে বকাঁবকি করে, হাসে, বক্তৃতা ঝাড়ে। আমরা তো সেজন্য কোন হামলা করতে যাইনি। তবে এলোমেলো না চেঁচিয়ে যদি চুপ থাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করতে রাজি আছি।

—শুনেছি ইউনিভার্সিটিও ওকে আশীর্বাদ করেছিল। পড়াশোনাতে ভাল ছিল, কাপ মেডাল পেয়েছিল। শুধু চাকরি পায়নি।

—না, শুনেছি পেয়েছিল। কিন্তু রাখতে পারেনি। লড়াইয়ের ধাক্কায় কোম্পানী উঠে গেল। জার্মানীর সঙ্গে কি সব ওদের কারবার ছিল। তাই তার পর আর কলকাতায় চাকরি পেল না। আসামে গেল চা বাগানে। সেখান থেকে মিলিটারীতে। তার পর বর্মা। আর চীনে আর জাপানী নিয়ে কারবার। এক দল শ্যাঙাৎ, অন্য দল শমন।

—মোট কথা ছত্রিশ জাতে একাকার। কেন রে বাবা মরতে গেলি। সেই বর্মা মুলুক। যাকে বলে গঙ্গাবর্জিত দেশ। সেখানে পাহাড়ে জঙ্গলে শাদা মার্কিন,

কালো নিগ্রো, হলদে চীনে সবাই মিলে আকাশের রামধনু সেজে আছে। আর তুই কিনা বাদামী বাঙালী আরেকটা রঙের পোঁচ লাগিয়ে দিলি?

—আর দিলি তো দিলি। পাঁচ মিশেলী পল্টনে ঢুকে নাচতে নাচতে একেবারে জাপানীদের সঙ্গেই বা লড়তে গেলি কেন রে বাবা? ছ্যাঃ! আমাদের কবি হেমচন্দ্র এই সেদিনও হক কথা লিখেছেন—অসভ্য জাপান। আর তুই কিনা গেলি তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। এখন কর্মফল ভোগ বাছাধন।

—ভাগ্যিস, বাছাধন নির্বিবাদে থাকে। শুধু রেডিয়োটা ধরে খুব টানাটানি করে। আর সারা দুনিয়ার খবর শোনবার চেষ্টা করে। গুনগুন করে কিন্তু ওই একটি কথাই। আর বিড়বিড় করে কি যে বলে। মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেয়।

—তা দিক বাবা। তাতেই যদি সন্তুষ্ট থাকে। রকটুকুতে আমাদের নিজেদের মৌরসী পাট্টা। বাড়ির ভেতরটা শান্ত আর বাইরে আমরা চালাই হৈ-হল্লা।

কুঙ্কুম বলল, না, এবার শুনতে হবে পাগল কি সব বলে। জীবনটা মিইয়ে যাচ্ছে। একবার দেখা যাক পাগল কি সব মণিমুক্তো ছড়ায়। বুঝলি রতনা, পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

রতন তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে মুখ বেঁকাল,—অমূল্য রতন তো সেদিন শুনলাম। পাগল লড়তে গিয়েছিল চীনেদের সঙ্গে সঙ্গে। ওখানে নাকি আসাম থেকে চীন পর্যন্ত পাহাড় জঙ্গল ফুঁড়ে রাস্তা তৈরী হয়েছে। আমাদের জোয়ানরা যেখানে পৌঁছোতেও পারেনি ব্রিটিশ আমলে, সেখানে চীনেরা নাকি কুলীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাস্তা বানিয়েছে। আমাদের 'হে ট' সেখানেই ছিল, শুনলি না সেদিন?

কুঙ্কুম গভীরভাবে মাথা নাড়ল, না, অত হালকা ভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। ওর প্রলাপের মধ্যে একটা মিলিটারী হিস্ট্রি খুঁজে পাওয়া যাবে।

রতন রেগে গেল, নিকুচি করেছে তোর হিস্ট্রির। আমরা যে পরীক্ষার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ঠ্যাং ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি সেটাই আমাদের হিস্ট্রি। রাজারা সেকালে শরৎ কালে দিগ্বিজয়ে বেরোত। তোরই রবি ঠাকুর লিখে গেছেন। কাবুলীওলা গল্পে পড়েছি।

একটু থেমে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে আবার শুরু করল, কিন্তু রেজাল্ট বেরোবার পর আমরা কেউ দিগ্বিজয়ে বেরোতে পারলাম না।

শরৎ কালে দূরে ছাই একটি ছোটমোট চাকরিতে যাচ্ছি বলে যে খেয়েদেয়ে বাড়ি থেকে বেরোব তার পথও বন্ধ। দিগ্বিজয়ের বদলে আমাদের সব দিকই বন্ধ।

সমীর যোগ দিল, শুধু তাই নয়। যেই শরৎ কাল শেষ অমনি মোহন বাগান দুর্গাপূজো সব কিছু শেষ। রকে আলোচনার মত মালও গেল ফুরিয়ে। আর এদিকে জাপানীগুলো বসন্তকাল পড়তে না পড়তেই আসামে হাজির। যে চাকরিটা পেতে পারতাম সেটাও উঠে গেল। মঙ্গোলিয়ানরা কখনো মঙ্গল করে না। কিবা চীনে, কিবা জাপানী।

রতনের মনেও একটা ব্যথা ছিল এ নিয়ে।

সে বলল, মঙ্গল করবে? চেহারা দেখেছিস এক একটির চীনে পটিতে?

সমীর সাহস পেয়ে গেল। কারণ কোন চীনে বা জাপানী হাতের কাছে নেই।

বন্ধুরা অবশ্য চীনে পট্টি এড়িয়ে চলে সর্বদা। ওরা নাকি সব ডাকসাইটে ডাকাত। ওদের আঙুলের নখের এত জোর আর ধার যে ওই ও-পাড়ার কেষ্টধনের পেটে একবার নখ সেঁধিয়ে দিয়েছিল। গেঞ্জি আর পাঞ্জাবি ছিঁড়ে নাড়ীভুঁড়ি প্রায় বের করে ফেলে আর কি!

তবে হ্যাঁ, চীনে রেস্তোরাঁয় মাঝে মাঝে সস্তায় খ্যাঁট মারতে যায় বইকি তবে সেখানেও—বিশ্বাস নেই, যা সব গাট্টাগোট্টা জোয়ান ওরা। তাই বন্ধুরা দল বেঁধেই যায়।

তাই সমীর বলল, একটু সাহস পেয়েই বলল, দেখিনি আবার? বাপ্ রে বাপ্! আরশোলার চাটনি আর ব্যাঙের ঠ্যাং খেয়ে ধরাখানাকে সরা জ্ঞান করে।

—ঠিক বলেছিস। ওঃ, ভাবতেই ভয় করে। সেই জন্যেই তো ওদের দিকে ঘেঁষি না কখনো। ওরা হচ্ছে চীনে। যেমন মজবুত তেমনি মারমুখো। ওমুখো হওয়া ভদ্রলোকের কর্ম নয়। উচিতও নয়।

কুঙ্কুম বলল, তবেই ভেবে ছাখ। এ হেন চীনেরাই পারছে না জাপানীদের রুখতে। আমরা কোন্ ছার।

এমন সময় অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর ঘোষণা শুরু হল। জাপানী সেনাবাহিনী নানা রকম ছলনা করে পাশ-কাটানি মোর্চা মেরে অতর্কিতে এগিয়ে এসেছে। কোহিমা আর মণিপুরের যোগাযোগের রাস্তার উপরে। অবস্থা গুরুতর। কিন্তু আয়ত্তের বাইরে মোটেই নয়। আমাদের সৈন্যরা কৌশল অনুসারে আবার ঠাঁই বদলাচ্ছে।…

হঠাৎ রেডিয়োর ঘোষণা ছাপিয়ে সেই পরিচিত পাগলামীর আওয়াজ শোনা গেল—চিনি গো চিনি।

সমীর এই আকস্মিক ঘোষণা শুনে একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিল। আর থাকতে না পেরে বেশ একটু আক্রমণের স্বরে জানলার গরাদের ওপারে দাঁড়ানো পাগলাকে বলল, আর চিনতে হবে না। যারা চীনেদেরও চাটনি বানিয়ে দিয়েছে তারা এবার খাস আসামে ঢুকে পড়েছে।

কুঙ্কুমের মাথায় ঘুরছে মিলিটারী হিস্ট্রি। যুদ্ধের সম্বন্ধে কিছু পড়েনি। ফ্রণ্টের খবর কিছু বেরোয় না। কিছু খবর আর অবস্থা ব্যবস্থা এই প্রলাপের মধ্যে দিয়ে হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে। সে জানত যে পাশের গলিতে যে সরল-বাবু আর গোপীবাবু থাকে ওদের এক বন্ধু মিলিটারীতে গেছে। এবং আসাম সীমান্তে সম্ভবত। ওদের ডেকে আনলে ওরাও হয়ত কিছুটা হদিস দেবে। দুই আর দুইয়ে একসঙ্গে করলে হয়ত চাউর না করা খবরগুলো চারের মত বেরিয়ে যাবে।

কুঙ্কুম ছুটল সরল আর গোপীনাথের সন্ধানে। ওরাও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। কুঙ্কুম ওদের বলেছিল যে পাগল রেডিয়োর খবরে উত্তেজিত হয়ে জেগে উ'ঠছে।

ওরা এসে দেখল যে পাগল তখন সাংঘাতিক ভাবে উত্তেজিত। মুখের চেহারা একেবারে বদলিয়ে গিয়েছে। মুখটা যেন মারবার অথবা মরবার জন্ম পণ করা একটি মানুষের পরিপূর্ণ প্রকাশ। চোখ দুটোতে অসম্ভব শান দেওয়া ইস্পাতের ধার চকচক করছে। ডান হাতটা বাঁ হাতের সঙ্গে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে মেলানো। দুটোর মাঝখানে একটা বেয়নেট অনায়াসে ধা..য় দেওয়া যায়। বাঁ পাখানা একটু উপরের দিকে তুলে ধরে এগিয়ে দিয়েছে।

লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট।

* * * *

য়্যাম্ মেরিল্‌স্ ম্যরাডার, মেরিল্‌স্ ম্যরাডার, জেণ্টলমেন। গেস্, ইউ ডোণ্ট নো।

হতভম্ব হয়ে ওরা রকে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। জলজ্যান্ত পাগল। জানলার গরাদের নিশ্চিন্ত আড়ালে। অভিনয় ক..ছে যুদ্ধের। আর স্মৃতিচারণ করছে নিজের জীবনের। তন্ময় হয়ে দেখবারই কথা। ইংরেজীতে যাকে বলে একেবারে গ্র্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড ভিউ।

কিন্তু শুধু দেখা নয়, শোনারও কথা। মেরিল্‌স্‌ ম্যারাডার জিনিসটা কি?

সরল আর গোপী পরস্পরের দিকে তাকাল। মার্ডার নয় তো? যুদ্ধের অছিলায় খুন? প্রেমের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে? তারই ধাক্কায় কি ভদ্রলোক পাগল হয়ে গেছে? তবে যে বল্লে শেল শক?

গেস্‌, ইউ ডোণ্ট নো।

পাগলের আত্মঘোষণা আবার শুরু হল।

তোমরা জান না ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মেরিলের নাম। জেনারেল মেরিল—ইউ আমেরিকান জেনারেল, টেক মি ইন ইয়োর ব্যাটালিয়ান।

বলতে বলতেই পাগল এমন বীর দর্পে একখানা স্যালুট ঝাড়ল যে সরল যদি মেরিল হত সে-ও তার নিবেদন অগ্রাহ্য করতে পারত না।

অর্থাৎ জেনারেল মেরিল যেন সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

জেনারেল সাহেব, দশ বছর ধরে আমি আর আমার স্ত্রী একটা ছোট্ট ঘরে বাস করেছি। আমরা লোক খারাপ ছিলাম না। আমাদের যদি শুধু দুখানা ঘর থাকত আর একটা রান্নাঘর আর ওই বাচ্চাটার জন্য একটি আলাদা বিছানা—আমাদের বিয়েটা বোধহয় তছনছ হয়ে যেত না। কিন্তু দুটো ঘর আর একটা বাচ্চার খরচ কত সাংঘাতিক এই বাজারে।

একটু থেমে আমি বললাম, হাসছেন সাহেব? আমরা কিন্তু যেন একজন আরেক জনের ঘাড়ে চেপে দিন কাটাতাম। বৌ একেবারে হিস্টিরিয়ার মুখোমুখি। এদিকে আমি নিত্য আমার ছোট্ট চাকরি থেকে বরখাস্তের নোটিশটা শুঁকতে পাচ্ছি। আর বাচ্চা, আমার সোনার বাচ্চা বড় হয়ে উঠছে আর বুঝতে শিখছে। আগেকার দিনে হলে ডুবে গেলেও লোক আবার ভেসে উঠতে পারত হয়ত। কিন্তু এই বাজারে প্রত্যেক চাকরি ছাঁটাইয়ের পাশেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে বেকারীর অন্তহীন কুয়োটা। বাঙালী যে সত্যিই কূপমণ্ডুক।

জেনারেল সাহেব, আমি তো বরখাস্ত হয়ে আসামে পালিয়ে এলাম। আমার সোনার ছেলেটা না খেতে পেয়ে মরে গেছে। বৌটা গেছে বাপের বাড়ি—অনাথাদের শেষ আশ্রয়।

নিজেকে টান টান করে সোজা দাঁড়িয়ে আমি বললাম, কিন্তু আপনার তিন তিনটে ব্যাটালিয়ান। মোট আড়াই হাজার লোক। তাতে ইনফ্যান্ট্রি, সিগন্যালার, ম্যুলেটিয়ার (অস্ত্র আর রসদ বইবার খচ্চর চালকদের দল) সবই

তো আছে। আমায় সামান্ত প্রাইভেট করে নিন—আপনার ইনফ্যান্ট্রিতে পদাতিক হয়ে লড়ব, মরব।…কুলী করে নিলেও লড়ব আর মরব।

এই বলে পাগল একটু চুপ করল।

তারপর শুরু করল, নো? আমি সমতল ইণ্ডিয়ার লোক, আমি পারব না, স্থার?

স্থার, আপনি জেনারেল স্লিমের কথা ভাবছেন? উনি বলেছেন যে ব্রিটিশ টমি পৃথিবীর আর সব সৈন্তের মত সমান লড়তে পারে। প্লাস টেন মিনিটস্। আর ইট্‌স্ দিজ মিনিটস্ গ্যাট কাউণ্ট। টমি যে দশটা মিনিট বাড়তি লড়তে পারে তাতেই সব ফতে হয়ে যায়। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি স্থার যে, আমি বাঙালীর বাচ্চা, আমিও ওই দশ মিনিট বাড়তি লড়তে পারি।

গোপী বলে উঠল, অদ্ভুত পাগল।

সরল বলল, না। পাগল বলব না।

স্বয়মও পাগলামি করে যুদ্ধে গেছে বলছে পাড়ার লোক। কিন্তু তুইও জানিস, আমিও মানি যে ওর মত মাথা ঠাণ্ডা আর কারো ছিল না।

প্রাইভেট ততক্ষণে বলে চলেছে আপন মনে।

—স্থার, আপনার ফর্মেশনে মার্কিন, গুর্খা, নিগ্রো, চীনা সবাই আছে। সবাই পারবে, আর আমি পারব না?

এই সবুজ নরকে পায়ে হেঁটে মরতে এগোতে হবে বলে আমি পারব না? আর্মিতে বলে যে জন চায়নাম্যান অর্থাৎ চীনে জোয়ানরা পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী কষ্ট সইতে পারে। সব চেয়ে বেশী হাঁটতে পারে।

স্বীকার করছি, স্থার, জন চায়নাম্যান যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানীর চেয়েও বেশী নিখরচার সৈন্ত। তার জন্য ট্রান্সপোর্ট দরকার নেই। সে তার সব মাল মায় অস্ত্র আর রসদ পিঠে বয়ে চলে। কাঁধে বাঁশের ভারা, তার এক প্রান্তে ঝোলে মর্টারের পায়া, অপর প্রান্তে তার ব্যারেল। রাইফেল আর অন্য বোঝাও সে বয়ে নেয়। পৈতের মতন কাঁধে আড়াআড়ি করে ঝোলায় ক্যান্ভাসের চোঙা ব্যাগ, তাতে রাখে এক হপ্তার চাল। দেড় মণ বোঝা বয় অথচ পায়ে শুধু ঘাসের চটি। আর মাইনে মাসে কুল্যে পৌনে তিন টঙ্কা।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে শুনতে শুনতে গোপী আর সরল দুজনেরই মনে পড়ল যে স্বয়ম্ জানিয়েছিল যে আমেরিকান ফ্লাইয়িং টাইগাররা মাইনে পেত মাসে সোয়া

তিন হাজার টাকা। অবশ্য উড়ুক্কু বাঘদের টাকাও ঝড়ের মত উড়ে যেত। মাসিক বোনাসের আড়াই হাজার টাকাও এক নিঃশ্বাসেই হাওয়া।

মনে পড়ল যে একই পথের যুদ্ধযাত্রী তাদের প্রাণের বন্ধু এই খবরটার সঙ্গে একটি মোক্ষম মন্তব্য জুড়ে দিয়েছিল।

জীবন যৌবন ধন মান এই চারটের মধ্যে টিকিয়ে রাখার যোগ্য শুধু শেষেরটা। উড়ুক্কু বাঘরা তাই প্রথম তিনটেই খরচার পাকা খাতায় তুলে রাখে। কালস্রোতে নিঃশেষে ভেসে যাবার জন্য।

ওরা চুপ করে পাগলের ডবল মার্চ দেখতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচাচ্ছে—ওয়েল স্যার, আমার পৌনে তিন টঙ্কাও দরকার নেই। অমন চাঁদের মত ছেলে শ্রীনিবাস অপুষ্টিতে মরে গেল। অমন সুখদুঃখের নিত্যসঙ্গী বৌ বিবাগী হয়ে গেল। আর আমি এলাম চায়ের বাগিচায়। বাগিচায় বুলবুলি তুই।

শেষের কথাগুলি সে গানের সুরে গেয়েছিল।

স্যার, মাই প্যাক ইজ অন মাই ব্যাক। য়্যাণ্ড আই ওয়াক ইন দি শ্যাডো অব ডেথ। আই ফিয়ার নো সন-অব-এ-বিচ।

বন্ধুরা পরিষ্কার দেখতে পেল যে পাগল মার্চ করছে ঘরের মধ্যে। ওর পদক্ষেপে ফুটে উঠেছে অভিযান, অভিনয় নয়। ওর পোঁটলা, অতীত স্মৃতির পোঁটলা ও বয়ে চলেছে। মৃত্যুর ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে ও কোনো কুত্তীর বাচ্চাকে ডরায় না।

ও যেরকম ভাবে মার্চ করতে লাগল তাতে কোন সন্দেহ রইল না যে ও জেনারেল মেরিলের হানাদার দলে ঢুকে গেছে। এবং পদে পদে এগিয়ে যাচ্ছে।

*　　*　　*　　*

পাগলের আলাপ, প্রলাপ আর অভিনয়।

এগোতে এগোতে তার দুটি বাহু এরোপ্লেনের দুটো ডানায় পরিণত হল। গুম গুম করে বোমারু বিমানের মত আওয়াজ করতে লাগল। যেন নীচে, অনেকটা নীচে প্লেন নেমে এল। উপরে মেঘের চাঁদোয়া। নীচে গাছের পর গাছে বিছানো শ্যামল কার্পেট। হঠাৎ সে দড়াম করে একটি স্যালুট ঠুকে দিল। ঘোষণা করল, সুপ্রিম কম্যাণ্ডার, সাউথ ইস্ট এশিয়া কম্যাণ্ড, য়্যাডমিরাল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন।

তারপর সে স্যালুট করে মাথা নীচু করে 'বাউ' করল। প্রসন্ন মুখে বলল,

নো ইয়োর এক্সেলেন্সি, ওটা জলের রুপোলী লাইন বটে। কিন্তু নদী নয়। ওটা লিডো রোড।

—লিডো রোড ?

—ইয়েস, স্থপ্রিমো, ওটা লিডো রোড। আমরাই কাঁচা খোঁচা বানিয়েছি। যদিও শুনেছি যে মার্কিন ম্যাগাজিনে লিখেছে যে ওটা টার ম্যাকাডাম রোড।

—তুমিও বানিয়েছ ?

—ইয়েস, স্থপ্রিমো। আমিও। আমাদের দলে ছিল কালো বাদামী হলদে শাদা সব রঙের, সব জাতের লোক। এই আমাদের সত্যিকারেব জগন্নাথ ক্ষেত্র।

—জগর নাউট ? হোয়াটস্ দ্যাট ?

—জগন্নাথ, স্যার। আমাদের সেরা তীর্থ। সেখানে মানুষে মানুষে কোন তফাৎ নেই। কেউ কারো চেয়ে কম নয় সেটা প্রমাণ হয়ে গেল শত্রুর মোকাবিলা করতে এসে। ধর্মক্ষেত্র আর যুদ্ধক্ষেত্র দুই-ই সমান। দুশমনের সঙ্গে আমরা শ্রেফ কুরুক্ষেত্র করে তবে ছাড়ব।

একটু দম নিয়ে পাগল আবার শুরু করল, হ্যাঁ, আমিও কম নই। ডাকসাইটে চীনে আর কালাপাহাড় নিগ্রোব চেয়ে শ্যামল বাঙালী আমিই বা কম যাব কেন ? যে হাতে রাইফেল চালান শিখেছি সেই সম্মানিত হাত দিয়ে কাজের তাড়ায় বুলডোজার আর ক্যাটারপিলার পর্যন্ত চালিয়েছি। জঙ্গলের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে মাথা ঢুকিয়েছি। মেঘের উপর চালিয়েছি পা। জলাভূমি করেছি ভরাট আর খোদাই কবেছি নীরেট পাথর। আমি কা' । চেয়ে কম নই। পাটকাই বুম গিরিমালা থেকে মোগঙ্গ উপত্যকা সমানে চষে ফেলেছি।

* * * *

ওহ্ সার্জেন্ট, হ্যালো সার্জেন্ট, হোয়াট ফান ?

—নো ফান ? মজা নয় তো মুখখানা অত হাসিমাখা কেন ? যেন রসগোল্লার গামলায় মুখ চালিয়ে এসেছ।

পাগল মুখখানা নিজেই হাসিতে ভাসিয়ে দিল। বর্মার জঙ্গলে দুশমন হামলার সময় রসগোল্লায় স্মৃতিভে হাসি ফুটবে ওরই মুখে। ওর ছেলে মরেছে না খেয়ে, বৌ বিবাগী। হাসবে তো ও-ই।

বন্ধুদের চোখে ততক্ষণে জল ছলছল করছে।

—ওহ, সার্জেন্ট, তোমার গিন্নী এই লিখেছে তোমায় ? তা যাই লিখুক,.

বেচারী বিরহিণী এই সব কথা ভেবে শান্তি পাচ্ছে তো? তাই-ই য-যথেষ্ট। আমি পোস্ট-অফিসে ভাগ্যিস ঠিকানা দেয় না।

—হ্যাঁ, তাই যথেষ্ট। বৌ বেশ খাসা লিখেছে। সে ভাবছে তুমি একটি গ্যারিসন টাউনে আছ? চির-বসন্তে ঘেরা পুনা শহরে বোধহয়? খাস বিলেত থেকে আমদানী নাচিয়ে গাইয়ে সুন্দরী "এন্‌সা" আর্টিস্টরা তোমার দিলকে সুখের দরিয়ায় তালে তালে প্রেমে দোলা দিচ্ছে। 'আহা, বেচারী ভেবেও এত সুখ পাচ্ছে। তোমায় হিংসা করছে এটা জেনে আমিও সুখ পাচ্ছি। এই তোমার হয়ে আমি ওকে একটা চুমু ছুঁড়ে দিলাম।

সত্যি সত্যি পাগল শূন্যে একটি চুমু ছুঁড়ে দিল।

বাইরের রক থেকে বন্ধুরা তার আওয়াজ পর্যন্ত পেল।

আর আওয়াজ পেল দুর্বার বেগে বন্যার স্রোতে পার ভেসে যাওয়ার। সে মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করতে লাগল। কলকাতার মানুষ ওরা। বন্যা দেখেনি। গঙ্গার জোয়ার পর্যন্ত ভাল করে নজর করে দেখেনি।

সম্ভবত থোড় বড়ি খাড়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত জীবনে এরকমই হয়।

*   *   *   *

অফ কোর্স, অফ কোর্স, স্যার। মাউণ্টেন ম্যালেরিয়া য়্যাণ্ড মনসুন আর আওয়ার এনিমিস ফ্রেণ্ডস্। সত্যিই পাহাড়, ম্যালেরিয়া আর ঘোর বর্ষা বর্মার সীমান্তে শত্রুরই সাহায্য করছে। ওরা আমাদের চেয়ে বেশী কষ্ট সইতে পারে। না, স্যার, আমরাও পারি। ওই, ওই খচ্চরটা লাল কাদায় ডুবে তলিয়ে যাচ্ছে। আরে, আরে ওর পিঠে যে আমাদের পাওয়ার শোভেলের ডায়নামো পার্টস রয়েছে। ধর, ধর।

আর কেউ ধরতে এগিয়ে গেল না। আমার কেউ নেই। আমিই একা দৌড়ে গিয়ে পার্টসের বাক্সটা আঁকড়ে ধরলাম। তার নীচে থেকে খচ্চরটা কাদার মধ্যে তলিয়ে গেল। আমার পা দুটো নীচে নেমে যাচ্ছে। যাচ্ছে। যাচ্ছে। আমি হাঁটু গেড়ে কাদার উপর একটি পাটাতন তৈরী করে আটকে থাকার চেষ্টা করছি। না, এবার তলিয়েই যাব। যাই যাব, আমি সবার চেয়ে উঁচু মাথা নিয়ে নিজে তলিয়ে যাব।

না। আমি গেলাম না। একটি নিগ্রো ল্যাসোর মত দড়ি ছুঁড়ে আমায় আটকে ফেলল। এই, এই যে হড়হড় করে আমি গড়িয়ে চলে আসছি। দু-হাতে জাপটে ধরে রেখেছি বাক্সটা।

ক্যাপ্টেন আমার লাল কাদায় মাখা মুখের উপর থেকে নিজের হাতে কাদা সরাতে সরাতে বলল, তুমি পাগল। পাগল না হলে কেউ এমনভাবে বীরত্ব দেখায়? তোমার নামে স্পেশ্যাল ডেসপ্যাচ দেব। তুমি পাগল। কিন্তু প্রমোশন পাবে।

বন্ধুরা এই মুখর অভিনয় দেখে যাচ্ছে।

পাগল হাসি মুখে সটান হয়ে স্যালুট করল। ইয়েস স্যার, আমি পাগল।

আমার ক্যাপ্টেন কি সোজা লোক। রোদে পোড়া লাল টকটকে হাত দিয়ে আমার কাদামাখা হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, এসব কাজের জন্য পাগল হবার দরকার নেই। তবে এতে কখনো কখনো সুবিধা হয়। ইট হেল্‌প্‌স।

* * * *

হঠাৎ পাগল তরোয়াল দিয়ে গলাকাটার ভঙ্গি করতে লাগল। তার পর চেঁচাতে শুরু করল, নো, নো। বাই জোভ! মঙ্গোলিয়ানদের যতটা দুঃসাহসী ভেবেছিলাম ততটা নয়। আশ্চর্য! জেনারেল স্টিলওয়েলের বাছাই করা ২২ নং চীনে ডিভিসনের সৈন্যদের চেয়ে আমরাই আগে জাপানী বাঙ্কারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। একটা হুঙ্কার দিয়ে আমি লাফিয়ে পড়লাম প্রথম বাঙ্কারটাতে। বাই জোভ, হেরে যাবার ভয়ে, বন্দী হবার ভয়ে শেষ পর্যন্ত জাপুরা নিজেদের বেল্ট দিয়ে গলা বেঁধে আত্মহত্যা করেছে। কেউ কেউ হারিকিরি করেছে। কি আশ্চর্য, সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম একা। আমায় একা পেয়ে মারবার জন্য কেউ বেঁচে নেই। এমনকি যারা গাছের ডালে ডালে লতাপাতায় লুকিয়ে আমাদের চোরা গুলিতে স্নাইপ করে মারছিল তারা পর্যন্ত মরে আছে। কিন্তু গাছ থেকে পড়ে যায়নি। সবারই দেহ দড়ি দিয়ে গাছে বাঁধা। পালানোর পথ বন্ধ করবার জন্য। মন্ত্রের সাধন ওরা এরকম করেই করে। আশ্চর্য!

* * * *

মা, এবার মলে সাহেব হব।

রবি ঠাকুরের এই গানটা আমি বদলিয়ে নিয়েছি।

এবার মলে জাপানী বন্দী হব। এতদিন একটিকেও বন্দী করা যায়নি। যাবে কি করে? আমিই তো একটি সৈন্যের পকেট থেকে জেনারেল সাটোর অর্ডার অব দি ডে বের করেছিলাম। অর্ডার দিয়েছে যে মরণকে পাখীর পালকের

চেয়ে হালকা মনে করো। মরা পর্যন্ত লড়ে যাও। মরে গেলে প্রেতাত্মা হয়ে লড়ে চল। বাস্ রে বাস!

তবু প্রথম জাপানী বন্দী ধরা পড়ল মোটে ক'মাস আগে। এই ১৯৪৪-এর জানুয়ারী মাসে।

যেন বন্দী হয়নি এই জাপানী। একেবারে নৈকষ্য কুলীন জামাই এসেছে শ্বশুরবাড়ি।

খবরটা পেয়েই তো জেনারেল গ্রেসি নাচতে শুরু করেছিলেন। একেবারে সরাসরি টেলিফোন কোর্ হেডকোয়ার্টার্সে। ওরা হুকুম দিল যে যদিও ছোটস্য ছোট একটি সেকেণ্ড ক্লাস প্রাইভেট, ওকে জেনারেলের মত খাতির আত্তি কর। যেমন করে হোক এই ভারী জখম জাপানীকে মরতে দিয়ো না।

সঙ্গে সঙ্গে জীপে করে ছুটল খোদ আর্মি মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের বড়কর্তা ব্রিগেডিয়ার তার সব স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তার আর ওষুধপাতি নিয়ে। মায় বিলিতী ব্র্যাণ্ডি।

কিন্তু জঙ্গী জামাই স্ট্রেচারের সুখশয্যায় শুয়েও দু পাশের পাহারাদার অফিসারদের হাত দিয়ে দেখিয়ে ভিক্ষা করতে লাগল—মেরে ফেল। আমায় খতম করে দাও।

যতই চিকিচ্ছে কর আর লালপানি পিলাও জামাই বাবাজীবন শ্বশুর বাড়ি যেতে নারাজ। ভেলায় ভাসিয়ে লক্ষীন্দরকে একটি নদী পার করার সময় সে গড়াগড়ি খেতে লাগল যাতে ভেলা উলটে ডুবে যায়। কিন্তু এমন জামাই-আদর দুনিয়ায় কে কোথায় পেয়েছে।

আমি যদি জাপানী জামাই হতাম ভিখ মাঙতাম আমার বাল গোপাল, আমার শ্রীনিবাসকে। আমার সাত রাজার ধন এক মানিক। তার ডাকনাম 'চিনি'। সেই চিনিকে বাঁচিয়ে দাও।

*   *   *   *

কুড়ি দিন—প্রায় কুড়ি দিন ধরে হামাগুড়ি দিয়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে একটি 'পাস' পার হয়ে এসেছি। আর পারি না। চীনে, নিগ্রো ওরাও হয়রাণ, কিন্তু আমাদের মত নয়। তবু আমি হামা দিয়ে হেঁটেছি। পারতাম না। কিন্তু একটি বর্মার ট্রাইব্যাল্ চিন উপজাতির ছোকরা মেরিল সাহেবকে দেখতে চায়। ওর বাপকে জাপানীরা মেরে ফেলেছে। মাকে নিয়ে গেছে। ও এখন মেরিল সাহেবকে বলতে চায় যে ও লড়াই করবে। বলে—আমিও লড়াই

করব। মরতে ভয় পাই না। কিন্তু অন্ধকারে ভয় করে। তাই আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।

কেন ওর উপর আমার মায়া পড়ে গেল? কেন ওকে মাল বইবার তাল্লিদার করে সঙ্গে নিলাম?

এই প্রশ্ন করেই পাগল হাত বুলোতে লাগল কোন অদৃশ্য অশরীরী একটি চিন বালকের গায়ে মাথায়।

হঠাৎ পাগল উত্তেজিত হয়ে উঠল। জঙ্গলের মধ্যে একটা এয়ার ফিল্ড দেখা যাচ্ছে। হুররে হুররে! আমরা জানতাম না যে যেখান থেকে হঠাৎ হঠাৎ জাপানী প্লেন হামলায় বেরোয় সেটা অজানতে আবিষ্কার করে ফেলেছি। লাফিয়ে উঠে ধাওয়া করলাম। নরক গুলজার।

স্ট্রাইক। স্ট্রাইক। মেয়েদের হাতের সৌখীন হাত পাখার মত আমরা ছড়িয়ে পড়লাম। বিমানঘাঁটি প্রায় দখলে এসে গেছে।

হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার! দুশমন পালটা হামলা করছে। জাপানী জিরো ফাইটার প্লেন এক ঝাঁক বাজপাখীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের উপর। চিন বাচ্চাকে নিয়ে মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। ফট ফট ফটাস ফট। না, এ যাত্রা আমার চিনি, আমার শ্রীনিবাসকে বাঁচাতে পেরেছি। কিন্তু কই আমার চীনে সঙ্গীরা? ওদের সঙ্গে যে য়্যাক য়্যাক কামানগুলো। য়্যান্টি এয়ারক্রাফ্‌ট কামান ছাড়া জাপানী প্লেনকে ঠেকানো যাবে না। কই চীনেরা?

ওরা পাশের জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়েছে। তা বলে দুশমন তো ছাড়বে না। শেলের শিলাবৃষ্টি শুরু হল। ওই, ওই শেলটা আমাদের উপরই আসছে। চিনি কেঁদে উঠতে গিয়ে বোবা হয়ে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে এক চোখ দিয়ে তাকিয়ে রইল। অন্য চোখটা একটি শেলের ফুটানিতে আগেই বুজে গেছে। তবু, তবু আমার চিনি, তোকে তোর বাবা এবার বাঁচাবেই। এই শেলের ধাক্কাটি আমার উপর দিয়েই যাক। আমি শুয়ে না পড়ে তোকে আড়াল করে রাখছি। শেলের সামনে শুয়ে পড়ে তো তোকে বাঁচাতে পারব না।

না। পারলাম না। ধাক্কার চোটে আমি···

পাগল আর কিছু বলতে পারল না। শুধু ধড়াস করে মেঝেতে আছড়িয়ে পড়ল। নির্বাক, নিস্পন্দ। নিঃসহায় ভাবে সংজ্ঞাহীন। শুধু একটি হাত একটু উপরের দিকে উঠেছিল। শুধু একটু।

*   *   *   *

সরল আর গোপীনাথ ছুটে গেল কোন ডাক্তারের সন্ধানে। যেমন করে হোক একজন ডাক্তার চাই। যা খরচ লাগে লাগুক। ডাক্তার এসে সাময়িক ওষুধপত্র দিলেন। ওরা জিজ্ঞেস করল, মিলিটারীতে খবর দিলে কোন লাভ হবে কি?

ডাক্তার বললেন, মিলিটারীতে খবর দিয়ে হবে কি? ঠিক কোথায় যে খবর দিতে হবে তাও জানা নেই। তবে চেষ্টা করতে পারেন। মিলিটারীরা হয়ত শুধু বলবে যে ডমিসিলিয়ারী ট্রিটমেণ্ট অর্থাৎ গৃহ চিকিৎসাই এর পক্ষে সেরে উঠবার সব চেয়ে ভাল উপায়; আমরা তো সেজন্যই মাসোহারার ব্যবস্থা করে ওকে শ্বশুর বাড়িতে স্ত্রীর কাছে পৌছে দিয়েছি। হঠাৎ একটি দারুণ যুদ্ধের খবরে শকটা বেড়ে গিয়েছে। ঘাবড়াবার কিছু নেই।

শেষ পর্যন্ত হয়ত বলবে যে ডাক্তারী মতে যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ আঘাতে বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু সৈন্যের চোখের সামনেই মৃত্যু দেখলে হঠাৎ "কমব্যাট ফ্যাটিগ" যুদ্ধে ক্লান্তি সৃষ্টি হয়। তখন এরকম মানসিক ক্রিয়া হয়। এই রকম হাত পা ছোঁড়া, লম্ফঝম্ফ, আনমনে অভিনয় সবই সে সময় স্বাভাবিক। আবার কিন্তু আরেকটি ভীষণ আঘাতের ফলে সেটা সেরেও যেতে পারে। অতএব "হোপ ফর দি বেস্ট" বলে হাত বাড়িয়ে মিষ্টি হেসে বিদায়ও করে দেবে হয়ত। ধুলো পায়ে।

বন্ধুরা ভাবল,—তবু ওদের জানাতে হবে। যদি বিশেষ কিছু চিকিৎসা হয়। স্বয়ম্ও যে ওই ভীষণ সীমান্তেই রয়েছে।

জমজমাটি পার্টি।

ককটেল পার্টি। এ ছাড়া নয়া দিল্লীতে স্মার্টনেস হয় না। রেসপেক্টেবিলিটি হয় না। চটক আর চেয়ার যদি না রইল তাহলে আর রইল কি ?

এবং আঙ্কল স্যানিয়াল নয়া দিল্লীর সাহেব-ঘেঁষা সমাজের ওপর তলায় আছেন। তা ছাড়া জানেন যে সেখানে টিকে থাকতে গেলেও চাই সাধনা। বৈঠায় ভর দিয়ে বিশ্রাম করেছ কি নামতে শুরু করলে।

জবরদস্ত সেক্রেটারিয়াট অফিসাররা গোটা দেশ শাসন করেন বলে শোনা যায়। তারাও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন যে নিউ দিল্লী হচ্ছে একটা হাত থেকে পিছলিয়ে যাবার মত ডাণ্ডা। "গ্রিজি পোল"। অতএব অহরহ পিছলিয়ে যাবার ভয় মনে রেখে উপরে ঝাণ্ডাটির দিকে চোখ রাখ। উপরে উঠবার জন্য আমড়াগাছি কর।

স্বাতীর বাবা মার স্বভাবতই আঙ্কল স্যানিয়ালের কথাই মনে হল।

বেচারী স্বাতী। দেশে ফিরে আসার অল্প কিছুদিন পর থেকেই কেমন যেন বদলিয়ে যাচ্ছিল। অবশ্য ওর পুরানো বন্ধুবান্ধবীরা ওর দিকে বেশী ঘেঁষত না। তার কারণ বুঝতে পারা শক্ত নয়। কিন্তু ও নিজেও তো তাদের প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করল না। বিশেষ কোন নতুন বন্ধুবান্ধবও তৈরী করার চেষ্টা করল না।

এটা কেমনতর ব্যাপার ?

আর মেয়েটার দিনই বা কাটে কেমন করে ? এই যুদ্ধের বাজারে, ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে শুধু মেয়েদের কেন সব বেসামরিক লোকেরই গতিবিধি কমে গেছে, কাট ছাঁট হয়ে গেছে।

তার উপর কিছুদিন থেকে ক্লাবে যাওয়া, এমন কি রেস্তোরাঁ প্রভৃতিতে সময় কাটাতে যাওয়া—তাতেও স্বাতী আর আনন্দ পাচ্ছিল না।

দিনের পর দিন ওর যেন সময় আর কাটছে না। সারাদিন কিছু করবার নেই। একটা বই, একটি কবিতা, একটু আড্ডা, একটু কফির জন্য মেলামেশা কিছুই মনকে টেনে রাখে না।

সে নিজেও নিজেকে ব্যস্ত রাখতে অনেক চেষ্টা করেছিল। সংকটত্রাণ আর সমাজকল্যাণ সমিতিগুলিতে যোগ দিল। সাময়িকভাবে সামরিক কাজে এদেশে আসছে অনেক বিদেশী পণ্ডিত। তাদের বিশেষ ভাবে আয়োজিত বক্তৃতা—একটাও সে বাদ দেয়নি। ম্যাটিনীতে ক্লাসিক্যাল কনসার্ট আর চ্যারিটি শোতে সহায়তা করতে গিয়ে সময় কাটানো—সব কিছুতেই মন দিতে চেষ্টা করেছে।

তবু হায় মন লাগেনি কিছুতেই।

একটি নারীর একক মনে যখন প্রেমের স্পর্শ লাগে তখন সেই প্রেমকে সে মুখে স্বীকার করুক আর না-ই করুক মনে তার অনুরণন উঠবেই।

সেতারের তারে একবার আঙুলের ছোঁয়ায় একবার ঝঙ্কার ওঠে; একটুখানি ধ্বনির পর মিলিয়ে যায়। কিন্তু নারীর মনের তারের ঝঙ্কার সুর সৃষ্টি করে তোলে। তা কি সহজে মিলাতে পারে?

নিজের সামাজিক গণ্ডীতে উপর-উপর দেখানো স্বাধীনতা, কাজের আর কথার স্বাধীনতা সত্ত্বেও কুমারী মেয়েদের কি অবস্থা হয় তা দুয়েকটি কথার আঁচড়ে স্বাতী স্বয়ম্‌কে জানিয়েছিল। স্বয়ম্ বিস্মিত হয়েছিল। বিশ্বাস করেছিল। তবু সে কথা অন্য দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু অবস্থার তো মোড় ঘোরে না।

স্বাতী জানত যে সব ভারতীয়, শুধু ভারতীয় কেন, পাশ্চাত্য বাপ মা-ই মনে করে যে মেয়েদের এগিয়ে চলার এক মাত্র পথ হচ্ছে বিয়ে। বিশেষ করে এদেশে। কারণ এদেশে কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে দেশের জন্য যুদ্ধের কাজে আত্মনিয়োগ করবার যুক্তি বা পরিবেশ বা প্রয়োজন কিছুই পাবে না। দামী পেট্রল খরচ করে কমিটিতে বসে মোজা বোনার সৌখীন ব্যবস্থায় স্বাতীর মন ওঠে না।

অথচ বাইরের, এমন কি নিজের সমাজের বাইরের যে সব লোককে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে কাছে এসে স্বাতী তাদের মনে করেছে বিস্বাদ, এমন কি দুঃসহ। সে জেনেছে যে বাঁচতে গেলে কিছু স্বাচ্ছন্দ্য, কিছু আনন্দের এমন কি বিলাসের ব্যবস্থাও চাই। কিন্তু এই কিছু দিনেই সে জেনেছে যে শুধু তাই নিয়ে বাঁচা চলে না।

ভাবতে ভয় হয়। কিন্তু ভাবনাটি যে সত্যি।

সে একবার বেপরোয়া হয়ে নিজের চার দিকে কিছু অবস্থাপন্ন আধুনিক আর চালু তরুণের সার্কল তৈরী করল। সে নিজেকে তাদের স্তরে নামাবে না। কিন্তু হয়ত ওরা কিছু বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দেবে।

হরি! হরি! সব যুবকই বক। রাজহংস দেখা গেল না একটিও। কেউ হয়ত আপত্তিজনক ভাবে স্নব, নাক উঁচু রাখার বাহাদুরীতে ওস্তাদ। কেউ হয়ত অলস বিলাসে বা মর্যাদার মার্কামারা চেয়ারে দিন কাটায়। একটু ছাই ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেই উদ্দেশ্যহীন অকারণ অহঙ্কার আগুনের মত গনগন করছে দেখা যায়।

স্বয়মের বিদ্যার আলোয় উজ্জ্বল মাজাঘষা মন ছিল। তাই কয়েকজন বিদ্বান পণ্ডিত তরুণকেও স্বাতী এই নতুন গোষ্ঠীর মধ্যে আমন্ত্রণ করল। এই যুদ্ধের কালোবাজারে চটকদার পরিবেশ আর চমৎকার আহার বিহার খুবই আনন্দের। তা আরো আকর্ষণীয় মনে হয় কোন মোহিনী তরুণী যদি নিমন্ত্রণ করে। ওরা তো বইয়ে পড়া প্যারিসের রসে ভরা সালোঁগুলির সন্ধান কলকাতাতেই পেয়ে গেল।

অবশ্য কেউ জানত না যে এই সব নিমন্ত্রণের সামনে স্বাতী থাকলেও পিছনে নিয়ন্ত্রণ করছেন তার বাবা মা। বিচক্ষণ লোক ওঁরা। সমাজে বহু দেখে বহু শিখেছেন। ওঁদের চোখে স্বাতীর মানসিক অবস্থা ধরা পড়তে দেরীও হয়নি। ভুলও হয়নি। এ পাড়াতে প্রমথ চৌধুরী বীরবলের আসর খুলে ছিলেন। কিন্তু স্বাতীর আসরে কেউ প্রণয়ী চৌধুরী হয়ে উঠতে পারল না। অনেক চেষ্টা করেও।

স্বাতীরও ভুল হয়নি এদের সবাইকে বুঝে নিতে। চিনে নিতে। সবাই শুধু আমি নামক আত্মনেপদী শব্দটিকে পরম ব্রহ্ম মনে করে চলে। ওরা বিভিন্ন স্তর আর শ্রেণী থেকে এলেও সবাই নিজেকে সব চেয়ে বড় সব চেয়ে প্রার্থনীয় মনে করত। মনে মনে নিজেরা নারীকে প্রার্থনা করত বলেই ওরা নিজেদের প্রার্থনীয় বলে মনে করত। বড় বড় আদর্শ, চিন্তাধারা প্রভৃতি সম্বন্ধে সব চেয়ে চালু কথাগুলি নিজের বলে চালাতে চেষ্টা করত।

কিন্তু সব কিছু আলোচনাই শুধু ড্রয়িংরুমের আলাপের ফুলঝুরি।

ফুর ফুর করে শূন্যে আলোর কণা ছিটিয়ে দেয়। তার পরেই সব ছাই। সব নিঃশেষ।

এদিকে কলকাতায় মন্বন্তরের কান্না যেমন প্রবল হয়ে উঠল তেমনি যুদ্ধের বাজার সরগরম। জাপানী বাহিনী দেশের দিকে হঠাৎ এগিয়ে আসতে পারে। আরাকানে মিত্রপক্ষের আগুয়ান দল ভীষণ মার খেয়ে সরে এসেছে এসব খবর বের হতে লাগল।

স্বাতীর নক্ষত্রমণ্ডলে কিন্তু সে নিয়ে কোন বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা গেল না। আর্মি পোস্ট অফিসের ছাপ মারা ঠিকানাহীন চিঠিগুলি খবরহীন, কিন্তু ভরসায় ভরা। রেডিয়োতে বুঝেসুঝে শুনলে সে ভরসা কিন্তু করা যায় না। একদিন সন্ধ্যায় একটা উদ্বেগের খবর যখন ওদের আড্ডাকে চঞ্চল করে তুলল তখন একজন হঠাৎ বলে বসল, দিন না মশায় ওটার সুইচ বন্ধ করে। কান মলে বন্ধ করে দিন।

আরেক জন সায় দিল, ঠিক বলেছ, দাও না ওটার কান মলে। যত্তো সব 'কিল-জয়'। আমোদকে খতম করে ফেলে।

অথচ সে নিজে উঠে গেল না রেডিয়োর কাছে।

স্বাতী এক লহমাতে এদের স্বভাব বুঝে নিল। বিরক্তি আর বিদ্রূপ চেপে রেখে হেসে বলল, বা রে, রেডিয়োটি কি দোষ করল যে ওটার কান মলতে চাইছেন আপনারা। যান না এগিয়ে। আরাকানে দুশমনের কান মুলে দিয়ে আসুন। তখন ঘরে বসেই নির্ঝঞ্ঝাটে রেডিয়ো শুনতে পাবেন। মায় যুদ্ধের খবর পর্যন্ত।

বিলেত-ফেরৎ মিসিবাবা যে রকম লেপাপোছা ভাবলেশহীন মুখে কথাগুলো বলে গেল তাতে অবশ্য এই লক্কা পায়রাদের মুখ বন্ধ হওয়া আশা করা যায় না।

বরং একজন তার চেয়ারের হাতল জোরে চেপে ধরে বলল, ওসব হচ্ছে জোয়ানদের কাজ। আমরা কেন এসবের মধ্যে যাব? দিই না আমরা ওদের মাইনে? দিই না রসদ আর ইউনিফর্ম?

স্বাতী হেসে বলল, তাহলে ওদের নিজেদের কাজ করতে দিন। দূর থেকে সমালোচনা করে ওদের মনোবল দুর্বল করে দেওয়া ঠিক নয়।

সেদিন রাতে একা বসে বসে স্বাতী এই সব নতুন বন্ধুদের যাচাই করে দেখল। এরা শিল্প, সাহিত্য, হাই লাইফ, উঁচু মহলের জীবন এসবের আলোচনা করে।

কিন্তু এ সবই হচ্ছে সবলের সম্পদ। ঈগল পাখী আকাশ থেকে নেমে এসে তার ভোগের বস্তুকে তুলে নিয়ে যায়। অসীমের মুক্ত বাতাসে আলোতে তাকে উপভোগ করে। তেমন করেই এসব উপভোগ করতে হয়। সেজন্য চাই বলিষ্ঠ হাত আর দুঃসাহস। এই যাদের দেখছি, যাদের সঙ্গে মিশছি এরা তো শুধু সামান্য চিড়িয়া। এরা কেঁচো নিয়ে কারবার করে।

প্যারাট্রুপ অফিসার স্বয়ম্ হচ্ছে ঈগল পাখী।

স্বাতী আরো ভাবল। জীবন একটা বিরাট মনোভূমি। শুধু পৃথিবীতে টিকে থাকাই জীবন নয়। সে ভূমিতে কি সকলের পা ফেলে হাঁটবার যোগ্যতা থাকতে পারে? সেখানে পদার্পণ করাই তো একটা মহা আনন্দ, মাদকতাময় সোনারঙের শ্যাম্পেন। স্বয়ম্ প্যারাট্রুপ অফিসার। ওই ঈগলের মত মহাকাশ থেকে নেমে আসে। তার মাথার ক্যাপটা যেন গ্রীক বীরের বিজয়ের পুরস্কার লরেল পল্লবের মালা।

এর পর ওর বাবা মা ওকে দিল্লীতে পাঠালেন। আঙ্কল স্যানিয়ালের কনট সার্কাসের ফ্ল্যাটে। সেখানে পার্টি জমে প্রতি সপ্তাহে এক সন্ধ্যায়। স্বাতীর ভাল লাগবে স্থান পরিবর্তন আর নতুন পরিবেশ। আর যদি লাগে মনে নতুন কারো রঙের পরশ? বাবা মায়ের মনে এই রকম একটা গোপন বাসনা ছিল।

সেইজন্যই এই জমজমাটি পার্টি।

জগতের বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্মৃতিটুকু নিয়ে বসে থাকা সেই পার্টিতে একেবারেই অসম্ভব। জায়গাটা হল দিল্লী। যেখানে সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য নতুন গড়ে উঠেছে পুরানোকে হটিয়ে দিয়ে। মানুষের মন তো সামান্য কথা। যুদ্ধের বাজারেও রণজয়ের চেয়ে মনজয়ের মহড়া চলছে বেশী।

বিশ্বাস না হয় যে কোন জঙ্গী বীর বা বেসামরিক অফিস বা সরকারী দপ্তরের অফিসারকে তার অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করে দেখুন।

স্বাতীর কাছে শূন্য, সব শূন্য। শুধু পূর্ণ করে আছে মনকে একটি গোপন আবিষ্কার। কোন কিছু দিয়েই তাকে সরানো যাবে না। তাই স্বাতী সেই পার্টিতে সাধারণ ভাবে সাজগোজ করে উপস্থিত হল।

রূপের, স্মার্টনেসের, ফ্যাশনের অদৃশ্য পাল্লা সেখানে চলবেই। তার মধ্যে এসে দাঁড়াল একেবারে অনন্যা।

অবিবাহিতা মেয়েদের জহুরী আর ইঙ্গ-ভারতীয় উপর তলার বিয়ে প্রভৃতির সব চেয়ে সফল প্রজাপতি হচ্ছেন মিসেস স্যানিয়াল। তিনি পর্যন্ত মনে মনে স্বীকার করলেন যে যার অত শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব আর সুরুচি তার নকল মেকআপের কোন দরকারই নেই।

এমন একটা ঝকঝকে স্ত্রী-পুরুষের মেলায় স্বাতী মনে মনে স্বয়ম্‌কে এনে দাঁড় করাল। চোখ একটু বুজে ভেবে নিল রবীন্দ্রনাথের রচনা

কেমন বীর মুরতি তার
মাধুরী দিয়ে মিশা।

তারপর সে ঠিক করে নিল যে আজ কোন চটুল কথা নয়। নয় কোন চপল উত্তর-প্রত্যুত্তর। নয় কোন ঝিলিকমারা চাহনী বা চমক জাগানো হাসি। স্বয়ম্ অবশ্য তাকে কোন বন্ধনের মধ্যে রেখে যায়নি। তবু সেই মুক্তিকেই স্বাতী সবচেয়ে বড় বন্ধন মনে করেছে। তাকে সম্মান দিয়েছে। মনের গভীরে লালন করেছে।

কিন্তু আঙ্কল স্যানিয়ালের পার্টিতে ওস্তাদ জহুরীর অভাব কোন দিনও হয় না।

মাথায় রাজ্যের ঢেউ-খেলানো চুল আর মুখে মিষ্টি-মাখানো হাসি নিয়ে এক যুবক স্বাতীর সামনে এসে দাঁড়াল।

স্বাতী হালে বিলেত থেকে ফিরেছে জেনে চটপট অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার চেষ্টা করল।

সে বলল, দেখুন ঠিক আপনাকেই আমি যেন এতদিন খুঁজছিলাম। আমি অবসর সময়ে সাইকলজির ফলিত (প্রাকটিক্যাল) প্রয়োগ নিয়ে চর্চা করে থাকি। বিশেষত বিলেতে শিক্ষিত কুমারী ভারতীয়াদের। আপনার জীবনের সঙ্গে পরিচয় না হলে আমার থিসিস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অনুমতি হলে আপনার সঙ্গে আরেক দিন যদি…

এদিকে পিছন থেকে কার ছায়া এসে পড়ল, ওঃ, আবার বুঝি তুমি কুমারী মনের থিসিস নিয়ে শুরু করেছ, ডার্লিং?

স্বাতী মুখ তুলে দেখল পাশে দাঁড়িয়ে এক মহিলা। সুবেশা আর আক্রমণের ভঙ্গিতে সজাগ। মুখের ঘন প্রসাধনের ছোপকে ছাপিয়ে উঠেছে একটা অধিকার বোধের ছায়া।

আমতা আমতা করে মনস্তাত্ত্বিক যুবক পরিচয় করিয়ে দিল, প্লিজ মিট মাই ফিঁয়াসী।

বাগ্‌দত্তার মুখ মোটেই কোমল হল না।

ভিতরে ভিতরে স্বাতীর অসহ্য লাগছিল। অন্য সময় হলে সে শেরী দিয়ে শুরু করত। আজ কিছু ভাল লাগছে না বলে হাতে রয়েছে আপেলের রস। কিন্তু কিছুতেই মন উঠছে না। হাতে গোটা কয়েক ক্যাশু নাট নিয়ে সে ঘরের এদিক থেকে ওদিক বিচরণ করতে লাগল। যেন আর কাউকে খুঁজছে।

হঠাৎ যেন কাঁধের কাছে একটা মসৃণ টাইয়ের ছোঁয়া লাগল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, আরেকটি যুবক। একেবারে কেতাদুরস্ত পোশাক আর তার চেয়ে বেশী পালিশদুরস্ত ব্যবহার।

পরনের স্যুটের ইস্ত্রি, চরণের জুতোর পালিশ আর মাথার চুলের ব্যাক ব্রাশ পাল্লা দিয়ে সমানভাবে কড়া। কোন বিদেশী কোটি কোটি টাকার কারবারের স্থানীয় উঁচু সাহেব না হয়ে যায় না। দিল্লীর মাজাঘষা সাপ্লাই দপ্তরকেও টেক্কা দিয়েছে।

—মাপ করবেন। আজকের সন্ধ্যাটা আপনার জমে উঠছে না মনে হচ্ছে। আপনার সেবায় · মানে, য়্যাট ইয়োর সার্ভিস।

এত কড়া ইস্ত্রি আর চড়া চেহারার ভিতব থেকে এত মোলায়েম কথা বেরিয়ে এল যে স্বাতী তার আচমকা টাল সামলাতে পারল না। অর্ধস্ফুট স্বরে শুধু বলে উঠল, ওহ্!

—মাপ কব়বেন—যদি আপনাকে চমকিয়ে দিয়ে থাকি। আমি শুধু আপনার সঙ্গে একটু কথা কইতে চেয়েছিলাম।

—এই তো বেশ। কথা কওয়া যাক।

স্বাতী ততক্ষণে সামলিয়ে নিয়েছে কিন্তু যুবকটি ততক্ষণে আবার ওকে বেসামাল করে আনছে। খুব মিষ্টি হেসে মাখনের মত মসৃণ গলায় জিজ্ঞেস করল, বলুন তো, আপনি কাব কাছ থেকে পালাচ্ছিলেন?

ইতস্তত কবে স্বাতী উত্তর দিল, না না, পালাব কেন? মানে একজন পুবানো পরিচিত ··

আরো নিবিড়ভাবে হেসে যুবক বলল, আমার খুব সৌভাগ্য যে আমি একজন নতুন আর অপরিচিত।

বলে সে আবো এক ঝলক হাসল। শুধু মুখ নয়, শুধু ঠোঁট নয়, চোখও সেই হাসির ঝিলিকে যেন নেচে উঠল।

স্বাতীর মনের বরফ যেন হঠাৎ গলে যেতে লাগল। যেন মেঘের আড়াল থেকে অনেকক্ষণ বাদে চাঁদ একটুখানি বেরিয়ে এল। মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে সেও এই হাসিতে যোগ দিল। তার গলায় লণ্ডনের বিরাট ডিপার্টমেন্ট স্টোর সেলফ্রিজ থেকে কেনা নকল মুক্তার মালার সঙ্গে দাঁতের আসল মুক্তার হাসি একসঙ্গে ঝিলমিলিয়ে উঠল।

যুবক এই সুযোগ ছাড়ল না। আরো একটু কাছে এগিয়ে এসে মাথা

নিচু করে হেলিয়ে বলল, আমি খুব বড় একটা পুরস্কার পেলাম। এমন তো কিছু হাসির কথা বলিনি। তবু আপনি এত খুসী হয়ে উঠলেন।

হঠাৎ যেন বুকের কাছে নিঃশ্বাসটা ঘন হয়ে উঠল স্বাতীর। সে বলল, না, না, আমার বেশ ভাল লাগল, ভাই। সঙ্গে সঙ্গে তার সুন্দর আঙ্গুলগুলি যেন একটা বরাভয় মুদ্রার ভঙ্গিতে অজানতেই লীলায়িত হয়ে উঠল।

মাথা আবার নুইয়ে 'বাও' করে যুবক বলল—আমায় আপনি খুব সম্মানিত করলেন। প্রথম থেকেই আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল আপনি একটু বিষণ্ণ হয়ে আছেন।

—আমি—আমি—আমতা আমতা করতে করতে স্বাতী আর কিছুই বলতে পারল না।

নয়া দিল্লীর পালিশ বৃথা যাবে না। এই সুযোগে যুবক আরো একটু কাছে এগিয়ে এল। দুটো চোখে যেন প্রিয় প্রসাধনের আরতি দীপ তুলে ধরল সে। বলল, মি লেডি, আপনি তখন ছিলেন রূপসী। আর এখন এখন · অপরূপা।

বলতে বলতে সে পাশের টেবিল থেকে একটি চিল্‌ড অর্থাৎ জমানো বরফে ঠাণ্ডা করা শেরীর ছোট্ট গ্লাস খুব সাধ মিশিয়ে স্বাতীর হাতে তুলে দিল।

প্রায় এক চুমুকে তা শেষ করে এনে স্বাতী একটু উজ্জ্বল বোধ করল। আবেশে আরামে আনন্দে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

আহা! কি সুন্দর মধুমাখা কথা বলেন এই ভদ্রলোক! কোন দিন কোন উপাসক আমার দিকে এমন করে তাকায়নি কলকাতায়। এমন ভাবে খুশী করতে, বিষাদ দূর করে দিতে চেষ্টা করেনি।

মনে পড়ল সেই বিখ্যাত ইংরেজী কথাটা—তুমি হাসলে সারা দুনিয়া তোমার সঙ্গে হাসবে। কাঁদলে তুমি একাই কাঁদবে।

যুবকটি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কোন্ যাদু, কোন্ মায়ামন্ত্র তাতে মেশানো?

আবার মনে পড়ল আরেকটা ইংরেজী গানের কলি—মাই হার্ট ইজ ব্লুয়ার দ্যান ইয়োর আইজ, ধৈরি, তোমার চোখ দুটির চেয়ে আমার হিয়া বেশী নীল, ওগো প্রিয়া। বেদনায় নীল। বেদনাবিলীন হিয়া।

বেদনার কথা মনে হওয়াতে স্বয়মের উপর একটু অভিমানও হল। দিব্যি নিজের পৌরুষের আহ্বানে নিজেকে জাহির করবার জন্য এনলিস্ট করতে চলে

গেল। সেনা দলে নাম লেখাতে যাবার আগে একটি কথাও বলল না। তার পর বীর পুরুষ সেজে কোথায় কোন্ সবুজ নরকে জলপাই-সবুজ পোশাকে মরণের মুখোমুখি হয়ে আছে। আর আমি এদিকে ভাবনায় বেদনায় নীল হয়ে গেলাম।

যুবকের চোখ একদৃষ্টিতে ওর ভাবভঙ্গি দেখে নিচ্ছে। নিজের কথা ও ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া যেন যাচাই করছে। বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞ খেলোয়াড় তো।

স্বাতীর মনে কি প্রভাব হচ্ছে তা বুঝে নিতে হবে। চোখে যে দীপ্তি ফুটে উঠছে তার মানে খুঁজে বের করতে হবে। এই সুন্দরী বোধ হয় কোন জ্বালা জুড়িয়ে নিতে চাইছে। খুব অল্প সময়ে প্রেসার ট্যাকটিকসে চাপ চালিয়ে সহজে ফল পাওয়া যুবকের অভ্যাস। গলা লোহার মত হৃদয়কেও গরম থাকতে থাকতেই চাপ দিতে হয়।

তবে এক্ষেত্রে বোধহয় একটু সময় হাতে নিয়ে খেলানোই নিরাপদ। খাস লণ্ডন ফেরৎ। সেটা ভোলা ঠিক নয়।

বেশ ধীরে ধীরে যেন পা মেপে এগোতে এগোতে সে একটু পরে নিবেদন করল, চলুন না, একদিন ডিনার খাওয়া যাক এক সঙ্গে। যে দিন আপনার সুবিধা, যে রেস্তোরাঁ আপনার ভাল লাগে। ওমর খৈয়াম রুম? প্যালেস হাইট্স?

রণকৌশল সে খুব ভাল করেই জানে। তাই এমন সব রেস্তোরাঁর নাম সে করল যার আবহাওয়া, এমন কি নাম পর্যন্ত রসের পরিচয় দেবে।

উত্তেজনার আবেশ তখনো স্বাতীকে, তার ছায়াচ্ছন্ন চেতনাকে উত্তপ্ত করে রেখেছে। চোখকে করে রেখেছে উজ্জ্বল। সে শুধু বলল, বেশ।

অনেকক্ষণ দুজনে একসঙ্গে ছিল। অনেক হাস্য পরিহাস। অনেক মৃদু আলাপ। এতটা ঘনিষ্ঠতা অন্য লোকের নজরে পড়বে। তা পড়ুক। নয়া দিল্লীর পার্টির পরিবেশই তো এই।

স্বাতী সরে এসে সান্যালকাকার চেয়ারের হাতলে হালকা ভাবে বসল। তিনি খুশী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সে পার্টিটা কেমন উপভোগ করছে, কেমন মনের মত সঙ্গী পাচ্ছে ইত্যাদি।

'মনের মত' কথাটা স্বাতীকে যেন একটা ধাক্কা দিল। সে মনে মনে ভাবল— হায় আঙ্কল, তোমার বয়সে তুমি কি জানবে মনের মত বলতে কি বোঝায়। পৃথিবী ভরা রয়েছে হাসি, তামাশা, য়্যাডমিরেশন সব কিছুতেই। বিরহ বিচ্ছেদ সত্ত্বেও। তবু কি ছাই মনের মত মানুষ মেলে!

কাকা সস্নেহে ওর হাতে হাত বুলোতে লাগলেন। ফিস ফিস করে বললেন, এই কচি বয়সে একা থাকা মানেই সব কিছু থেকে নির্বাসন। তার কোন মানে হয় না।

স্বাতীর মনে আগুন জ্বলে উঠতে লাগল। ওই বৃদ্ধ তার কাজের ব্যস্ততা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নাতী-নাতনী সংসার নিয়ে ডুবে আছে। ও আমায় কি শেখাতে চাচ্ছে?

কাকা স্বাতীর হঠাৎ ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন না। কলকাতা থেকে যে সব চিঠি পেয়েছিলেন সেগুলিই মনের মধ্যে ঘুরছিল।

তিনি বলে চললেন, হ্যাঁ, এই বয়সে এই রকমই হয়। ইয়ুথ কল্‌স্ আনটু ইয়ুথ। যৌবন যৌবনকে আহ্বান করে। অবশ্য আশা করে বেশী। আর করে বড় তাড়াতাড়ি। প্রত্যাশায় বসে থাকার মত ধৈর্য থাকে না। যৌবনের ধর্মই হচ্ছে প্রেসার ট্যাকটিকস।

স্বাতী আর স্থির থাকতে পারল না। কলকাতা থেকে দিল্লীতে কেন ওকে পাঠানো হয়েছে তা বুঝতে পেরেছিল আগেই। এখন বুঝল পাকাপাকি ভাবে। একটু অসহিষ্ণু হয়ে বাধা দিল, আঃ চুপ কর না, আঙ্কল। উপদেশ দিয়ে কি লাভ? তার চেয়ে এই পকোড়াটা খাও।

—ম্ সরি, ভেরি সরি, লিটল্ ডার্লিং।

আঙ্কল মানে মানে পলায়নের একটা পথ খুঁজতে লাগলেন। কাছেই পেলেন মিস্টার চোপরাকে। তাকে বললেন, দেখুন, দেখুন, ভরদ্বাজটা সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিজের বৌয়ের সঙ্গে কেমন পাবলিক কোর্টশিপ চালাচ্ছে।

চোপরা মুচকি হেসে বললেন, সম্ভবত বাড়িতে যখন একলা থাকে তখন বৌকে পেটায় বলে।

আঙ্কলও হেসে জবাব দিলেন, তা—তা তো' হতেই পারে। সুখী দাম্পত্য জীবন বলে মনে হবে এমন কিছু দেখলেই আজকাল কেমন কেমন একটা সন্দেহ হয়।

চোপরা বিবাহিত দম্পতিদের এখানেই রেহাই দেবার পাত্র নন।

তিনি ফোড়ন কাটলেন, অন্য দিকে দেখুন, মিস্টার স্যানিয়াল, চারদিকেই দেখি স্বামীকে বিশ্বাস করে বসে আছে এমন সব স্ত্রীদের মেলা। ওদের কিন্তু দেখলেই চিনতে পারা যায়। ওদের মুখে পুরোপুরি মাখানো থাকে একটা অসুখী অসুখী গোছের ভাব।

স্বাতীও এদিকে তার অসুখী অসুখী ভাবটা মুখের উপর থেকে মুছে ফেলেছে। পার্টিতে ঠাট্টা মস্করার স্রোত, পরকীয়া প্রশংসার সঙ্গে ফ্লার্টেশনের ফোয়ারা বয়ে চলেছে। এ সবকেই গ্রহণ করে, স্বীকার করে নেওয়াই বরং সহজ পথ। দুঃখ ভুলে থাকবার ভাল দাওয়াই।

একটু দূরে সেই যুবক আরেকটি রকমারী জাঁকজমকে সাজা তরুণীর সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। তার হাতের আঙুলগুলি গলার বিলেতী টাইটাকে নিয়ে খেলা করছে। দুমড়াচ্ছে, মোচড়াচ্ছে আবার মোলায়েমভাবে সব ভাঁজ মিলিয়ে পালিশ করে নিচ্ছে।

ওর টাইটা কি ওরই মনের একটা প্রতীক? একটা প্রকাশ? যতই দাও মুচড়ে, পড়বে না সে মুষড়ে। গা ঝাড়া দিয়ে মন থেকে গত রজনীর ক্ষণ-সঙ্গিনীর মোহ ঝেড়ে ফেলবে। তার পরে আবার নূতন সন্ধান, নূতন লীলাকলা, নূতন বিজয়।

আগামী কাল রাতের ডিনার কি এমনি আরো একটা সন্ধানের সোপান? ইংরেজীতে যাকে বলে কংকোয়েস্ট?

ওর চোখ, তৃষ্ণায় ভরা চোখ চার দিকে ঘুরে বেড়াতে ছাড়ছে না। তার তৃষ্ণা হয়ত কোনখানেই তৃপ্ত হবে না। তীরের মত শুধু ভরা বাসনায় বিঁধবে। গুরু বেদনায় বাঁধা পড়বে না।

ফিসফিসে স্বরে ও এই তরুণীকে গাঢ় অনুনয় করে বোঝাচ্ছিল, ভুল? যে নারী তার ভুলগুলিকে রমণীয় করে তুলতে না পারে সে তো নারী নয়। সে শুধু মেয়ে লোক। আপনি তো মোটেই তা নন।

স্বাতীর চোখের উপর থেকে একটা ঢাকনা খুলে যেতে লাগল।. ·ঃ চোখের আকুল তৃষ্ণা রাতের পর রাত সীমান্তের নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে একটি নক্ষত্রেরই জন্য জেগে থাকবে।

অতিথিরা সবাই উঠে দাঁড়াল। এখনি পার্টি ভাঙবে। রেডিয়োতে রাত্ত নটার বেতার খবর শুরু হবে।

স্যানিয়াল সাহেব সুবিবেচক লোক। প্রস্তাব করলেন যে খবরটা শুনেই না হয় ছত্রভঙ্গ হওয়া যাবে। ততক্ষণে 'ওয়ান ফর দি রোড' হয়ে যাক। অর্থাৎ পথে বেরোবার আগে পথের নাম করে আরেক বার ড্রিঙ্ক ঢালা যাক।

সবাই এতে খুব খুশী হলেন। রুচিবান 'হোস্ট'রা এখনো বিশুদ্ধ স্কচ দিয়ে অতিথি সৎকার করেন।

দিস ইজ অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো।

আজকের বিশেষ খবর হচ্ছে যে জাপানী সেনাদল বর্মা আসাম সীমান্তে নজরে পড়েছে। তবে তারা নিশ্চয়ই সীমান্ত পেরিয়ে ইণ্ডিয়াতে অনুপ্রবেশ করবার মত বল বা সাহস পাবে না। আমাদের সৈন্যদল…

স্বাতী এগিয়ে গিয়ে সেই যুবকের বাহুতে একটা হালকা টান দিল।

নিশ্চয়ই তার মানে বিজয়ের আশ্বাস।

হাসতে হাসতে সে স্বাতীর কাঁধে হাত রেখে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। বলল, অফ কোর্স, আমার নিমন্ত্রণ আপনি নিশ্চয়ই গ্রহণ করেছেন তা মনে রাখবেন। হ্যাঁ, একটু আগে হলেই ভাল হয়। আমি আটটার সময় 'কল' করব।

বলতে বলতে আরো সাহস করে বলে বসল, টিল দেন, হনি।

হঠাৎ এই বাড়তি অন্তরঙ্গতা স্বাতীর মনের কথাকে সহজ করে দিল।

সেও হেসে উঠল, মাপ করবেন, আমার ঠিক মনে ছিল না যে আমার অন্য একটা এনগেজমেণ্ট আছে। শুধু কাল নয়, পরশু, তরশু। কাজেই…

যুবক মচকাল না। রণকৌশলে রিয়ার গার্ড য়্যাকশনও একটা ভবিষ্যতে জিততে পারবার পদ্ধতি। সে বলল, বেশ রসিয়ে বলল, আরো বেশী মজার বোধ হয়?

সমান ভাবেই হাসতে হাসতে স্বাতী শুনিয়ে দিল, হ্যাঁ, অনেক, অনেক বেশী মজার। আর অনেক দিন ধরে।

৩১

বিষ্যুৎবারের পিকাডিলি।

স্বয়ম্ যদি আজ স্বাতীকে চিঠি লিখতে পারত, অন্তত পক্ষে নিজের সম্বন্ধে একটা ছোট্টখাট্ট কাহিনী পাঠাতে পারত তাহলে এই কথা দুটো ব্যবহার করত নিশ্চয়ই।

কিন্তু তার কোনটাই সম্ভব নয়। চিঠি লেখা সম্ভব নয়। জীবনটা "ভবার্ণব তরণে নৌকা"র মত টলমল করছে এই অভিযানে। চিঠি লেখার সময় নেই। নেই চিঠি পাওয়ার পথও। এ হেন বিলাস কর্তারা বরদাস্তও করবে না এই বিশেষ অভিযানে।

একটা বিশেষ কারণও আছে। সে এখন থার্ড ইণ্ডিয়ান ডিভিসনের স্পেশাল ফোর্সে সাময়িকভাবে সেকণ্ডেড হয়েছে অর্থাৎ চালান হয়েছে। এটা নামেই ইণ্ডিয়ান ডিভিসন। কিন্তু এর চব্বিশটা ব্যাটালিয়নে ব্রিটিশ আছে, গুর্খা আছে, আছে আফ্রিকার নাইজেরিয়ান। এমন কি বর্মী পর্যন্ত। নেই শুধু ইণ্ডিয়ান।

কারণ ভারতীয়রা গোপনতা রক্ষা করতে পারে না। অর্থাৎ ওদের এই বিশেষ বাহিনীর কাজে বিশ্বাস করা যায় না!

আসল কারণ স্বয়ম্ আন্দাজ করেছিল। এদের আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে।

তবু সে কেন এই কাজে নির্বাচিত হয়েছিল তাও সে জানে। এর প্রত্যেক ব্যাটালিয়নে একটা কম্যাণ্ড সেকসন আছে যারা আকাশী সাহায্য দেবে, গোপন তথ্য যোগাড় করবে। দরকার হলে সিগন্যাল অর্থাৎ তারে বেতারে খবর পাঠানো প্রচারকার্যও করবে। কাজেই স্বয়মের মুখের গড়ন, স্থানীয় ভাষার দৌড় আর সামরিক বিশেষ শিক্ষা জেনারেল উইনগেট কাজে লাগাবেন। স্বয়ম্ সম্পূর্ণভাবে যাচাই করা মাল।

সেও পেছপাও হল না। এই ব্যবস্থার মধ্যে যে অপমানটা ধামাচাপা আছে সেটা গায়ে মাখল না। মনে মনে ভাবল ওটা শুধুই শ্যাওলার মত ; আমার গায়ে লেগে থাকবে না। সামরিক জীবনের গভীরে আমি অবগাহন করছি।

বরং এই অপমান মুখ বুজে হজম করে নতুন লাভ করা এই শিক্ষাটুকু একদিন আমার স্বাধীন দেশকে উপহার দিতে পারব।

তা ছাড়া বিষ্যুৎবার আর পিকাডিলি এই কথা দুটো সাংকেতিক কোড ওয়ার্ড। এ দুটো কথা কলমের ডগা কেন জিভের ডগাতেও আনা চলবে না।

তবে 'চিনডিট' বাহিনীর খবর কিছু কিছু নানা মুখ ঘুরে কলকাতাতেও হয়ত' পেঁাছেছে। রূপকথায় বর্মী প্যাগোডার পাহারাদার ড্রাগনের নাম চিনডিট। সেই নামই এই ডিভিসন নিয়েছে। চীনে ব্যানডিট অর্থাৎ ডাকাতের মত কাজ করে বলে নয়।

আহা! যদি স্বাতীকে জানানো যেত যে কেমন করে সে 'লিভ এ লিটল' করছে। বেপরোয়া, বেহিসেবী বিশৃঙ্খল জীবনের একি রমণীয় আস্বাদ। স্বাতী, আমি মুহূর্তে মুহূর্তে তীব্রভাবে সব উজাড় করা, সব নিংড়ানো জীবন নিয়ে বেঁচে আছি। তোমার কথা পুরোপুরি মেনে চলেছি।

না। সে সব কথা জানানো যাবে না। সামরিক গোপনতা ছাড়াও মানসিক স্বপ্নালুতাও এই জীবনের সঙ্গে জড়ানো আছে। স্বয়ম্ পেয়েছে এই অভিযানের মধ্যে রসের স্রোত, রঙেব বৈচিত্র্য আর সুরভির হিল্লোল। প্রসন্নতায় ভরে উঠল তার মন। 'চিরকালের লীলার স্রোতে হও যে নিমগন।'

স্বয়মের লীলা শুরু হল লালাঘাট থেকে। লুসাই পাহাড়ের কোলে লুকানো, আঁকাবাঁকা স্রোতের বুকে বসানো লালাঘাট। সেখানে নতুন তৈরী একটা মোটামুটি বিমানঘাঁটি। ফুটবলের মাঠও বলা চলে। শুধু তফাত এই যে মাটিটা ঝাঁঝরা করা ইস্পাতের পাতে মোড়া। বর্ষার কাদাতেও যাতে প্লেন ওঠানামা করতে পারে।

একজন পাইলট একটু আগেই জাপানীদের দখলী বর্মা দেশের আড়াইশো মাইল ভিতর পর্যন্ত দেখে ছবি আর খবর নিয়ে এসেছে। এয়ার স্ট্রিপের ফালি-টুকুতে জলপাই সবুজ রঙের যুদ্ধের পোশাক পরে সারি সারি ব্যাটালিয়নের আর এক নম্বর এয়ার কম্যাণ্ডোর যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে আছে। গ্লাইডারগুলি মাল আর অস্ত্র আর সৈন্য বোঝাই হয়ে আছে। প্রত্যেকটা ডাকোটা বিমান দুটো করে গ্লাইডার টেনে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

স্বয়ম্ একবার সতৃষ্ণভাবে এয়ার কম্যাণ্ডোদের দিকে তাকাল। ওদের সঙ্গে আছে মুস্তাঙ্গ জঙ্গী বিমান, মিচেল বোমারু বিমান, ট্রান্সপোর্ট প্লেন মায় হেলিকপ্টার পর্যন্ত। দরকার হলে আহত সৈন্যদের হেলিকপ্টারগুলি ফেরত

যাত্রায় নিরাপদ এলাকায় নিয়ে চলে আসবে। ওদের গোটা দলটার নাম হচ্ছে কর্নেল কক্‌রাণের সার্কাস। মার্কিনী সার্কাস।

হাওড়া ময়দানের বাচ্ছাকাচ্ছাদের সামনে খেলের বদলে হাওয়া ময়দানে পাহাড় জঙ্গল আর জলার মধ্যে মরণলীলা।

বিষ্যুৎবারের বারবেলা। সত্যিই বারবেলা। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় প্রথম ডাকোটা উড়ে রওনা হবার কথা। কিন্তু সাহেবরা পঞ্জিকা মানে না বলে কি আর কামরূপ কামাখ্যা দেশের যোগিনীরা যাত্রার দিনক্ষণ দেখবে না?

কথায় বলে যে মানুষ ভুল করে আর দেবতারা ক্ষমা করে। কিন্তু ডাকিনীরা যে ক্ষমা করে না সে কথা ভুল করনেওয়ালা মানুষ ভুলে যায়।

এই বিষ্যুৎবার মার্কা অভিসারে হাজার নয়েক সেনা, দেড় হাজার মালবাহী খচ্চর প্রভৃতি আর আড়াইশো টন অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি আকাশপথে শত্রুর সারির পিছনে উড়িয়ে নিয়ে নামিয়ে দেবার ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু বারবেলা বাদ সাধল। যাত্রা নাস্তি। পূর্বে যোগিনী। থুড়ি জাপানী।

যাত্রা শুরু হবার চল্লিশ মিনিট আগে ওদের একটা টহলদারী রিকনয়স্যান্স প্লেন আকাশ থেকে লুকিয়ে উড়ন্ত ভাবে তোলা ছবি এনে হাজির করল। যে খোলা জঙ্গলে ঢাকা জায়গাটার সাংকেতিক নাম দেওয়া হয়েছিল পিকাডিলি সেখানে আড়াআড়ি করে বড় বড় গাছের গুঁড়ি পাতা রয়েছে। প্লেন নামানো অসম্ভব।

তবে কি জাপানীরা এই গোপন অভিযানের খবর পেয়ে গেছে? এর পিছনে আছে কোন্ মাতাহারি? অথবা বিভীষণ?

একটি মাত্র ভারতীয়কে এই যাত্রার জন্য নেওয়া হয়েছিল। তবে কি স্বয়ম্?

এরকম সন্দেহ যে অনেকে, অন্তত নিচের দিকের লোকরা, বিশেষ করে যারা ইংরেজ বা মার্কিন নয়, তারা করবে সে কথা মনে হওয়াতে স্বয়মের মুখ বেগুনী হয়ে গেল। না। তবু সে মুষড়াবে না। উপরওলা সামন্তরা নিজেরা ওর 'ডসিয়ের' গোপন কুষ্ঠি ঠিকুজী দেখে তবেই ওকে বাছাই করেছিলেন। তবে কেন এই বিশ্রী সন্দেহ?

তাছাড়া নীচের দিকের সৈন্যরা জানতেও পারবে না যে কেন যাত্রা স্থগিত হল।

মরবার ব্যাপারেও পশ্চিমী লোকের মনে মজার আমেজ থেকে যায়। বিপদ তাই সহজ হয়ে যায়। আর ভয়ও হয়ে ওঠে সরস।

না হলে এহেন প্রায় আত্মঘাতী অভিযানের মরণক্ষেত্রের নাম কিনা পিকাডিলি? আর পিকাডিলির পথে যদি চোরকাঁটা কেউ পুঁতে থাকে অন্ত ঘোঠেও ধেনু চরাতে যাবে এই রাঙ্গালিয়া দল। সেগুলির নামও কম রঙদার নয়—ব্রডওয়ে আর চৌরঙ্গী।

শুধু রস নয় সাহসও থাকে পশ্চিমের সাধারণ লোকের মনে। আর যোদ্ধাদের তো থাকবেই। স্বয়ম্ মনে মনে প্রশংসা করে সেই শিক্ষাটুকু গ্রহণ করল।

তিন-ঘণ্টার মধ্যেই অভিযানের দিশা ঠিক হয়ে গেল। জেনারেল স্লিম হুকুম দিলেন যে যদি শত্রু জেনেও থাকে পিকাডিলির কথা, হয়ত বাকী দুটোর কথা জানে না এখনো। অভিযান একবার পিছিয়ে দিলে হঠাৎ চমকের সুযোগ আর হয়ত আসবে না।

সাহসী ছাড়া কেউ সুন্দরীকে লাভের যোগ্য নয়। আর সুন্দরী বসুন্ধরা সম্পূর্ণরূপে বীরভোগ্যা।

লণ্ডনে হল না বটে, কিন্তু নিউ ইয়র্কে স্বয়ম্বরা বাসরে চলল।

ককৃরাণের সার্কাসের পাইলটরা সৈন্য আর অস্ত্র আর সাজসরঞ্জামে বোঝাই গ্লাইডারগুলি প্লেনের পিছনে বেঁধে মাটি থেকে টেনে উড়িয়ে নিয়ে চলল। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আকাশে ভেসে চলল গ্লাইডার গুলি। সিগন্যাল যন্ত্রপাতি, অ্যাণ্টি এয়ারক্রাফ্‌ট কামান, পাঁচশো পাউণ্ড ওজনের ব্যাটারী কামান প্রায় বুল ডোজার পর্যন্ত গ্লাইডারে বোঝাই ছিল। চার চারটে ডিভিসন জাপানী সৈন্য আর তাদের হাওয়াই জাহাজের ছাতার আশ্রয়কে ঘায়েল করতে হবে। ওরা যেখানে ঘাঁটি গেড়েছে সেখানে লড়াই দিয়ে নয়। ওরা যেখানে নেই সেখানে কাজ গুছিয়ে নিয়ে।

একেবারে উপরের দিকে জেনারেল উইনগেট ও তার ঠিক নিচের সহকারী সেনাপতিরা ছাড়া অন্য অফিসারকে কেউ এই রণকৌশলের কারণ জানাত না। দেয়ার্স বাট টু ডু অর ডাই। শুধু লড়তে অথবা মরতে হবে এইটুকুই তাদের উপর দেওয়া কর্তব্য। সামরিক শৃঙ্খলার এই কানুন আর তার গুণ স্বয়ম্ মনে মনে মেনে নিয়েছে। প্রশংসাও করেছে মনে মনে।

তা বলে তার মন ছিল না ঘুমিয়ে, চিন্তা ছিল না এলিয়ে। সে বেশ বুঝছিল যে এই অভিযানে একাধারে তিন দিক দিয়ে যুদ্ধ জয়ের সুবিধা হয়ে যাবে।

আঠারো নম্বর জাপানী ডিভিসনের পিছন থেকে এই চাপের ফলে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে জেনারেল ষ্টীলওয়েলের চীনা আর আমেরিকান বাহিনী মিটকিনার বড়

বিমানঘাঁটির দিকে এগোতে পারবে। নিজেদের প্যারা ব্যাটালিয়ন দুটির প্রত্যেকেই ভলানটিয়ার। বাছাই করা, বিশেষভাবে শিক্ষিত। স্বাতী সত্যিই বলেছিল—কোর এলিট। অভিজাত বাহিনী।

কোহিমা আর ইম্ফলের অবরোধের উপর চাপ দিয়ে তাদের সরববাহের পথ বন্ধ করে জাপানী ডিভিসনের ভারত আক্রমণ দুর্বল এবং সম্ভবত নষ্ট করতে পারবে। অথচ বর্তমানে অস্ত্র, খাদ্য এমনকি খাবার জল পর্যন্ত এয়ার ড্রপ করে পৌঁছে দিতে হচ্ছে নিজেদের অবরুদ্ধ সৈন্যদের জন্য।

উত্তর বর্মায় জাপানীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার, বিদ্রোহ করবার, তাদের খাবার ও অস্ত্র সরবরাহ নষ্ট করবার, এমনকি মোকা পেলে তাদের খতম করবার জন্যও সাহস আর উস্কানি দিতে পারবে। সশস্ত্র সৈন্য কাছে পিঠে না থাকলে এটা সম্ভব নয়।

স্বয়ম্ মনে মনে প্রার্থনা করেছিল যে তৃতীয় কাজটির জন্য তাকে না পাঠাতে হয়। সে পুরুষসিংহ হবার জন্য যোদ্ধা হয়েছে, শৃগালবৃত্তির জন্য নয়। 'ভি ফোর্সে' তার আসল কাজ ছিল মিলিটারী ইনটেলিজেন্স সামরিক সংবাদ সংগ্রহ। সেটাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মি চিরকালই একটু কাঁচা।

লালাঘাট থেকে প্রত্যেক পাঁচ মিনিটে একটা করে টাগ অর্থাৎ টানার প্লেন দুটো করে গ্লাইডার উড়িয়ে নিয়ে চলল। নামবার জমির কাছে এসে শিকল খুলে দেবার পর গ্লাইডার গুলি ধীরে ধীরে মাটিতে নামতে লাগল। পেটের উপর ধাক্কা সামলিয়ে দুপাশের ডানা ছিঁড়ে কয়েকটা উলটিয়েও গেল।

এতটা আকাশ পথ অন্ধকারে এসে অজানা আঘাটায় নামা, তা'ও শুধু চাঁদের আলোতে, মানুষকে চন্দ্রগ্রস্ত অর্থাৎ পাগল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রথম ঢেউয়ের সৈন্যরা খোলা জমিটুকু দখল করে পাখার মত চার ধারে ছড়িয়ে পড়ে পাহারা দিতে লাগল।

দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভেসে এল আরো সৈন্য, বুলডোজার, স্যাপার আর মাইনার।

শেষের ঢেউয়ে আনা দল সারা দিনের মধ্যে মোটামুটি একটা বিমানঘাঁটি গড়ে তুলবে।

মুহূর্তের জন্য স্বয়মের মনে হয়েছিল—

এমন চাঁদের আলো
মরি যদি সে-ও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান।

সেই মরণই হল বহু জনের সেই চাঁদিনী রাতে। সত্তরটা গ্লাইডারের মধ্যে মাত্র বত্রিশটা নামল ব্রডওয়েতে।- কিছু অন্য অন্য নিরাপদ' জায়গায়। কিছু ধান জমিতে বা জঙ্গলে নেমে আটকিয়ে গেল। গোটা দশেক শত্রু ছাউনীর মাঝখানে গিয়ে পড়ল। আর একটা তো পড়বি তো পড়্ একেবারে জাপানী ডিভিসনের হেড কোয়ার্টারের ঠিক মাথায়।

আর স্বয়ম্ ?

সঙ্গে ছিল একটা বুলডোজার আর ভারী যন্ত্রপাতি। নীচে একটা ভেঙে পড়া গ্লাইডারকে কোনমতে এড়াবার জন্য চোখা ভাবে কোণা কাটল ওদের গ্লাইডার। ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে জঙ্গলের দেওয়ালের মত সারি সারি বিরাট শাল গাছে খেল ধাক্কা। দুপাশের গাছ গ্লাইডারের ডানা দুটো ছিঁড়ে নিল আর মাঝখানের ফিউসিলাজ অর্থাৎ আসল কামরাটা তার বমাল সমেত মানুষ নিয়ে তেড়ে ছুটে চলল। ফিউসিলাজ যদি বা কোনমতে আটকিয়ে থেমে গেল, মাতাল প্রায় বুলডোজার নাহি ছোড়তা। সেটা সব কিছু ফুঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

স্বয়মের দল কোনমতে প্রাণে বেঁচে গেল।

তারপর কি সব ভয়ানক দৃশ্য শুরু হল। শুধু চাঁদের আলোতে সার্জনরা ভাঙা হাত পা য়্যাম্পুটেট করছে। ভোঁস করে কোন গ্লাইডার জমি ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে ক্র্যাশ করে মরছে। গাছের ডালেব মড়মড় আওয়াজের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে মানুষের আর্তনাদ।

আর যারা বেঁচে আছে, সক্ষম অবস্থায় বেঁচে আছে তারা মানুষ মাবার খেলায় মেতেছে। কেউ কেউ আধমরা মানুষদের বাঁচাবার জন্য জঙ্গলের কোণায় ঘাপটিতে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

জাপানীরা যখন টের পেল ওরা রাগে অন্ধ হয়ে মাঠে জঙ্গলে পড়ে থাকা ভাঙা গ্লাইডারগুলির উপরেই এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলতে লাগল। এদিকে মিত্রপক্ষের সৈন্যরা দলে দলে আলাদা হয়ে জাপানী যোগাযোগ লাইনের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিপদ হল পিকাডিলিকে নিয়ে।

সেখানে কিছু সৈন্যদল গ্লাইডারে করে নেমে পড়েছিল। জাপানী টহলদাররা জঙ্গলের চারপাশ ঘেরাও করে ওদের উপর গুলি চালাচ্ছিল। ওদের সঙ্গের বেতার যন্ত্র বিকল হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত নামবার সময়ের রাম ঝাঁকুনিতে।

অথচ একটি গোপন পথে বেরিয়ে আসবার খবর ওদের পৌঁছে দেওয়া দরকার। না হলে যাঁতাকলে ইঁদুরের মত ওরা মরবে।

একটা ফিরতি মুখের প্লেনে সাংকেতিক কোড দিয়ে পথের সন্ধানটা বাক্সে ভরে পাঠানো হল। কিন্তু ততক্ষণে সৈন্যদল জায়গা বদল করেছে। আর কোডের খবরটা পড়বি তো পড় জাপানী লাইনের মাঝখানে। ওরা কোড ভেঙে খবরটা বার করবার আগেই খবরটা আবার পৌঁছে দিতে হবে। তার জন্য ভলাণ্টিয়ার চাই। কারণ প্লেন থেকে প্যারাশুট দিয়ে যাকেই নামানো হবে তাকেই শত্রু চাঁদমারি করে ছাড়বে। সম্ভবত মিত্ররাই।

স্বয়ম্ এগিয়ে এল। আব নাক মুখ ভাষা আর ভি ফোর্সের অভিজ্ঞতার কল্যাণে সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত হল।

কপাল ভাল। স্বয়ম্ তো কোনরকমে ওর সিসিলি অভিযানের অভিজ্ঞ গুরুব শিক্ষার কল্যাণে নিরাপদে নামল এবং খবরটা যথাস্থানে দিয়ে দিল।

কিন্তু জীবন ও... সহজে ছাড়ে না। বিশেষ করে মরণের সঙ্গে মুখোমুখি মুহূর্তে।

বিদ্যুৎবাবের বারবেলা একজন বাঙালী লেফটেনাণ্টকে ছাড় দেয়নি। জঙ্গলের ঝোপঝাড় দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে স্বয়ম্ এই সাংঘাতিক ভাবে আহত অফিসারকে দেখতে পেল।

যন্ত্রণা যত না, ভয় আর অস্বস্তি তার চেয়ে অনেক বেশী এই যুবকের। ভুল করে পিকাডিলিতে নামা প্রথম গ্লাইডারটিতেই তার স্থান হয়েছিল। কম্যাণ্ড সেকসনের সিগন্যালস অর্থাৎ তার ও বেতারে খবর চালাচালিব নিপুণতার জন্য তাকে বিশেষভাবে নির্বাচন করে শেষ মুহূর্তে গ্লাইডারে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

সেই গ্লাইডারটা একটি বিরাট শাল গাছের উপর আছড়িয়ে পড়ে আর লেঃ সরকাবের একটা গোড়ালি সম্পূর্ণভাবে থেঁতলিয়ে যায়। মেডিক অর্থাৎ এই দলেব সার্জন ওকে সোজা বলে গেছেন যে ওই গোড়ালি একেবারে কেটে বাদ দিতে হবে। এবং এখনি। না হলে গ্যাংগ্রিণ অর্থাৎ সর্বাঙ্গ পচনের হাত থেকে রক্ষা নেই। তিনি কয়েকটি ভারী জখমীকে দেখে ফিরে আসবেন। আপাতত লোক্যাল এনাস্থেটিক দিয়ে পায়ের যন্ত্রণা চাপা দিয়ে গেছেন।

যদি বেঁচে যায় তবুও সরকার সাবা জন্মের মত গোড়ালীহীন হয়ে খোঁড়াবে এই সম্ভাবনা নিয়ে পড়ে আছে।

তার এই কাহিনীটুকু বলে সরকার ব্যাকুলভাবে স্বয়মের দুটো হাত জড়িয়ে

বরল। নীরব হয়ে রইল। কিন্তু সেই নীরবতা চারদিকের গুলি, গ্রিনেড আর আর্তনাদের আওয়াজের চেয়ে অনেক বেশী সরব হয়ে উঠল।

স্বয়ম্ সান্ত্বনা দেবার ভাষা পেল না।

একটু পরে সে বলল, দেখ, তুমি আমার ভাই। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি যে তোমায় ছেড়ে যাব না। মেডিককে বুঝিয়ে বলব যেমন করে পারে তোমায় এখানে অপারেশন না করে বেস হাসপাতালে অক্ষত রেখে পাঠাতে। সেখানে বড় সার্জনরা···

মন শক্ত করে সরকার বলল, না, দাদা। মেডিক বলেছে আর আমিও বুঝেছি যে য়্যাম্পুটেট ছাড়া আমার পায়ের আর গতি নেই। মিছে সান্ত্বনা দিয়ো না।

তার কচি মুখ আর করুণ বেদনা দেখে স্বয়মের মন প্রায় কান্নায় ভরে গেল। ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, বল ভাই, আমায় যা হোক কিছু করতে বল তোমার জন্য। আমি তোমার যদি কোন কাজে লাগি।

সরকার পকেট থেকে একটা চিরকুট বের করল। ওর ওয়ালেটে আইডেন্টিটি পেপারস পরিচয়পত্রাদির সঙ্গে একসঙ্গে রাখা। বারবার স্পর্শে কাগজটি মলিন, কিন্তু যত্নে মমতায় যেন মহীয়ান।

চিরকুটটা মেলে ধরে সে বলল, জান দাদা। আমার মত স্ফূর্তিবাজ রসিক খুব কম হয়। সেই আমি রসকে অমৃতে পরিণত হতে দেখেছিলাম।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্বয়ম্ ভাবল—যদি মনটা ওর একটু অন্যদিকে সরানো যায় হয়ত ও শান্তি পাবে।

তাই বলল, যদি কষ্ট না লাগে বল না সে কথাটা। মেডিক আসতে এখনো বোধ হয় দেরী আছে। তত ক্ষণে যদি 'হেলি' এসে পড়ে সবার আগে তোমায় তাতে তুলে দিতে চেষ্টা করব।

ম্লানভাবে সে বলল, নেবে কি আমাকে ওরা প্রথম দিকে?

—নিশ্চয়ই নেবে। জান, বড়লাট লর্ড ওয়েভেলের ছেলে ক্যাপ্টেন আর্চি ওয়েভেল সাংঘাতিক জখম হয়েছিল শত্রু এলাকায়। বড়লাটের ছেলে—গোটা আর্মি ওকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য বারবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সমস্তটা কোম্পানীকে যথাযথ ভাবে দাঁড় করতে না পারা পর্যন্ত তার জখমের কথা রিপোর্ট পর্যন্ত করেনি। নিজের দলের যাট জন আহতকে ইভ্যাকুয়েট না করানো পর্যন্ত ওকে জোর করেও সেখান থেকে সরানো যায়নি।

এদিকে খবর পেয়ে বড়লাট আর লাটপত্নী নিজেরা আসামে এসে ছেলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু এরা যুদ্ধের সময় বীরের ধর্ম ভোলে না। তুমি প্রথম বারেই যেতে পারবে। তা ছাড়া স্পেশ্যাল ডেস্‌প্যাচে জি. এইচ. কিউ.-তে তোমার নাম নিশ্চয়ই যাবে। কম পক্ষে মিলিটারী ক্রস।

বীরপুত্র ওয়েভেলেরও যে রণক্ষেত্রেই হাত 'য়্যাম্পুটেট' করা হয় এবং তারও অনেক পরে সে সরতে রাজী হয় সে কথা স্বয়ম্ ভাঙল না।

তারপর স্বয়ম্ সেই অমৃতের খবর জানতে চাইল।. সরকারের মন অন্যদিকে সরিয়ে রাখতে হবে যে।

পাটাকে একটু স্বস্তিজনক অবস্থায় সরিয়ে দেওয়া হল। ক্যান্টিন থেকে একটু জল আর এনার্জি ট্যাবলেট দেবার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু সরকার এখন মেডিক্যাল কেস।

সে বলল, জান দাদা, মিলিটারী ট্রেনিংএর সময় ছিলাম মহা সুখে। শুধু ভাল খেতে পরতে ফুটানি মারতে পাই তা-ই নয়। হঠাৎ দেখলাম যে এই ঝকঝকে স্মার্ট ইউনিফর্মের কল্যাণে য়্যাপোলো বেলভিডিয়র বনে গেছি।

স্বয়ম্ ওকে একটু খুশী করবার জন্য বলল, তা কিন্তু ঠিক। কামদেবের তো কোন মূর্তি নেই। কিন্তু য়্যাপোলোর সঙ্গে তোমার আদল আসে। লেডি কিলার হতে পারতে ইচ্ছা করলেই।

—আমার ইচ্ছার প্রয়োজন ছিল না, দাদা। এই যে চিঠিটি দেখছ এ হচ্ছে একটি প্রেম পত্র।

—তা আমি আগেই বুঝেছি ভাই। ওটিই তোমার রক্ষাকবচ হ:ব।

—প্রেম পত্রখানি পেয়েছিলাম মিলিটারী থেকে ফালো নিয়ে যখন কলকাতায় এসেছিলাম তখন। বালিগঞ্জের একটা ফ্যাশনদুরস্ত আধুনিক পার্টিতে। তুমি নিজেও নিশ্চয়ই জান যে ইউনিফর্ম আর রোমান্সের দৌলতে আমরা ছোকরা মিলিটারী অফিসাররা তরুণী মহল মাত করে রেখেছি। স্বয়ম্বরার বরমাল্য গোপনে এমনকি গন্ধর্ব মতেও আমাদেরই গলায় গোপনে এসে পড়ত। ছুটি ফুরোবার আগের রাতে এই চিঠিটা গাড়িবারান্দার সামনে ভিড়ের মধ্যে একটি তরুণী হাতে গুঁজে দিয়ে সরে গেল।

ঠিক যে কোনটি ঠাহর করতে পারলাম না।

আহত সরকারকে উৎফুল্ল রাখবার জন্য স্বয়ম্ বলল, নিশ্চয়ই সব চেয়ে

সুন্দরীটি। প্রেম পত্রে কি ছিল জানতে লোভ হচ্ছে। তোমার সেই লাক, সৌভাগ্য, এখনো 'হোল্ড' করবে। অটুট থাকবে।

—চিঠিটা রোজ বার বার পড়ে আমার মুখস্থ হয়ে আছে:

প্রিয়,

তোমায় ঠিক লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মত অবশ্য দেখায় না। কিন্তু তুমি আমার স্বপ্নলোকের সেনাপতিপুত্র। তোমার রোদে তামাটে হয়ে যাওয়া মুখখানা যেন আগুনে গলা নিখাদ সোনা। যুদ্ধক্ষেত্রের কাদা আর বারুদে ঢাকা আসল সোনা।

ইচ্ছে হচ্ছে তোমার মুখখানা আমার দু হাতে তুলে ধরে ধুয়ে মুছে দিই। সোহাগের পরশে সব ক'টি রেখা বিলীন করে মসৃণ করে দিই। তোমার মুখের ক্লান্ত হাসিকে অধরোষ্ঠের মধু দিয়ে অরুণ বর্ণ করে তুলি।

তোমায় যে ভালবাসি তা খুলে বলবার জন্য আমার কাছে পুরীর সমুদ্রতীর বা দার্জিলিংএর কুয়াশায় ঢাকা আকাশ বা গঙ্গার মেঘে মাখা সূর্যাস্তের প্রয়োজন হবে না।

শুধু তুমি ফিরে এসো।

ইতি—

স্বয়মের মনে এই মুখস্থ করা চিঠির আবৃত্তি গভীরভাবে দোলা দিল। কত রূপে দেখা কত রঙে সাজানো এই জীবন।

কিন্তু এই মুহূর্তে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন এর জীবন বাঁচানো। এবং তার চেয়ে বড় এর মনকে সঞ্জীবিত রাখা।

সে খুব গভীর ভাবে আশ্বাস দিল, ভেবো না, ভাই, এই বীর তরুণী তোমারই জন্য অপেক্ষা করছে। এরই কল্যাণে তুমি সেরে উঠবে। তার পর ইউনিফর্মের উপর মেডাল আর রিবন সাজিয়ে বালিগঞ্জে তুমি আবার যাবে। অধরা এবার হাসিমুখে দেবে ধরা।

বিষণ্ণ কিন্তু অপরাজিত ভাবে সরকার উত্তর দিল, সেই সেনাপতি-পুত্র পিকাডিলির অভিসারে রূপকথার রাজ্য থেকে এক আঘাতে পা ভেঙে মর্তলোকে নেমে এসেছে। আর একটা আঘাতের পর পদক আর পেনসন নিয়ে সে রাজকন্যার সামনে আর হাজির হতে চাইবে না।

একটুক্ষণ থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস দমন করে সরকার আবার বলল, বীরের

মূর্তি নিয়ে এক সন্ধ্যার স্বপ্ন রচনা করা যায়। কিন্তু সে স্বপ্নকে সারাজীবন ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলতে দিই কি করে?

স্বয়মের মুখে কোন উত্তর যোগাল না। যুদ্ধ করা সহজ। শত্রুকে জয় করাও সহজ। কিন্তু জীবন বড় শক্ত ব্যাপার।

আমরা জীবনকে চালাই না। জীবনই আমাদের চালায়।

চারদিকে শ্যাম অরণ্যানী ; ছোট ছোট টিলার মালা আর শালের দীর্ঘায়ত যবনিকা। হঠাৎ হঠাৎ আলোর ফোয়ারা ছড়িয়ে দিচ্ছে স্টার শেল আর মধু রঙের চাঁদের আলোয় মিলিয়ে যাচ্ছে। গরম দেশের লতাপাতার শ্যামলে সবুজে ক্ষণিকের জন্য লালিমা লাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। গুলি আর শেলের বিস্ফোরণ সৃষ্টির প্রথম কান্নার মতই অর্থহীন ভাবে সবাইকে সচকিত করে তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে। মরে যাচ্ছে। মেরে যাচ্ছে।

আঁধার জীবনেও মরণের রঙের কত বৈচিত্র্য।

৩২

মন কেমন কেমন করে ওঠে।

থেকে থেকেই এমন হয়। তখন বোমারু বিমানের পাখার ঝটাপটির চেয়ে অনেক বেশী ছটফট করে ওঠে মন।

আরো বেশী মন কেমন করে দেশের জন্য। মায়ের জন্য।

শুধু তেলে জলে মানুষ আর যুদ্ধে হালে নাম লেখানো স্বয়ম্ই যে অনুভব করে তা নয়। মাইকও সেই একই বিষণ্ণ বিস্মৃতিময় সন্ধ্যার রঙে নিজের করুণ মনকে রাঙানো, রক্তাক্ত দেখতে পায়। পেশাদার সৈন্য হলে হয়ত এমন করুণ সন্ধ্যার বিধুবতার মধ্যে দিয়ে ওদের মনকে আনাগোনা করতে হত না।

প্লেন শুধু সামনের দিকেই ওড়ে। দুর্নিবাব ভাবে। তা না হলে সে পড়ে যাবে। শূন্যে ত্রিশঙ্কু হয়ে ভেসে থাকার পালাও তাব জন্য নয়।

কিন্তু মন নিজের খেয়াল-খুশিতে বা অকারণে এমন কি অজ্ঞাতে পিছন দিকে ধেয়ে যেতে পারে। মন তো যন্ত্র নয়। তার নিজের মন্ত্রকে কোন যন্ত্র বা কোন যন্ত্রণাই রুখে রাখতে পারবে না।

স্বয়মের মন এতক্ষণ শুধু স্মৃতির আকাশে পিছনে, পিছনের দিকেই উড়ে বেড়িয়েছে। মাঝে মাঝেই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে সব ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা, সব সৈন্য আর সব হাতিয়ার আব আগে থেকে ছক কাটা প্ল্যান ঠিক আছে কি না তা পরখ করে দেখেছে।

এ কাজটা সে কবে যাচ্ছে যন্ত্রের মত। তবু ক্ষণে ক্ষণে পেয়েছে সামনে এগিয়ে আসা চরম লগনের আভাস। সঙ্গে সঙ্গে পিছনে তাকিয়ে দেখেছে পরম অভাবনীয়ের আবির্ভাব।

সে যে নতুন মানুষ। নতুনতর জীবনের আবাহন শুনেছে। পেয়েছে ইসারা। দিয়েছে সাড়া।

মাইক এতক্ষণ তার স্মৃতির ভারকে পিছনে রেখে প্লেনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন যেন কেমন একটা ভার তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাচ্ছে। সতৃষ্ণ নয়নে সে একবার প্লেনের ড্যাশ বোর্ডের যন্ত্র আর সংকেতগুলি

ঠিক চলছে কি না যাচাই করে নিল। তার পর একবার বাইরের দিকে তাকাল।

নিচে এক ফালি চাঁদের আকারের একটা হ্রদ জ্যোৎস্নার আলোয় চিক চিক করছে।

ঠিক। সে এবার বুঝতে পেরেছে। এই জন্যই মনটা এত উচাটন হয়ে উঠেছিল। না হলে বার্লিনের উপর বোমা ফেলতে হাত পাকানো, ডিসটিন্‌গুইশড ফ্লাইং ক্রশে সম্মানিত পাইলট চঞ্চল হয়ে উঠবার কথা নয়।

কথা নয়?

কেন? এই এক ফালি চাঁদের পাশে বসেই তো সে একটা রূপান্তর অনুভব করেছিল এই কয়েক সপ্তাহ আগে। সেই স্মৃতি এ মুহূর্তে মনের মধ্যে জেগে উঠল।

প্লেনটা সে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মনটা পিছনে চলে গেল।

ইম্ফলের চারদিকে জলাভূমি গুলিতে সিঁদুর-রাঙা আইরিস ফুল থরে থরে ফুটে ছিল। সেখানে শরৎকালে শ্বেত পদ্ম আর গোলাপী পদ্মের শোভা এই আইরিসের রূপকে ম্লান করে দেবে। কিন্তু আইরিস তার নিজের দেশে ফোটে। তার নিজের মনেও ফোটে। সেই আইরিস।

তা ছাড়া সব কুটিরেরই বেড়ার ঝোপে ঝোপে ছড়িয়ে ছিল গুচ্ছ গুচ্ছ যুঁই ফুল। সৌরভে আর শোভায় রিভিয়েরার সাজানো গোছানো বাগানগুলিকে লজ্জা দিচ্ছিল। ছোট ছোট নালা খাল নদীর পারে পারে শাদা কাঠগোলাপের সার। নীল আকাশের রঙের ছায়া মেখে সবুজ শ্যাম পাহাড়গুলি সমতল ভূমির টুকরোগুলিকে আয়নার ফ্রেমের মত ঘিরে রেখেছে। ধানখেতগুলিকে চিকন উজ্জ্বলতায় ভরে দিয়েছে। সেই মণিপুর। সেই ইম্ফল।

মাইক এসেছিল একটা 'রিকনয়টাবেব' পর্যবেক্ষণের কাজে। কোথায় কোথায় তার প্লেন যাবে, ঘাঁটি তাক করবে বা মাল প্রভৃতি নামাবে তার একটা আগাম সরেজমিন তদন্ত করে রাখা দরকার। সঙ্গে আকাশী যুদ্ধের বিভিন্ন বিভাগের অফিসাররা। সবাই শিক্ষিত, নতুন যুদ্ধে দীক্ষিত আর মোটামুটি সমবয়সী।

এ হেন তাজা কচি মনের অধিকারী শিক্ষিত স্বদেশবাসীর সঙ্গ পেয়ে মণিপুর করদ রাজ্যের ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট, ঝানু আই-সি-এস জিমসন হাতে স্বর্গ পেলেন। জাপানী আতঙ্ক আর অবরোধের সম্ভাবনা সমস্তটা উপত্যকায় তার নিষ্ঠুর ছায়া ফেলেছে। জাপানীরা অবলীলাক্রমে নিজেদের রসদ আর কামান

নিজেরাই বয়ে গোপনে, অজানা আঘাটা বেয়ে, মণিপুরের পাহাড়গুলি দখল করে ফেলতে পারে। তা ঠেকাবার সাধ্য আছে এমন পরিচয় মিত্রশক্তি এখনো দিতে পারেনি।

সেই পরিবেশে মাইকের দল যখন একরাশি দেবদূতের মত আকাশ-পথে নেমে এল তখন সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে জিমসন তার রেসিডেন্সী ভবনের আতিথ্য পুরোপুরি ওদের জন্য খুলে দিলেন। লাল ইটের বিরাট প্রাসাদ। সম্মুখভাগে গ্রীক করিন্থিয়ান থামের অভিজাত চেহারা। আম পিপুল আর বেগুনী ফুলের গাছ জাকারান্দার ছায়ায় ঘেরা বাগান। বিলেতী লুপিন ফুলের শয্যা দিয়ে প্রান্তর সাজানো। রক্ত-সিঁদুরী বোগেনভিলিয়ার মেলা প্রত্যেকটা দেওয়াল ছেয়ে আছে। আর আধখানা চাঁদের আকারের পদ্মপুকুরে হয় প্রসন্ন রোদ ঝিকমিক করে হাসে, না হয় বর্ষাধারা জলতরঙ্গ বাজায়।

মাইক আর তার বন্ধুরা তাদের সামরিক খোলস খসিয়ে পদ্মপুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ তো বিলেতী ক্লাবের সুইমিং পুল নয় যে সভ্যতার নিয়ম মাফিক রয়ে সয়ে উপভোগ করতে হবে। সূর্যের উত্তাপে দেহের সব বাধাবন্ধন আপনা থেকে খুলে গেল। শুধু মশারিমার্কা জাঙিয়া পরা মহাদেবমার্কা দেহগুলি কমলসায়র তোলপাড় করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

জীবনে এই প্রথম ওরা কমলবন দেখেছে। ইয়োরোপের মৃত্যুযজ্ঞ এবং এশিয়ার মৃত্যুযজ্ঞের মাঝখানে এই স্নিগ্ধ শান্তির অন্তরাটুকু ওরা অন্তর ভরে ভোগ করে নিতে চায়।

তার পর ক্লান্ত হয়ে ওরা পারে এসে টান টান হয়ে নরম সবুজ ঘাসের গালিচায় এলিয়ে পড়ল। পিছনে পড়ে রইল গোপন পর্যবেক্ষণের প্ল্যান, হানাদারদের উপর পিছন থেকে হানার ব্যবস্থা আর জানোয়ার হাতিয়ার আর জঙ্গী দলের পরিবহন।

এই তো জীবন। তিলে তিলে প্রতিদিনের শত কাজের সহস্র যন্ত্রণার মধ্যে শ্যাম্পেনের আস্বাদের মত সুধারস।

আজি যে রজনী যায় তাকে জিমসন সাহেব ফিরাতে দিবেন না। এরা প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে আজ বন্ধনহীন দায়িত্বহীন জীবন আস্বাদ করে নিচ্ছে। কাল সকাল থেকেই ওরা অন্য মানুষ হয়ে যাবে। আজ সন্ধ্যাতেই ওদের জিমসন মণিপুরী নাচ দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। এবং

রেসিডেন্সীর মধ্যেই। বাইরে নিয়ে গেলে যদি গুপ্তচররা খোঁজ পেয়ে যায়।

বিশেষ করে নাচ দেখাবার বন্দোবস্ত করলেন জিমসন সাহেব এজন্য যে এরা সবাই বিশ্ববিত্থালয় ফেরত। সাধারণ জঙ্গী অফিসারদের মত এরা বলরুম নাচ বা কম্ফর্ট গার্লস অর্থাৎ আরামের নারী খুঁজে বেড়ায় না।

প্লেন চালাতে চালাতে মাইকের চোখের সামনে ভেসে উঠল মণিপুরী নাচের সেই অপূর্ব দৃশ্য।

হলিউডের জিগফিল্ড গার্লসদের অবিশ্বাস্য রকমের জমকালো চোখ-ধাঁধানো দৃশ্যের মধ্যে নাচের ছবি সে দেখেছে। দেখে বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোথায় লাগে জিগফিল্ড গার্লদের লাস্য মণিপুরী মেয়েদের লাবণ্যের কাছে। ওদের বিলাস জাগিয়েছিল বিভ্রম। এদের রাসলীলা জাগাল বিস্ময়। এই নাচ হচ্ছে দেবতাদের উৎসব। তাদের আনন্দ দেবার জন্য এই রচনা।

লাই হারাওবা নাচে মেয়েদের মিছিল দেখে মাইক মুগ্ধ হয়ে গেল। পূজো আর আরতির পরিবেশে দেবতার আবাহনের মধ্যে নর্তকীরা আমন্ত্রণ জানাল সৃষ্টিকে, যৌবনকে, প্রেমকে। অনবদ্য হাতের ভঙ্গিতে ললিত লীলায় ভরা সৃষ্টির প্রশস্তি গাইল। যে সৃষ্টি জীবনের ধারাকে রাখে অব্যাহত, জন্মস্রোতকে নব নব রূপে মরণের কবল থেকে ঊর্ধ্বে অক্ষুণ্ণ রাখে। ওরা ললিত ভঙ্গিতে, মধুর সঙ্গীতে গাইল লাস্যভরা যৌবনের বাসনার গান।

দুলে দুলে ফুলে ফুলে অলিদলের মত ওরা ব্যঞ্জনাময় গতিতে ঘুরতে লাগল। ওদের উল্টো দিকে পুরুষ নর্তকরা এসে হাজির হল। নারীদের তালে তালে ময়ূরের মত ওরা নিজেদের মেলে ধরে নাচতে লাগল।

কোথায় লাগে তার কাছে দক্ষিণ আমেরিকার ট্যাঙ্গো বা স্পেনের ফ্লামেন্কো নাচ।

লাস্য আর তাণ্ডবের অপরূপ মিশ্রণ দেখতে লাগল মাইক আর তার বন্ধুরা। মুগ্ধ হয়ে তদ্‌গত হয়ে ওরা সৃষ্টিক্ষমতা আর নবজন্মের পূজার আরতি দেখতে লাগল। ভাবে, তালে, রাগে, নাট্যে আর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠল একের পর একে মহারাগ, বসন্ত রাগ, কুঞ্জ রাগ। প্রাণের সৃষ্টি যে কেমন করে প্রেমে বিকশিত হয় তারই রসময় ব্যঞ্জনা।

আত্মহারা হয়ে নাচ দেখতে দেখতে ওরা মিলিটারী মেসে ওদের মধ্যে খুব বেশী চালু গানটাও ভুলে গেল :—

নরকের ঘণ্টা বাজে টিংগা লিংগা লিং
তোমার জন্যে, আমার জন্যে নয়।
দেবদূতরা গাইছে গান লিংগা লিংগা লিং
স্বরগে হাজির হবার চায়ের সময় ॥

মৃদঙ্গের বোল আর করতালের দোল ওদের জীবনের আনন্দস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

আকাশের রেখার ওপার থেকে সেই চাঁদের ফালির মত কমল সায়রে তখন ছায়া ছায়া একটা ভাব চাঁদের আলোতে আর নাচের আসরের আলোতে হাসতে শুরু করেছিল। আর সঙ্গীতের ক্ষণিক বিরতিগুলির ফাঁকে ফাঁকে জলের হিল্লোল অস্ফুট ভাবে শোনা যাচ্ছিল। দিগন্তে দূরান্তের পাহাড়গুলির চূড়ায় চূড়ায় হালকা হাওয়ার দোলায় শাদা মেঘ আর নীল আকাশের লুকোচুরি দেখা গিয়েছিল সারাদিন। আর এখন কমল সায়রে চাঁদের হাসির ঢেউয়ে ঢেউযে ভাঙাচোরা লীলা।

তাই এরা যে গান গাইছিল আর যে নাচ নাচছিল তার পটভূমি হচ্ছে কুঞ্জকানন। শত্রুর কামান নয়।

অবশ্য গোপনে মণিপুরের সবারই মনে জাপানী আক্রমণ সম্বন্ধে ভয়ের ভাব এসে গিয়েছিল। কিন্তু মুখে কখনো প্রকাশ করত না। ব্রিটিশ সিংহের ল্যাজ জাপানীরা বর্মা মালয়ে মুর্চাডিয়ে ওদের ভাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার কেশর ফুর্‌র্‌ ফুর্‌র্‌ করে উড়ছে এদেশে।

আর কেনই বা উডবে না? মার্কিনরা এসে গেছে আসামে। মণিপুর রোড রেল স্টেশন থেকে আরম্ভ করে ইম্ফল পর্যন্ত মিত্র সেনার আনাগোনা। মা ভৈঃ!

তাই মণিপুরের বাসিন্দা লোকরা যুদ্ধ সত্ত্বেও বেশ হাসিমুখে জীবন চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রচুর টাকা আর খাবার জিনিস আর ভোগ্যসামগ্রী যুদ্ধের দৌলতে এদেশে ঢালা হয়েছিল। ছোট্ট ইম্ফল শহরে রোজ চলছিল চার চারটে থিয়েটার আর অগুনতি নাচের নাটমণ্ডপ।

এতদিন শিশুর মত সরল, নিশ্চিন্ত জীবন ছিল ওদের। ওরা ঘুমিয়ে পড়ত ইংরেজীতে যাকে বলে লাকডির মত আর ঘুম থেকে উঠত সংস্কৃতে যাকে বলে সূর্যমুখীর মত। তারপর নিজেদের অনেক ভাবে নাড়া দিয়ে দিনের কাজে সাড়া দেবার জন্য তৈরী হতে শুরু করত।

সঙ্গে সঙ্গে ওদের মুখে নেমে এসেছিল একটা নীরক্ত নীরবতা। কথা গেল বন্ধ হয়ে, নৃত্যগীত হল স্তব্ধ। চঞ্চল চরণে তরুণ তরুণীর দল যেন নৃত্যপরা মেনকার মত তালভঙ্গ করে মঞ্চ থেকে বিদায় নিল। নিমেষের মধ্যে কোন অদৃশ্য মায়াবী সব আনন্দ মুছে দিয়ে গিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে মাইকদের তারুণ্য ফিরে পাওয়া, ভাবনা পিছনে ফেলে আসা মুখগুলি কোমলতাকে মুখোশের মত ফেলে দিল। নিমেষে পাণ্ডুর আর তার পর মুহূর্তে কঠোর হয়ে উঠল।

স্বেচ্ছায় নিজের দেশ, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য ছাত্রজীবন ছেড়ে যুদ্ধে মরণের জন্য ওরা নাম লিখিয়েছিল। তার মধ্যে যে করুণতা আর সাহস আর বাঁচবার বাসনা নিহিত আছে তা ওরা মনেও আনতে চায়নি।

তবু অর্ধমুকুলিত ফুলগুলির পরাগ রেণুতে জীবন মাধুরীর সঙ্গে মরণ মহিমা মিশে থাকে সব সময়। হায়! মধুতে ভরা কমল বনের কলিকাগুলির মধ্যে হিংসার বিষ জেগে উঠছে যে। এখনি।

এখনি। এই জাপানী কামানের দূরাগত গুম গুম ধ্বনির সহসা তাড়সে।

সেই রাতের মায়াময় স্মৃতির হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে মাইক আবার সামনের দিকে তাকাল।

সেই প্রথম ডমরু ধ্বনির পিছনে পিছনে এসেছিল জেনারেল মুটাগুচির তিনটি পদাতিক ডিভিসন অর্থাৎ সাতাশটি ব্যাটালিয়ন, ৩৩নং ডিভিসন আর নেতাজীর আই. এন এ ব্রিগেড। ওদের ঠেকানোর একমাত্র যে উপায় ছিল তা সম্মুখ সমর নয়। ওদের হেভী আর্টিলারী আর ট্যাঙ্ক আর প্যাক আর্টিলারীকে পিছন থেকে আক্রমণ করার জন্য পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে নতুন চমকপ্রদ আকাশী অভিযান হচ্ছে এটা।

মাইক 'এস' পাইলট ও লীডার হয়ে পথ দেখাবার সৌভাগ্য পেয়েছে।

বিরাট রাশিয়ান ফ্রণ্টের চেয়ে দক্ষিণ চীন থেকে আরাকান পর্যন্ত ছড়ানো বর্মা ফ্রণ্ট অনেক বেশী বড। তারই মধ্যে সে ফর্মেশন ফ্লাইটের দলপতির দায়িত্ব পেয়েছে। দুরূহ দায়িত্বের দুঃসহ আনন্দে সে ভরপুর।

সেই আনন্দে সে এখন একবার মণিপুরের মরকত মণির চূড়াগুলির দিকে জার্মান কবি গ্যেটের মত প্রসন্ন সিংহাবলোকন করল। গ্যেটে বলেছিলেন যে একটা দেশকে ভাল করে দেখতে গেলে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়াও। তখন আত্মস্

বাচ্চারা যেমন করে খেলনা নিয়ে নির্ভাবনায় কাটায় ওরাও তেমনি ভাবে গীতিকবিতার মত স্বচ্ছন্দ ভাবে দিন কাটাত। ওরা গান করত, নাচত—কেবল দেখাবার জন্ত নয়, শোনাবার জন্য নয়। পাখী যেমন গায়, ময়ূর যেমন নাচে তেমনি ওদের সহজ ভাবে জীবনের আঙিনায় বিহার।

প্লেন চালাতে চালাতে মনে পড়ল যে এই আনন্দের ছবি দেখবার জন্ত মাইক আর তার সহকর্মীরা উৎসুক হয়ে এসেছিল। এবং এই ক্ষণটুকু পর্যন্ত তাই অনুভব করছিল। চারদিকের সেনা আর সাজ সাজ রব যেন মণিপুরীদের আনন্দকে ছুঁয়ে যেতেও পারেনি এত দিন।

সেদিন দুপুরেই মাইক জিমসনকে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা স্যার, এখানে কাউকে দৌড়াতে দেখি না কেন?

জিমসন হেসে বলেছিলেন, চোর ছাড়া আর কেউ এদেশে দৌড়ায় না।

মাইক ভাবল যে বোধ হয় এরা সবাই আশা করছে যে জাপানীরা যদি ভুল-ক্রমে চোরের মত হঠাৎ এসে পড়ে ওরাও দৌড়াবে অর্থাৎ দৌড়ে পালাবার পথ খুঁজবে।

অহিংস বৈষ্ণবের দেশ, প্রেমের গানে মুখর ললিত কলার লীলাভূমিতে এসে ক্ষণকালের জন্ত মাইক যুদ্ধের পোশাক আর মনকে মুখোশের মত খসিয়ে দিয়েছিল। সরিয়ে রেখেছিল।

সেই সন্ধ্যায় রেসিডেন্সী যেন গার্ডেন অব ইডেনে পরিণত হয়েছিল। যেখানে সবাই হাসবে, খুশী হবে। আশা করবে।

সেই নিশ্চিন্ত আশা নিয়েই রেসিডেন্সীতে মণিপুরী তরুণীরা সবে মুখাবলি নাচ শুরু করেছিল। নরনারীর সৃষ্টি আর প্রেমের সঞ্চার হবার পরই মনো-হরণের পালা। তাই করযুগল, চরণ দুখানি, নিতম্বভার আর মোহন মুখ নিয়ে কৃষ্ণ কানাইয়ের বাঁশীর সুরে সাড়া জাগাতে হবে।

মৃদঙ্গের বোলের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরীরা নাচছিল আর 'মধুর মধুর' বলে ধ্বনি তুলছিল। সঙ্গীতে অনুরাগী মাইক ওদের সঙ্গে সঙ্গে গোপনে তাল দিচ্ছিল—

ধা কি তা ধা ধুমা কি তা ধা
ধে রা কিতা ধা·· ···

এমন সময় গুরু গুরু রবে আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরে জাপানী কামানের গম্ভীরা বেজে উঠল।

বজ্রগম্ভীর তার প্রতিধ্বনি পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়।

গিরিমালাকে একটি বিশাল স্থাপত্যকলার স্তূপ মনে হবে। তুমি মোহিত হয়ে যাবে দেখতে দেখতে।

কিন্তু মাইক একথাও মনে করল যে তাদের ফোর্থ কোর সেনাদলের হাতে সম্প্রতি মোটে সামান্য র‍্যাশন ছিল। আরো পঁচিশ দিন তাতেই চালিয়ে নেবার জন্য র‍্যাশন কেটে ঠিক অর্ধেক করে দিতে হয়েছিল।

তখন সে আর তার দল বোমা ফেলার বদলে শত্রুকে এড়িয়ে দেড় কোটি টন র‍্যাশন, সাড়ে আট লাখ গ্যালন পেট্রল, আট কোটি সিগারেট আর দেড় হাজার টন খচ্চরের খাবার জাপানী সেনাদলের পিছনে নিজেদের সেনার ব্যবহারের জন্য আকাশ পথে নামিয়ে দেবার ভার পেয়েছিল।

একগাদা প্যারাসুটের মালায় ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে জীপ গাড়ি, বেইলি ব্রিজ, কামান প্রভৃতি নামিয়ে দেবার অভিনব কৌশলটা তার মাথাতেই এসেছিল। তার জন্যই ৫৩ নং জাপানী ডিভিসন ইম্ফলের দিকে এগোতে পারছে না।

প্রাণ ভরে সে একটা প্রসন্ন নিঃশ্বাস নিল। পাশে তাকিয়ে তার অভিযানের বন্ধু, তার সহপাঠিনীর বন্ধু স্বয়মের দিকেও একবার দেখে নিল। নিজে তো যুদ্ধ করছে নিজের দেশের জন্য, জাতির জন্য। হ্যাঁ, সাম্রাজ্যের জন্য। স্বয়ম্ করছে কার জন্য? এমন বেপরোয়া ভাবে ঝুঁকি নিয়ে যেচে কাজ নিচ্ছে বার বার। কেন? কিসের জন্য?

মুখ ফুটে স্বয়ম্ কিছু বলেনি কখনো।

কিন্তু মাইক রিসার্চের ছাত্র। অতএব সে কিছুদিন আগে এ বিষয়ে একবার গবেষণা করেছিল। সে সময়ে জঙ্গলে তাঁবুতে একসঙ্গে বসে সে সমুদ্রগর্ভে ডেপ্‌থ চার্জের মত স্বয়মের মনের গভীরে তলফোঁড় দিয়েছিল।

ঠিক বিলেতী ভব্যতা আর নিস্পৃহতার বেড়াজালের ওপার থেকে একটা পাহাড়ী রূপকথা ফেঁদে বসেছিল। যদি স্বয়ম্ নিজেকে মেলে ধরতে চায় ধরুক। যদি না চায়, তার গোপন মনে সে অনধিকার প্রবেশ করতে বা অনর্থক আঘাত দিতে চাইবে না। সেই কথাবার্তাগুলি মাইকের মনে পড়ল। মরণঝাঁপের আগে।

মাইক বলেছিল, জান স্বয়ম্, এই উত্তর-পূর্ব পার্বত্য লোকদের রূপকথাগুলি কি চমৎকার। দেশটাই তো রূপকথার দেশ। তুমি তো আকাশী সেনাপতি। তোমার যোগ্য গল্প হচ্ছে এটা। এরা বলে যে রামধনুতে চড়ে দেবতারা পৃথিবী থেকে আকাশে উড়ে চাঁদের দেশে উঠে যায়। প্রেয়সীর সঙ্গে

মিলবার জন্য। আরেকটা উপজাতির গল্পে আছে যে রামধনুর আকাশী সাঁকো দিয়ে বধূ তার বরের বাড়ি যায়। তুমিও নিশ্চয়ই বিমান থেকে একদিন নেমে আসবে কোন রাজকন্যার আঙিনায়।

স্বয়ম্ হাসিমুখে কোন ভাবলেশের ছোঁয়া রাখেনি।

"সে বলেছিল, মাইক, এই পাহাড়ী সীমান্ত দেশে যদি কোন মিল্টন জন্মাত আর এদের ভাষা যদি ইংরেজী হত তাহলে এদের পৃথিবী আর আকাশ আর গ্রহ তারা সম্বন্ধে যা কাহিনী আর ধারণা আছে তার মাহাত্ম্য সবাই স্বীকার করত। এরা বলে যে আকাশ আর ধরণী হচ্ছে প্রেমিক প্রেমিকা। আকাশ যখন ধরণীকে ভালবাসে ঘাস লতা গাছ প্রাণী প্রভৃতি সন্তান জন্মায়। হায়, তবু এদের মধ্যে ঘন ঘন বিচ্ছেদ হয়। ভেবে দেখ, মাইক, তোমাদের মিল্টনের কলমে এই বিষয়বস্তু কি দারুণ একটা প্যারাডাইস সৃষ্টি করতে পারত।

মাইক ওর দিকে একটা প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে বলেছিল, স্বয়ম্, তোমার পাণ্ডিত্য আর সাহিত্যবোধ নিয়ে তুমিই সেই মিল্টন হলে না কেন? কেন তুমি এই নরক গুলজার করা যুদ্ধে নাম লেখাতে এলে? এ তো তোমাদের নিজস্ব যুদ্ধ নয়। তোমাদের নেতা গান্ধীজী তো তাই বলেন।

স্বয়ম্ কথাটা এড়িয়ে গিয়েছিল। সে শুধু বলেছিল যে রাজনীতি জীবনেব সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না। রাখা উচিত নয়। তোমার প্রশ্নের বদলে আমি তোমায় সুবন শিরি উপত্যকার মিরি জাতির সূর্যস্তবের কথা-গুলি শোনাচ্ছি। তুমি যখন শেষ রাতে বোমা বোঝাই প্লেন নিয়ে সূর্যোদয়ের পানে ধেয়ে যাও তখন এই প্রার্থনাটা মনে রাখলে একটা তাজা আর সাহসী ভাব বোধ করবে।

মিরিরা বলে,—হে সূর্য, তুমি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সবার উপরে। সব কিছু দেখ। তোমার উৎসবের মধ্যে নীচের পৃথিবী থেকে তুমি সুন্দর গহনায় সেজে, রঙীন টুপি মাথায়, শাণিত অস্ত্র হাতে উঠে আস। জান, মাইক, তোমার সঙ্গে বোমারু বিমানে অভিযানে বেরিয়ে আমার সেই স্তবটা সব সময় মনে হয়। প্রাচীন মিশরের ফারাও আখনাটেনের সূর্য স্তব এত মহান নয়। আর জান, সুবন শিরি কথাটা হচ্ছে আসলে সুবর্ণ শ্রী। সোনার সৌন্দর্য।

মাইক গভীর স্বরে বলেছিল, সেই সোনার সম্পদ তুমি কার কাছে পেয়েছ তা···

আর কিছু সে বলতে পারেনি সেই রাতে।

তখনি তার ক্যাম্প খাটের কাছে রাখা খুদে মাইক্রোফোনে একটি সাংকেতিক আওয়াজ আরম্ভ হয়েছিল। সে তার যন্ত্রটি কানে তুলে নিয়ে কি সব কথা শুনল। স্বয়ম্ কিছু বুঝল না। কিছু জিজ্ঞেসও করল না।

মিলিটারী গোপন পর্দার আড়ালের খবর যে সংশ্লিষ্ট নয় তার জানতে নেই। জিজ্ঞেসও করতে নেই। এমন কি বন্ধুত্বের খাতিরেও নয়। সে শিক্ষা স্বয়ম্ পেয়েছে মিলিটারীতে এসে।

সে চুপচাপ তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সে জানত যে এই বিশেষ রেডিয়ো টেলিফোনে যে সব কথা হয় তা 'স্ক্রাম্‌ব্‌ল্‌ড' হয়ে অর্থাৎ নানা রকম আওয়াজের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে ইথার তরঙ্গে ভেসে আসে। শুধু যে কথা বলছে আর যে শুনছে তাদের দুজনের যন্ত্রে সেই মাখামাখির গোঁজামিলের ছদ্মবেশ ছেড়ে আসল কথাগুলি প্রকাশ হয়। সেই দুজন ছাড়া অন্য কেউ তা বুঝতে বা ধরতে পারে না।

এই সূক্ষ্ম সেক্রাফোন বাণী পাঠানো বা শোনার যন্ত্র মাত্র গুটিকয়েক বিশেষ কর্মীকে দেওয়া হয়। মাইক তার কাজের গুরুত্ব আর দায়িত্বের জন্য সেই রকম একটি খুদে যন্ত্র ব্যবহার করে। সব সময় সঙ্গে রাখে।

সে সব গোপন সাংকেতিক কথাবার্তার পরে মাইক স্বয়মের খোঁজে তাঁবুর বাইরে এল। এসেই দূরে একটা রক্তরাঙা লাল ফুলে ছাওয়া গাছের তলায় স্বয়ম্‌কে দেখতে পেল। কোন্ চিরবিরহী ওর সামবিক বাসনার তলায় বাঁশীর বদলে অসি তুলে নিয়েছে তা আবাব বের করবার জন্য সে রিসার্চ করবে। এক পক্ষেব অর্থাৎ স্বাতীর মনের কথা সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু নিজের মধ্যে মগ্ন স্বয়মের মন রয়েছে অজানা।

মাইক মনে মনে জানে যে হাতে আর মাত্র দু-তিনটে রাতের অবসর আছে। তার পরেই···

তাই এখনি এই সেক্রাফোন কথাবার্তা যেন মোটেই হয়নি এমন একটি ভাব দেখিয়ে সে স্বয়ম্‌কে বলল, জান, আজ আমার আরেকটা রাতের জন্য বড় নস্‌টাল্‌জিয়া লাগছে। সুখের অতীতের জন্য মনটা আকুলি বিকুলি করছে।

স্বয়ম্ ভাল করেই তার ভিতরের কথাটা বুঝেছিল। সামনেই আসছে মরণ অভিযান। তার আগে অতীতের জীবনরসেব আস্বাদটুকু আবার ঝালিয়ে নেওয়া ভাল। তাহলে জীবনটা বৈষ্ণবের ঝুলি থেকে উজাড় করে ঝেড়ে ঝুড়ে দেওয়া সহজ হবে।

সে হেসে বলেছিল, তোমার নস্‌টালজিয়ার, পুরনো সুখের কথা মনে করে আকুলি বিকুলি হবার রহস্যটুকু খুলে বল। হয়ত কালই আর বলবার মত মন থাকবে না। সময় থাকবে কিনা তাই বা কে জানে।

দুজনেই একটু ক্ষণ চুপ করে রইল।

কালকের কথা তুললে তো সামরিক জীবনে আর রহস্য থাকে না কিছুই। মনের মোড় ঘোরাতে হবে।

তাই সব কিছু ঝেড়ে ফেলে স্বয়ম্ গভীরভাবে বলে উঠল, মাইক, ইউ আর গ্রেট; বাট বি গ্রেটার, প্লিজ।

৩৩

তুমি যেন সেই কৃষ্ণ—প্রেমের ঠাকুব কৃষ্ণ। রাধার জন্য অপেক্ষা করে আছ।

বলে মাইক এত মিষ্টি করে হাসতে লাগল যে স্বয়ম্ কোন মতেই রাগ করতে পারল না।

মাইক আরো বলল, জান, তোমায় ফ্লস্ত ফ্রেম অব দি ফরেস্ট কৃষ্ণচূড়ার তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠিক তাই মনে হয়েছিল।

বাধা দিয়ে হেসে উঠল স্বয়ম্, আহা হতে তো পারতাম। কিন্তু কোথায় তোমার কৃষ্ণচূড়া এই জঙ্গলে।

বাধা মানল না মাইক, না হোক কৃষ্ণচূড়া। পইনসেটিয়া গাছ তো বটে। তার রাঙা বাহার কৃষ্ণের ব্যাকগ্রাউণ্ড হিসাবে সমানই মানাবে। তবে একটা কথা ··

উৎসুক হাসিমুখে স্বয়ম্ তাকাল।

—রাধা তো আমাদের জগতে প্রেমের খোলা মাঠই পেয়ে যায়। ঝোপ-ঝাড়ে একটেরে লুকিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয় না। তাই মনে হল ভিনাসের কথা।

রহস্যময় হাসিতে মুখ ভরিয়ে স্বয়ম্ শুনিয়ে দিল, হায়! আমা হেন আর্য সন্তানের জন্য মোটে একটি ভিনাস। অথচ তোমাদের রাজপুত্র প্যারিসের জন্য তিন তিন খানা স্বর্গের দেবী প্রেমিকা হয়ে হাজির হয়েছিলেন।

মাইক বলল, না, ঠিক প্রেমিকা নয়।

স্বয়ম্ মাথা নেড়ে বলল, অবশ্য, অবশ্যই প্রেমিকা। মহাকবি হোমার তো অন্ধ ছিলেন। তাই নজর করতে পারেননি। আমি দিব্য চক্ষুতে দেখতে পাচ্ছি।

এবার বাধা দিল মাইক।

সে বলল, আমি যে ভিনাসের কথা ভাবছি সে একাই গোটা মানুষের প্রস্ফুটিত প্রেমের পক্ষে পর্যাপ্ত।

মুখে হাসি আর চোখে কৌতুক ফুটিয়ে স্বয়ম্ এই অপরূপার কথা জানতে চাইল।

মাইক বলল, ইটালীতে লেক মাজ্জিয়েরোর মধ্যে একটা দ্বীপে টিশিয়ানের আঁকা সেই ভিনাস। ভিনাস অব উর্বিনো। বাস্তব সংসারের রক্তমাংসের দেবী। মদিরা-মধুরা রূপ নিয়ে সুখশয্যায় আধেক শুয়ে রয়েছে। এক হাতে এদেশের কৃষ্ণচূড়ার মত আগুনজ্বালা লালরঙের ফুল। অন্য হাতটি নারীর একান্ত রহস্যটি আবরণ করে রয়েছে। তার নগ্ন দেহলতাই তার সব চেয়ে বড সত্য, সব চেয়ে সার্থক সাফল্য।

এই বরনারীর মোহিনী মায়ায় মিলিয়ে দিল স্বয়ম্ একটু হাসি।

—তুমি কি তাকে প্রাণে জাগিয়ে তুলবার জন্য প্রার্থনা করতে চাও? চাও তো আমি একটা সংস্কৃত মন্ত্র তোমায় লিখে দিতে পারি।

যেন কোন যুদ্ধের, মৃত্যুর ছায়া কোথাও কিছু নেই। দুই যোদ্ধা বন্ধুর সেই মুহূর্তের কথাগুলি রাত্রির অসীমে অনন্ত কালের জন্য ছড়িয়ে রইল।

মাইক প্লেনের গতিপথ মাপতে মাপতে নিজের উত্তরটা মনে করল।

না। সেই কথাগুলি রাত্রির অসীমে ছড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হারিয়ে যায়নি।

মাইক বলেছিল, না, তোমার দেবভাষার মন্ত্র দেবীদের জন্যই উৎসর্গ করে রাখ। আমি কিন্তু ওই ভিনাসকে জীবনে মুকুলিত করে তুলতে চাইতাম না। কারণ রক্তমাংসের নারী হয়ে উঠলে সে আমার মত ইউনিভার্সিটির সামান্য বৃত্তির টাকায় হাড়ে মাসে উপোসী ছাত্রের সঙ্গে মজত না। যে য়্যাপোলো বেলভিডিয়রটি তার নজরে প্রথম পডত তারই সঙ্গে প্রেমে মশগুল হত।

—সেই জন্যেই শুধু?

—হাঁ। সেই জন্যেই। আমি এমন কোন জগতের কথা জানি না যেখানে প্রেম টিকে থাকে আর সর্বদা পরিতৃপ্তি দেয়। না। তার চেয়ে আমি কবিতা আউড়ে যাব। এমন কি ভিনাসের ছবি নকলও করব। কিন্তু কখনো সেই ছবি শেষ করবার জন্য চেষ্টা করব না। শুধু ভালবেসেই যাব। সেই চলমান ভালবাসার মধ্যেই ফুলের মত ভেসে চলবে আমার সুখ।

—ওহ্। এই হচ্ছে তোমার নসটালজিয়ার স্বরূপ?

—উহুঃ। মোটেই নয়। পিছনের দিকে তাকানো, অতীতের কাছে ঋণী বোধ করা কোন কাজের কথা নয়। প্রত্যেক শিল্পীই আগেকার অন্য কোন শিল্পীর ধ্যান না হোক, ধারণাকে চুরি করে। সবাই ধার করে। সবাই অতীত থেকে গ্রহণ করে, তাকে ভাঙিয়ে খায়।

—তুমিও মনে হচ্ছে, হাসতে হাসতে স্বয়ম্ বলল, তুমিও মনে হচ্ছে কোন একটা বিশেষ অতীতের সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়ে আছ।

বলতে বলতে স্বয়মের মুখ মাইকের অনুসন্ধানী নয়নের সামনে কেমন যেন করুণ হয়ে উঠল।

এহেন ভাব যোদ্ধার পক্ষে ভাল নয়। বিশেষ করে যাকে হঠাৎ যে কোন মুহূর্তে, প্রায় বিনা নোটিশে, আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এবং অসীম শূন্য থেকে শত্রুর নরককুণ্ডের উপর। মাইক অভিজ্ঞতার আগুনে অনেক পোড় খেয়েছে।

তাই মাইক তাড়াতাড়ি আর বেশ জোরের সঙ্গে জবাব দিল, টু হেল উইথ দি পাস্ট। অতীতের নিকুচি হোক। আমি কখনো পিছনের দিকে তাকাই না। নস্‌টাল্‌জিয়া নিয়ে মাতামাতি করি না। শুধু আমার শেষ 'সর্টি', লড়াইয়ের হামলাটা কত ভাল হয়েছিল আর এর পরেরটা আরো কত ভাল হবে সেটুকুই আমার মাথাব্যথা। সব চেয়ে খারাপটা কখনো ঘটতে নাও পারে।

একটু থেমে সে বলল, জান স্বয়ম্, ফরাসীতে এই কথাটা চমৎকার ভাবে বলেছে। লে পিয়ার নে প্যা তুজুর সুর।

আরো একটু থেমে সে আবার শোনাল, "তুজুর" অর্থাৎ সদাসর্বদা সেই কথাটি মনে রেখো, ভাই।

সেই কথাটা মাইক আবার মনে মনে আবৃত্তি করল। মনে-মনে স্বয়ম্‌কে উদ্দেশ করে আবার উচ্চারণ করল। জীবনের চেয়ে বড় কিছুর ধ্যানে যে নিরত নিয়তি যেন তার প্রতি প্রসন্ন হয়। বিনা বিপদে বিনা অপঘাতে তাকে প্রিয়ার কাছে ফিরিয়ে আনে।

এই প্রার্থনা তো সে করবেই। স্বয়ম্‌ও যে সেই রাত্রি নিশীথে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে তার জন্য এমনি একটি শুভ কামনা জানিয়েছিল।

আর··আর·শেষ পর্যন্ত একটি কথায় নিজের অন্তর প্রায় খুলে দেখিয়েছিল।

স্বয়ম্ বলেছিল, জান, মাইক, একটা গ্রীক কবিতার অনুবাদ পড়েছিলাম মিলিটারীতে যোগ দেওয়ার পরে। তোমাদের ব্রিটিশ এক্‌সপিডিশনারী ফোর্স অভিযানী সেনাদের মধ্যে যারা এই বর্মা সীমান্ত থেকে ফিরবে না তাদের জন্যই যেন গ্রীক কবি লিখে গিয়েছিলেন :—

তোমরা যখন ফিরে যাবে ঘরে
মোদের কথা বলো তাদের সবে ;
তাহাদেরি আগামী দিনের তরে
মোদের আজ সঁপে গেলাম ভবে।

এবং সর্বদা প্রার্থনা করেছি যে তোমার সম্বন্ধে যেন একথা লিখতে না হয়। না হয়। কখনো না হয়। তিন দিব্যি।

সেই স্বয়ম্‌কে আজ এই প্লেন থেকে আঁধারে অজানা আঘাটায় ঝাঁপ দেবার আগে মাইক একটা কথা বলবে কি বলবে না ভেবে পাচ্ছে না।

অথচ জাপানী বাহিনী শত্রুপক্ষ হিসাবে এত দুর্ধর্ষ আর নৃশংস যে কোন পাশ্চাত্ত্য শত্রুবাহিনীই এত ভয়ংকর নয়। স্বয়মের শিশুর মত সরল, পণ্ডিতের মত ধ্যানমগ্ন মন। ভি ফোর্সের বেপরোয়া বিপদের, দুঃসাহসী অভিযানের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সে হয়ত এই যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে ওঠেনি।

এদিকে শত্রু এখন বিমানবাহিনীর অভাবে কোণঠাসা হয়ে এসেছে। ফলে হয়ে উঠেছে আরো নিষ্ঠুর। আরো মরীয়া। আরো বেপরোয়া।

সিঙ্গাপুরের পতনের সময় জাপানীদের বিজয় উল্লাসের মধ্যে যেটুকু খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব হয়ত ছিল এখন তাও নেই।

মাত্র হাজার পাঁচেক সৈন্যের জীবনের বিনিময়ে প্রায় জলের দরে ওরা সিঙ্গাপুর জয় করে নিল। সাত শতাব্দী আগে চেঙ্গিশ খানের বন্য মোঙ্গল বাহিনী ভিয়েনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল খোলা তলোয়ার হাতে। তারপর এত শতাব্দী পরে একটা এশিয়াটিক বাহিনী শ্বেত জাতির শক্তি আর সাম্রাজ্যের সব চেয়ে বড় ঘাঁটি সিঙ্গাপুর পায়ের তলায় পেয়েছে।

এক লক্ষ ব্রিটিশ সৈন্য যখন বন্দী শিবিরে ঢুকছিল তখন তাদের বারবার মনে পড়েছিল এই "ছোট্ট হলদে বাঁদর"দের প্রতি অতীতে নিজেদের কঠিন ঘৃণা আর দুর্ব্যবহারের কথা। এখন এসেছে তাদের প্রতিহিংসার, প্রতিশোধের পরম লগ্ন।

'এই মোটা কথাটা ইংরেজ আমেরিকান জাতিরা ভুলে গিয়েছিল। সেজন্যই জাপানীরা বন্দী সৈন্যদের সঙ্গে যে ব্যবহার করছে তার নিন্দায় পঞ্চমুখ। মাইক নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখেছে।

কিন্তু জাপানী সৈন্যদের জাতির প্রতি, জাতির নেতা—স্বর্গ থেকে নেমে আসা নেতা—সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের দিকটাও ভুললে চলবে না। এই

সিঙ্গাপুর অস্ত্র সমর্পণ করে সারেণ্ডার করল সন্ধ্যা সাতটায়। কিন্তু সেই বক্তৃতা যিনি জাপানের পক্ষে গ্রহণ করলেন সেই জেনারেল য়ামাশিটা সেই রাতে শুধু যে ঘুমাতে পারেননি তা নয়। অশান্ত হৃদয়ে বারুদ আর ধোঁয়ার গন্ধে ভরপুর আকাশের তলায় পাহারাদার ছাড়াই একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। সারা রাত।

ভোরবেলা যখন উঠতি সূর্যের প্রথম কিরণ আকাশে ফুটে উঠেছে তখন তিনি টোকিয়োতে সম্রাটের প্রাসাদের দিকে মুখ করে সিঙ্গাপুর থেকে প্রার্থনা করেছিলেন। বার বার প্রায় সাষ্টাঙ্গ হয়ে জাপানী প্রথায় অভিবাদন করেছিলেন।

শুধু তিনি কেন, কোন লোকই তখন জানত না যে তার বিজয়ে পৃথিবীটা ওলটপালট হয়ে গেছে। আর কোন দিনই সেই আগেকার পৃথিবী ফিরে আসবে না।

আশ্চর্য এই জাপানী মনোবৃত্তি। যুদ্ধে এসে ওরা পরাজিত শত্রুকে সামুরাই সোর্ড দিয়ে ঘটা করে মাথা কেটে ফেলে পরমুহূর্তে চাঁদের বর্ণনা করে কবিতা লিখতে পারে। এই বিচিত্র 'এনিগ্‌মা' অর্থাৎ রহস্যে ভরা দ্বিমুখী দ্বৈতবাদী জাপানী চিত্তও এই যুদ্ধের ফলে বদলিয়ে গেছে। ওদের ফুল আর রক্তে মাখামাখি সভ্যতার এই দিকটা বাইরের জগৎ ঠিক বুঝতে পারে না।

শুধু এইটুকু বুঝতে পেরেছে যে পরাজিতের প্রতি হিংস্রতায় ওরা সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। সেই প্রবৃত্তি আরো বেশী ভয়াল হয়ে ওঠে যখন ওরা দেখে যে কোন কালা আদমী শাদা ইংরেজ আমেরিকান পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করছে। স্বয়মের জন্য সেজন্য আরো বেশী চিন্তা। দেবদূতরা তাদের সব ডানা দিয়ে ওকে রক্ষা করুন।

মাইকের মনে পড়ল নেপোলিয়নের কথা। কোন উচ্চপদে সেনাপতিদের নিয়োগ করবার সময় উনি তাদের অভিজ্ঞতা বা রণকুশলতার কথা বিচার করতেন না। জিজ্ঞেস করতেন—"ইজ হি লাকী?" ভাগ্য, ভাগ্যই সবচেয়ে বড় কথা। পুরুষকার বড় হতে পারে। কিন্তু মোড় ঘোরায় ভাগ্য।

স্বয়ম্‌ সেনাদল নিয়ে শত্রুর ঘাঁটির উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ওদের পিছনে আকাশ থেকে নামবে। ভারী কাজে। কিন্তু হালকা হাতে নয়। হাতে হাতে শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। নিজেদেরই পিঠে বাঁধা কিট ব্যাগে আছে

বাজুকা, গ্রিনেড, প্ল্যাস্টিক বিস্ফোরক মশলা। শত্রুপক্ষের যে কোন নিশানাহীন এলোপাথাড়ি গুলিই সে গুলিতে রঙমশালের খেল দেখাতে পারে।

জীবন্ত রঙমশাল আর তুবড়ীর লীলা তখন ফুটে উঠবে এই জাম্পিং স্মক অর্থাৎ ঝাঁপানী পোশাকে ঢাকা মনুষ্য দেহেই।

রাতের আকাশে উল্কাপাত দেখতে কত মজা, কত কৌতূহল, কত কল্পনা। কিন্তু নিজের সর্বাঙ্গে অস্ত্র আর বিস্ফোরক বয়ে বেড়ানো অবস্থায় হাতের কাছে, নিজের চার ধারে মেশিন গানের লাল মিটিমিটি হল্কা আর বুলেটের বারিধারা দেখার মধ্যে আছে কোন্ মজা? কোন্ কৌতূহল? কোন্ কল্পনা?

না। এই সীমাহীন বিপদে অসীম শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে স্বয়ম্‌কে সেই গোপন কথাটি বলে দেওয়াই ভাল। সে নিশ্চয়ই নিজেকে সব কিছুব জন্য, শেষ পরিণতির জন্য পর্যন্ত প্রস্তুত করে নিয়েছে। 'ডেথ অর গ্লোরি' মবণ না হয় মহিমা এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ যোদ্ধা হয়ে উঠেছে সে। এখন শুধু তাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার সেই কথাটি যা হয়ত ওর রক্ষাকবচের কাজ করবে।

মাইক প্লেনের গতি কমিয়ে আনল।

প্যারাট্রুপ বাহিনী তার মানে বুঝতে পেরে তৈরী হতে লাগল। ফ্লাইট ডেকে ওরা শুধু দুজন। শেষ পরামর্শ করে নিচ্ছে।

এবং যে কথাটা হয়ত শেষ কথা হয়ে উঠতে পারে তাও এখনি বলে দেওয়া দরকার।

সময় নেই।

আর সময় নেই একটুও।

পাশে বসা স্বয়মের কানে কানে মাইক বলল, স্বয়ম্, স্বাতীব খবর তুমি জান কিছু? তোমাব কাছে তো ওর কথা শুনিনি সম্প্রতি।

হঠাৎ খুশীতে ভরে উঠল স্বয়মের মন। সে জিজ্ঞাসা করল, তুমি জান নাকি কিছু? তুমি তো বার বার বেস এরিয়াতে যাবার সুযোগ পাও। এমন কি কলকাতা দিল্লীতেও।

খুব মৃদুস্বরে, যেন শুধু নিজেকেই শোনাচ্ছে এমনভাবে মাইক বলল, স্বাতী খুব কাছেই আছে। 'বেস' এরিয়ার কাছেই। সে এখন 'ওয়াফে'র স্কোয়াড্রন অফিসার।

উল্লাসে নয়, আনন্দে স্বয়মের মন ভরে উঠল। স্বাতী এত কাছে। কেন— সে কথা তার চেয়ে বেশী আর কে বুঝবে?

হতাশার নয় ভাবনার রেশও স্বয়মের মনে জেগে উঠল। স্বাতী শুধু শত্রুর নয় মিত্র সেনারও ভয়ানক কাছে। বিপদ আসে বহু রকমে। ঘরে, বাইরে, চারি ধারে।

কিন্তু কোন বিশেষ ভাবান্তর না দেখিয়ে সে প্রশ্ন করল, কিন্তু মাইক, কি করে এটা সম্ভব হল? ডবলিউ. এ. এ. এফ. বিমান বাহিনীর সহায়ক নারী সেনা তো ডিফেন্স্ উইমেনস ফোর্সের রেগুলেশনের আওতায় পড়ে। স্বাতী তা হলে রেগুলার এনলিস্ট হয়েছে? রয়্যাল এয়ার ফোর্সের এটা একটা অপরিহার্য ইউনিট। স্বাতী, স্বাতী, নাও আই য়্যাম গ্রেটফুল টু গড। স্বাতী, আত্মবিকাশে সার্থক স্বাতী।

গভীর স্বরে মাইক বলল, তুমি ঠিক বলেছ স্বয়ম্। কাউণ্টেস অব কার্লাইল নিজে ওকে বাছাই করে নিয়েছিলেন দিল্লীতে। কাউণ্টেস বলেন, স্বাতী ইজ এ রেয়ার ফাইণ্ড। সুদুর্লভ আবিষ্কার।

—আশ্চর্য! আশ্চর্য!

হ্যাঁ, আশ্চর্যই বটে। তোমার আমার কখনো এরকম ভাবে সমর নায়কদের নজরে আসবার যোগ্যতা হয়নি। 'সিয়াক' সাউথ ঈস্ট এশিয়া কম্যাণ্ডের 'সুপ্রিমোব' স্ত্রী লেডি মাউণ্টব্যাটেন দিল্লীতে 'স্যালুট দি সোলজার' বলে একটা বক্তৃতা সভার বন্দোবস্ত করেছিলেন। তখনি স্বাতীর প্রতিভার ট্যালেণ্টের সঙ্গে ওদের প্রথম পরিচয়। ওর ব্যক্তিত্ব, মানুষ চালানোর ক্ষমতা, ক্ষুরধার বুদ্ধি ওকে একধাবে প্রথম সারিতে এনে দিয়েছে খুব তাড়াতাড়ি।

স্বয়ম্ শুধু বলল, গড ইজ গ্রেট।

মাইক উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে চলল, জান, এই যে আমাদের আজকের অপারেশন, এই অভিযানের প্রত্যেকটি বিমানের গতিবিধি ব্যবস্থা সব বেস কণ্ট্রোল অপারেশন রুমে বসে সে-ই নিশান দিয়ে বোর্ডে প্লট করার তদারকী করছে। শত্রুপক্ষের বিমান হানার পথ, আমাদের শত্রু এলাকায় হানার, নিচে নেমে এসে বোমা ঝরানোর সরু লাইন সবই ওর রাডারে ফুটে উঠছে। আশ্চর্য, এমন যুদ্ধের ট্যাকটিকস কি করে যে এত তাড়াতাড়ি এত ওস্তাদের মত আয়ত্ত করে ফেলেছে তা বুঝি না। শুধু সহজাত বুদ্ধি, শুধু শেখানোর কৌশলে অতটা সম্ভব হয় না। আবো কিছু আছে। মন, মন প্রাণ ঢেলে দেওয়া।

স্বয়ম্ কিছুই মন্তব্য করল না। এই অভিনব আবিষ্কারের বিস্ময় যেন সে অন্তরের অন্তস্তলে একেবারে নিজের করে নিচ্ছে।

শুধু অস্ফুট স্বরে সে বলল, স্বাতী, স্বাতী।

মাইক তা বুঝল। তাই কথা ঘোরাবার চেষ্টায় বলল, স্বয়ম্, তুমি যদি ওকে যোদ্ধার সাজে দেখতে। কাঁধের ওপর দুটো রিং বোনা ; তাদের মাঝখানে একটি সরু রিং। মাথায় তেরছা স্লাউচ হ্যাট, তার ওপর একটা ঝলমলে ফ্ল্যাশ। ব্যক্তিত্বে ঝলমল, নেতৃত্বে অবিচল মহীয়সী এক নারী।

সময় হয়ে এসেছে। মরণ ঝাঁপের সময়। সঞ্জীবনী বাণীটুকু এখন না দিলে আর কখনো দেওয়া হবে না।

মাইক বলল, স্বয়ম্, ডিয়ার স্বয়ম্। তোমায় একটি কথা জানিয়ে দিতে চাই। এই মরণ ঝাঁপের আগে। তুমি দেখেছ নিশ্চয়ই যে সম্প্রতি তোমার প্রত্যেকটি অভিযান হয়েছে আমার সঙ্গে। কেন, তা তোমার জানা দরকার।

স্বয়ম্ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে শুধু তাকাল।

—স্বয়ম্, তুমি তা জানলে নিজেকে অনর্থক অকারণ ঝুঁকির সামনে তুলে ধরবে না। স্বাতীর অনুরোধ। স্বাতীর। সে চেয়েছে যে তুমি যথা সম্ভব পাকা ব্যবস্থায়, পাকা হাতের আওতায় কাজ করে যাও। তাই।

স্বয়ম্ আবার চোখ তুলে তাকাল।

—ডিয়ার স্বয়ম্, তার মানে তুমি নিজেকে অকারণে অযথা বিপদে ফেলো না। সফল হবার জন্যই সাবধানতা দরকার। মনে রেখো···

স্বাতীর অনুরোধ।

স্বয়মের সার্থকতা।

৩৪

নিমেষে অমৃত রসে ভরে উঠল স্বয়মের মন। ঝাঁপ দেবার খোলা প্রান্তরটা এক মিনিটের মধ্যে দেখা যাবে। প্লেন নীচু মুখ করে ঘুরতে ঘুরতে নামছে। এবং আবার একটু সোজা হলেই সেই চরম মুহূর্ত।

তার আগে হঠাৎ, হে ভগবান, হঠাৎ যখন স্বাতীর নামটি আমার কানে তুলে দিয়েছ তার কথা একটু ভাবতে দাও। আমার সব ব্যবস্থা আর অনুচরদের প্রতি সব নির্দেশ ঠিক করা আছে। কর্তব্যে কোন ত্রুটি করিনি।

কাজেই স্বাতীর কথা হঠাৎ একটু ভেবে নিলে বীরের ধর্মে নিশ্চয়ই পতিত হব না।

স্বাতী আমার কথা ভাবছে। আমার নিরাপদে, তার মানে যথা সম্ভব কম বিপদে, যুদ্ধে এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছে মাইকের মারফত। সেই স্বাতী।

তার কথা আমায় একটু ভাবতে দাও।

না। মানুষের মরদেহ নিয়ে, রক্তমাংসের মরণলীলা নিয়ে এত কারবার করেছি যে সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে এই মুহূর্তে স্বাতীর কথা ভাবব না। জীবনের চেয়ে বড় সে। জীবনাতীত হয়ে থাক।

তবু—তবু তো ভুলে থাকা যায় না।

মরণ ঝাঁপের ঠিক আগে একটা ছবি মনে পড়ল। প্লেনের ইঞ্জিনের চাপা আওয়াজ যেন গানের সুরের মত ধ্বনি তুলছে। তাই রাজস্থানী রাগিণীর ছবি মনে পড়ল। স্বয়ম্ স্বাতীকে দেখল দেব গান্ধার রাগিণীর রূপে। মিলন-প্রত্যাশী প্রেয়সী প্রিয়ের নিরাপদে ফিরে আসার জন্য প্রার্থনা করছে। যোগিনী রূপে। ভোগবিলাস ছেড়ে দিয়ে। তার চুলের চূড়ার উপর সাজানো মণিমুক্তা মনের মধ্যে ঠাঁই নিয়ে প্রেমের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে।

প্রাচীন রাগিণীর রূপে স্বাতীকে কল্পনা করে সে একটা বিচিত্র আনন্দ পেল। বিরাট নিষ্কৃতি। সংসারে তার এখন কোন ব্যর্থতা, কোন না-পাওয়ার বেদনা রইল না।

এবার এখনি তাকে ঝাঁপ দিতে হবে। মনকে সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করে নিল।

এক লহমায় অতীত স্মৃতি মুছে নিল। দলপতিই তো পথ দেখাবে। অফিসার কম্যাণ্ডিং এই ইংরেজী শব্দটা অনেক বেশী জঙ্গী। অনেক বেশী জোরদার।

রেডি টু জাম্প।

ঝাঁপের জন্য তৈরী হও।

সবাই উঠে প্লেনের শিরদাঁড়ার সঙ্গে লম্বালম্বি যে শক্ত ডাণ্ডা লাগানো আছে তাতে নিজেদের আঙটাগুলি আটকিয়ে নিল। যাতে হঠাৎ টানের আকর্ষণে হুড় হুড় করে সবাই দলকে দল ছিটকে বেরিয়ে না যায়।

বাতাস তার হালকা ভাব হারাচ্ছে। আর তার চাপে কানে একটু যন্ত্রণা মতন হচ্ছে কারো কারো। ঝাঁপের দরজার ঝাঁপিটা খোলা হল। হাওয়ার স্রোতে কারো কারো গাল পতাকার মত পৎ পৎ করে নড়তে লাগল। আর পেটের মধ্যে একটা শূন্যতা তৈরী হয়েছে যেন।

গো-ও-ও।

হাত আর পা জোড়া দিয়ে স্বয়ম্ নিজেকেই যেন ধাক্কা দিল। ঈগল পাখীর মত নিজেকে যেন ডানা মেলে ছড়িয়ে দিল। শরীরটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকে গেল। আর বাতাসের স্রোতের উপরে ঠেলে ওঠা চাপে যেন একটা নরম গদির মত অনুভব হল। যেন সে শূন্যে স্থির দাঁড়িয়ে আছে আর প্রবল বায়ুর বেগ ওর ঝাঁপানী পোশাককে টেনে রুখছে।

স্বয়ম্ জানে যে এই হাওয়ার গদিই শূন্য থেকে নামার সময় ডিগবাজি খাওয়া বা লাট্টুর মত ঘুরপাক খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। পিঠটা একটু বেঁকিয়ে আর হাতপাগুলো ছড়িয়ে দিলে শরীর দিয়ে শূন্যের আয়তন একটু বেশী করে ঢাকা যায়। তখন মিনিটে দু মাইল গতিতে শরীরটা নামতে থাকে।

ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে শাদা তুলোর মত হালকা মেঘ পাঁজা তুলোর মত উড়ে বেড়াচ্ছে। পড়ন্ত বা উঠন্ত সূর্যের আলোয় তাদের উপর কি রঙের খেলাই না দেখা যেত। এখন কিন্তু ওদের মোটেই সুন্দর মনে হচ্ছে না। নীচের জমি, নামবার জমি দেখার অসুবিধা করছে ওরা।

চাঁদের আলো-আঁধারির মধ্যে সে দেখল যে দূরে দূরে পাহাড়ের চূড়াগুলো যেন হঠাৎ মাথা তুলে তারই দিকেই তাকাল। অন্য অন্য প্লেনগুলি যেন ওই চূড়াগুলোর মধ্যে ব্যাকুলভাবে নিজেদের গোপন আস্তানা খুঁজে বের করবার জন্য পাখা মেলে দিয়েছে।

এবার সময় হল।

স্বয়ম্ মোটা ওয়েবিং ফিতেতে একটা হ্যাঁচকা টান মারল। বুকের ছাতিতে একটা আচমকা চাপ পড়ল। যেন ফুসফুস থেকে নিঃশ্বাস বায়ু বেরিয়ে আসতে চাইছে। তারপর...

তারপর নিচের দিকে সে আর তাকাল না। সামনেব দিকেও না। উপরের দিকে চোখ মেলে দিল। প্রাণ ভরে দেখল যে তার উপরে বিরাট একটা ছাতা, রঙ বেরঙের ছাতা খোলা রয়েছে। যেন মহাশূন্য তাকে অদৃশ্য হাত দিয়ে মাথার উপর ছাতা মেলে আশ্রয় দিয়েছে।

ততক্ষণে নীচের পৃথিবী আরো বড হয়ে কাছে এসে গেছে। মাটি, মাটি মা তার স্নেহের আঁচল ছড়িয়ে দিয়ে কোলে তুলে নেবার অপেক্ষায় রয়েছে।

মনের মধ্যে একটা কথা গুঞ্জন করে উঠল। আমার ডানা নেই। ইঞ্জিন নেই। প্লেনের ককপিটের আশ্রয় নেই। কিন্তু আমার মা আছে। জীবধাত্রী ধরিত্রী।

সেই মায়েব কোলে নামবার জন্য পঞ্চাশ ফুট উপর থেকে সে তৈরী হয়ে নিল। থুঁতনীটা বুকের কাছে টেনে আনল। আর কনুই দুটো বগলের কাছে। শরীবটা একটু বেঁকিয়ে পায়ের গুলির উপর ভর করে মাটিতে নামবার জন্য তৈরী হল।

একেবাবে নাচের ত্রিভঙ্গ ধাঁচে।

স্বাতীও তো নাচের কথা বলেছিল। বিদ্যুতের মত কথাটা মনের মধ্যে উদয় হয়েই মিলিয়ে গেল।

এদিকে নীচে থেকে মাটি যেন তেড়ে ফুঁডে উপরে উঠে আসছে। যেন ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে নির্ঘাত।

ততক্ষণে সে মায়ের কোলে আলতো ভাবে নেমেই একটুখানি গড়াগড়ি খেয়ে গেল।

মাথার উপরে আকাশে ধীরে উড়ন্ত সি-৪৭ ডাকোটা বিমানগুলি থেকে মানুষ নামক মালগুলি পরের পর ঝুপ ঝুপ করে খালাস হচ্ছে। সেই মানুষরা তারই সঙ্গী, -তারই হুকুমে নির্দেশে প্রাণ দেবার জন্য প্রাণ হাতে নিয়ে নামছে। মাথার উপর প্লেনের ইঞ্জিনের চাপা আওয়াজ ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত এসে চলে যাচ্ছে। যেন ভগবানের দোহাই দিয়ে শপথ করে যাচ্ছে যে আর এরকম চোরাই হামলা কখনো করবে না। পাহাড়ী চূড়াগুলির দিব্যি।

এদিকে চোরাই মালের মত চুপি চুপি সৈন্যদল নামছে। প্রত্যেকেই

ভগবানের কাছে নিশ্চয় প্রার্থনা করছে যে পা ফেলবার মত একটু মাটি যদি পায় জীবনে কখনো আর এহেন চোরা কারবার করবে না। সমস্ত অন্তরাত্মা বলছে যে চোখ দুটো হাত দিয়ে ঢেকে ফেল, বলের মত নিজেকে বিপদের মুখে এসে গুটিয়ে ফেল। কিন্তু শিক্ষা বলছে যে যদি বাঁচতে চাও যা শেখানো হয়েছে ঠিক তাই কর।

ঠিক যখন ভয় হবে যে যেখানে মাটি থাকার কথা হয়ত সেখানে তা নেই তখনি হঠাৎ একটু ধাক্কা খেয়ে পা দুটো জানিয়ে দেবে যে এ যাত্রা তুমি বেঁচে গেলে।

তখন চোখ মেলে দেখতে পাবে যে চার পাশে ছাতার আঁচল বাতাসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে।

ছাতায় ছাতায় আকাশের চাঁদোয়াটা ভরে গেল।

ততক্ষণে জাপানীরা কোন দূর পাহাড়ের চূড়ার ও. পি. অর্থাৎ নজর ঘুমটির মধ্যে থেকে এই ছাতার সমারোহ নজর করেছে।

তাদের গুলির গরম অভ্যর্থনায় অনেক ছাতা ফুটো হয়ে যেতে লাগল। চুপসিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঢিলের মত অসহায়ভাবে ছাতার আরোহীরা টুপ টুপ করে পড়ে যেতে লাগল। কেহ কেহ পড়বার আগেই গুলির ঘায়ে শেষ হয়ে গেল। শীতের ভোর রাতে বিলের পাড়ে পাড়ে পাঁতিহাঁস শিকারের চেয়েও সহজ এই প্যারাট্রুপ শিকার।

জঙ্গী জীবনের জঙ্গলী সুখ।

অসহ সুখ, অসংখ্য উত্তেজনা। স্বাতীর ভাষায় বেঁচে থাকার রস। নিজের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের সবার নামার প্রতীক্ষার সময়টুকু স্বয়ম্ ফিল্ড গ্লাস দিয়ে চার দিকে কড়া নজর রাখছিল। হঠাৎ স্বাতীর কথা মনে হল—লিভ এ লিট্‌ল। একটুখানি বাঁচো।

মুহূর্তে সেই স্মৃতি সে মন থেকে সরিয়ে দিল। আমার ফোর্সকে যথা সম্ভব বাঁচিয়ে, আমার উপর দেওয়া কাজ সম্পূর্ণভাবে সফল করার মধ্যেই আছে সেই বাঁচা। এই মুহূর্তে সেটাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় বাঁচার রস।

এমন সময় স্বয়মের দলের অনেকগুলি ছাতি ফুটো হয়ে যাচ্ছে দেখে শাদা শাদা ধোঁয়ার ফোয়ারা ওদের চারপাশে ছাউনী রচনা করতে লাগল। সেই আবরণ শুধু শূন্যে, মহাশূন্যে। আকাশে নয়। ওদের তৃতীয় ট্যাকটিক্যাল এয়ার ফোর্স জাপানী ফাইটার ফর্মেশনকে প্রায় কাবু করে এনেছিল। তাই এটা সম্ভব হল।

এবার জঙ্গলের পাশে পাশে পাহাড়ের গায়ে গায়ে কি চমৎকার ধেঁায়ার অঁাচল তৈরী হতে লাগল। যেন প্রাচীন কালের রোম্যান য়্যাম্ফিথিয়েটারের গ্যালারী চারদিক ঘিরে আছে। সেই গ্যালারীগুলিতে নিষ্ঠুর দর্শকরা সারি সারি হাজির। মাঝখানের রঙ্গভূমি এরেনাতে জমায়েত হয়েছে মরণপথ-যাত্রীর দল।

জাপানীরা আকাশী বাহিনীকে চলতি ভাষায় বলে দেবতাদের সৈন্য। কিন্তু পাশার দান উলটে গেছে। এখন শত্রুর প্লেনের অলক্ষ্য পাখা থেকে ঝরে পড়ছে পুঞ্জ পুঞ্জ ধেঁায়া। সৈন্যরা আত্মরক্ষার জন্য এখনো তৈরী হয়নি। তাই অসহায় যোদ্ধাগুলিকে সাময়িক ভাবে আঘাতের আড়ালে রাখা দরকার। মাত্র কয়েকটা মিনিট। তার মধ্যেই ওরা তৈরী হয়ে নেবে।

ততক্ষণে স্বয়মের নিজের দেহের সঙ্গে বাঁধা ছোট্ট রেডিয়ো ফোনটি সে চালু করে নিয়েছে। 'রোজার' 'বোজার' বলে আহ্বান জানাল। তারপর একটি সাংকেতিক খবর আর তার পাস ওয়ার্ডের জবাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি সাংকেতিক নির্দেশ।

সে অনুসারে সেই ধেঁায়ার মেঘের বৃত্তের বাইরে বাইরে কিছু নকল রবারের প্যারাট্রুপার নামিয়ে দেওয়া শুরু হল।

বাইরে থেকে ঘেরাও হয়ে যাচ্ছে এই ভয়ে শত্রুসৈন্য ওই ডামি প্যারাট্রুপারদের দিকে তাদের ফ্ল্যাক গান চালাতে লাগল। রবারের নকল সৈন্যের জান আসল সৈন্যের চেয়ে বেশী শক্ত। একবার গুলির ঘায়েই অনেক সময় ঘায়েল হয় না। শত্রুপক্ষের গুলিগোলার ভাঁড়ার খুব বেশী নয়। সে সব যত বাজে খরচ হয় ততই এদের আরো সুবিধা।

আধুনিক যুদ্ধে বুদ্ধিই সব চেয়ে মোক্ষম হাতিয়ার। আগেকার মত অতখানি যণ্ডা গুণ্ডা হবার ততখানি দরকার এ যুগে আর নেই।

আসাম রাইফেল, বর্মা রেজিমেণ্ট, নেপালী শের রেজিমেণ্ট প্রভৃতি থেকে বেছে নেওয়া পাঁচ মিশেলী টাস্ক ফোর্স নিয়ে স্বয়ম্ তার বিশেষ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ড্রপ জোন অর্থাৎ যে এলাকায় সৈন্য আর হাতিয়ার আর সরবরাহ নামানো হবে সেখানে প্রথমে নিজেদের দখল পাকা করে নিতে হবে। শুধু প্যারাট্রুপ নয়, এর পরে ডাকোটার পিছনে বাঁধা জোড়া জোড়া গ্লাইডার থেকে নামবে আরো সৈন্য এবং সব কিছু।

প্রত্যেকটা গ্লাইডার নামার সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে মানুষ পড়বে ঝাঁপিয়ে আর

গ্লাইডারের যন্ত্রপাতি খালাস করতে হবে। তারপরই সেগুলি টেনে একটেরে সরিয়ে দিতে হবে যাতে অন্য গ্লাইডার সেখানে নামতে পারে। নামবার জমিটুকু লম্বালম্বি পুরো খালি রাখতে হবে।

গহন অন্ধকারের মধ্যে এদিক-সেদিকে চাঁদের আকাবাঁকা রেখা। তাকে ছাপিয়ে হঠাৎ হঠাৎ চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুতের মত বারুদের লীলা। সেই বিস্ফোরণের আলোতে ফুটে উঠছে নিজের দলের সৈন্যদের দেহের দীর্ঘ কম্পিত ছায়া।

আর কম্পিত ছায়া হচ্ছে বনলক্ষ্মীর আঁচলের। দূরে নয়, একেবারে কাছে। চারদিক ঘিরে মায়ের স্নিগ্ধ আঁচল যেমন করে শিশুকে দুরন্ত হাওয়ার ঝাপটা থেকে রক্ষা করতে চায় তেমনভাবে ছড়িয়ে আছে অরণ্যানী। দূর পাহাড় চূড়া থেকে শেলের আঘাতে বাজুকার আস্ফালনে বনের চেলাঞ্চল কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেই বনভূমিই হচ্ছে মা। ধরিত্রী। ধাত্রী।

যেন কোন মহামূল্য সবুজে শ্যামলে মিশানো শাড়ি পড়ে ধরণী এই সৈন্যদলকে আগলিয়ে রেখেছে। এই শাড়িতেই ভোরের কুয়াশা ভেদ করে আলো ফুটে উঠলে দেখা যাবে কতজন শেষ শয্যায় শুয়ে আছে। এই আধো ঝলসানো আলো-আঁধারে বহু হাসি চিরকালের মত শেষ হয়ে গেছে। তাদের মাথা আর আনন্দে দুলে উঠবে না কখনো।

অথচ এই বনের ওপারেই তখন হয়ত কোন সোনালী প্রান্তরে শ্যামল ঘাস হেসে মাথা দোলাতে থাকবে।

কিন্তু কল্পনার কোন অবকাশ নেই। জাপানীরা যাতে পাহাড় থেকে নেমে কোন পাল্টা আক্রমণ না চালাতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই অঞ্চলে ছোট ছোট পাহাড়ী নদীনালার অন্ত নেই। তার উপর কাঠের পোলও আছে। জাপানীরা হয়ত সেগুলি মজবুত করে নিয়েছে যাতে সদল বলে ট্যাঙ্ক আর ওয়েপন ক্যারিয়ার নিয়ে পার হয়ে আসতে পারে। সেগুলি ব্যাঙ্গালোর টর্পেডো বা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে।

স্বয়ম্ তার দলের স্যাপার ও মাইনারদের সে কাজের জন্য পাখার মত ছড়িয়ে দিল। লড়াইয়ের ভাষায় ফ্যানিং আউট।

নিজেদের পক্ষের আরেকটা স্কোয়াড্রন প্লেন মাথার উপর এসে নিচু হয়ে চক্কর খেতে খেতে পিছনে বাঁধা গ্লাইডারগুলিকে ছেড়ে দেবার জন্য তৈরী হতে লাগল। স্বয়ম্ জানে যে প্রথম প্লেনটি চালিয়ে আসছে মাইক। প্রত্যেক

বারই সে-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। অবস্থিতি, গতি, উচ্চতা এ সবই ঠিক ক'রে দেয় সে। বাকী প্লেনগুলি সে অনুসারে চলে। খানিকটা ফিরে গিয়ে আরেক ঝাঁককে পথ দেখিয়ে আনে।

হঠাৎ সেই প্লেনটিই একটা জাপানী গোলার অর্থাৎ ফ্ল্যাকের ঘায়েই হোক বা যে কারণেই হোক দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ফিল্ড গ্লাস চোখে স্বয়ম্ পরিষ্কার দেখল যে পাইলট ইজেকটার সীটের ধাক্কায় ছিটকে বেরিয়ে এসে নিচে পড়ে যাচ্ছে। খুব সন্তর্পণে সে যে দিকে যে জায়গায় সেই মানুষ অথবা বস্তু নেমে আসছে তা লক্ষ্য করতে লাগল। হ্যাঁ প্যারাশুট ঠিকই খুলে গেছে। তবে সম্ভবত একটু দেরীতে। মাটির অনেকটা কাছে এসে। হয়ত গুরুতর আঘাত পাবে।

হে ভগবান্! এই পাইলট আমাদেরই দলের যোদ্ধা, বীর। একে উদ্ধার করতেই হবে। বাঁচাতেই হবে। আমাদের সাফল্যের জন্য এর জীবনের দাম হিসাবের বাইরে।

আর হে ভগবান্! এ যদি মাইক হয় তাহলে তো কথাই নেই। একে উদ্ধার করা অন্য যে কোন কর্তব্যের চেয়ে অনেক বড। এই যুদ্ধে এর চেয়ে বড ধর্ম আর বোধ হয় আমার পালন করার সুযোগ আসবে না। আমাকে পক্ষপুটে আগলিয়ে নিয়ে চলেছে সে। স্বাতীর অনুরোধে। স্বাতীর।

জাপানীরাও নিশ্চয় ওই পডন্ত পাইলটের নেমে আসা লক্ষ্য করেছে। হয়ত ওরাও এই বিশিষ্ট পাইলটকে ঘায়েল বা বন্দী করবার জন্য খুঁজে বেডাবে। আর একটুও দেরী নয়। দ্বিধা নয়।

স্বয়ম্ তাডাতাডি নিজের দ্বিতীয় নম্বরকে কি কি করতে হবে মুখে মুখে নির্দেশ দিল। নিজে কোন্ দিকে অন্ধকারে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে তা বুঝিয়ে দিল। ওষুধ স্ট্রেচার প্রভৃতির ব্যবস্থা যেন সে দিকে পাঠায়। রেডিয়ো ফোনে সাংকেতিক খবর পাঠাল আর বলল যে সরেজমিনে দেখে যথাসম্ভব সংকেতে যেটুকু জানানো সম্ভব তা জানাবে।

সে এগিয়ে চলল। তক্ষুনি।

অন্যান্য ব্যবস্থা সঙ্গে নিতে গেলে যেটুকু সময় যাবে তার জন্যও সে অপেক্ষা করবে না। একা এগিয়ে যাবার বিপদ সে বরণ করে নিল। সেই দুঃসাহস, মনের জোর আর নিজের উপর ভরসা আছে। এই ক মাসের শিক্ষায়, অভিজ্ঞতায় সে এক নতুন মানুষ।

চার দিকে চাপা গুম গুম কামানের ধ্বনি। বিদ্যুতের মত হঠাৎ হঠাৎ বুলেট বাতাসের বুক চিরে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা ভেরি লাইটের আলো এদিক সেদিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক গুলি বা মর্টার বা গ্রেনেড। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ আর মরণ-যন্ত্রণা।

এ সব সত্ত্বেও যেন নিশ্ছিদ্র নিশ্ছিদ্র আঁধার স্বয়মুকে ঘেরাটোপের তাঁবুর মত ঘিরে রেখে ওর সঙ্গে এগিয়ে এগিয়ে চলেছে। সেই অন্ধকারকে সে যেন আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ফেলতে পারে। ঠিক যেমন করে তার হাতের আর পিঠের হাতিয়ার আর এমার্জেন্সী প্যাককে সে ছুঁয়ে দেখে নিতে পারে। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ অন্ধকার শুধু নিবিড় নয়। একটা সাঁতরিয়ে সাঁতরিয়ে এগিয়ে চলা তিমি বা হাতীর মত বিরাট একটা কালিমা। যেন তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।

কেবল হঠাৎ কোন স্টার শেলের আলোয় ইস্পাতের মত মসীনীল আকাশের নীচে ঘন পাহাড়ী জঙ্গল জানান দিয়ে দেখা দেয়।

তখনি দেখা যায় দূরে দূরে প্রেতের মত কিছু গাছ। শেলের ঘায়ে তছনছ। কিন্তু ছেঁড়া প্যারাশুটের চাদরে মোড়া প্রেত ছাড়া ওরা আর কিছুই নয়। কামান আর মর্টারের ব্যারাজ অর্থাৎ একটানা আওয়াজ যেন ওদেরই ভয় দেখানো তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

তারই মধ্যে হঠাৎ একটা চাপা গোঙানি স্বয়মের কানে এল। খুব সাবধানে অন্ধকারে চোখ আর কান খোলা রেখে সে এগিয়ে গেল। নিজেদের একজন সেরা পাইলটকে খুঁজে বের করতে গিয়ে তারই মৃত্যুর কারণ যেন সে না হয়। বিশ্বাস নেই, শত্রুরাও হয়ত রাইফেল নিয়ে তারই দিকে তাক করে অপেক্ষা করছে।

হে ভগবান্! শেষ পর্যন্ত মাইক!

হে ভগবান, তুমি কত মহৎ! তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকে এই সুযোগ এনে দিলে! শেষ পর্যন্ত আমাকে তার পাশে এসে তার রক্ষা আর সেবার চেষ্টা করবার সুযোগ দিলে!

স্বয়ম্ কাছে আসতে আধা অজ্ঞান অবস্থাতেও মাইক বুঝতে পারল যে শেষ পর্যন্ত সে নিজেদেরই সেনাদলের কাছাকাছি রয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, নিজের বন্ধুর কাছে রয়েছে। সেই ভরসাটুকুই তার মনে জোর এনে দিল। জ্ঞান অনেকটা ফিরিয়ে দিল।

স্বয়ম্ পিঠে বাঁধা ফ্লাস্ক থেকে একটু নির্জলা ব্র্যাণ্ডি ওকে খাইয়ে দিল।

প্লেনটা যে জাপানী ফ্ল্যাকের আঘাতে আগুন ধরে জলতে জলতে পাগলের মত এলোমেলো ভাবে কাছের কোন জঙ্গলে গিয়ে পড়েছে তা .আগেই বোঝা গিয়েছিল। এখন দেখা গেল যে মাইকের দুটি পা-ই একেবারে থেঁতলিয়ে গিয়েছে। ইজেক্টার সীটের কল্যাণে সে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু ওই হঠাৎ দুর্বিপাক নীচু লেভেলে ঘটায় সে ঠিক সময়ে প্যারাশুট খুলবার সুযোগ পায়নি। তাই মাটিতে পড়বার সময় পা দুটি ভেঙে গিয়েছে।

এমার্জেন্সী কিটের মধ্য থেকে স্বয়ম্ সিরিঞ্জ ও ইনজেকশন বের করল। এটা বিশেষ কয়েকটা সেনাদলের পক্ষে রুটিন শিক্ষা। ভাঙা জায়গাগুলির কাছে স্থানীয় ইনজেকশন দেওয়া হল। ধীরে ধীরে মাইকের জ্ঞান ঠিক মত ফিরে এল। এবং প্রত্যুৎপন্নমতি বুদ্ধিও।

ভাগ্য ভাল। তাই শুধু যে ঘাড় ভাঙেনি তা নয়। কাঁধের সঙ্গে আঁটা বেতার যন্ত্রটিও ভাঙেনি। তার মাইক্রো ব্যাটারি পর্যন্ত চালু রয়েছে। মাইক তখনি স্বয়মের সঙ্গে পরামর্শ করে নিল।

তারপর নিজের সাংকেতিক কোড নিশানা জানাল। শূন্যের ওপারে বেতার তরঙ্গে খবর তখনি পৌছাল। সঙ্গে সঙ্গে দুদিক থেকে 'স্ক্রাম্বল' করা সংকেতের মধ্যে এই প্রান্ত আর ওই প্রান্তে ব্যবস্থার নির্দেশ। তারপর স্বয়মের অভিযাত্রী দলের সাংকেতিক পাস ওয়ার্ড জানিয়ে, তার দলের অগ্রগতির খবর জানিয়ে দিল।

স্বয়ম্ হিসাব করে ঠিক যে জায়গাতে ওরা দুজন আছে সেই জায়গার সন্ধান দিল। এবং এটাও বলে দিল যে স্মোক স্ক্রিন ব্যবহার কবতে হবে। কারণ এখনো বহু চূড়ায় জাপানী পাহারা আছে। তারা আবার ফ্ল্যাক চালাতে পারে। অন্ততপক্ষে কোন স্নাইপার রাইফেল নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে।

রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতেন। এই বাস্তব বিংশ শতাব্দীতে কৃত্রিম ধোঁয়ার আড়ালও চালু হয়েছে।

থার্ড ট্যাকটিক্যাল এয়ার ফোর্সের আগুয়ান ঘাঁটি থেকে খবর এল যে সে সমস্ত ব্যবস্থাই ওরা করছে। আহত "এস" পাইলটকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্বয়ম্কে বিশেষ করে অনুরোধ করা হল যেন সে মাইককে প্রফুল্ল রাখে, লোক্যাল য়্যানাস্থেটিক দিয়ে যন্ত্রণা কমিয়ে রাখে আর অজ্ঞান বা চঞ্চল হতে না দেয়। আধ ঘণ্টা—মাত্র আধ ঘণ্টা ওকে ঠিকভাবে রাখ। তার মধ্যেই উদ্ধারের ও ডাক্তার পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

মাইকের জীবন, অভিজ্ঞতা আর রণকৌশল মিত্রশক্তির পক্ষে অপূরণীয়, অতুলনীয়ভাবে প্রয়োজন।

স্বয়ম্ সবই বুঝেছে। কিন্তু তার নিজের প্রাণের মধ্যেও মাইকের প্রাণ-রক্ষার জন্য ব্যাকুলতা যে এয়ার ফোর্সের চেয়ে অনেক বেশী। ওদের দরকার সামরিক কারণে। ওর দরকার নিজের প্রাণের টানে।

সমগ্র সত্তা দিয়ে সে মাইককে বাঁচিয়ে রাখবার, উদ্ধার করে ফিরে পাঠাবার ব্যবস্থার চেষ্টা করবে। সে নিজের ইউনিটকে নিজের ফিল্ড টেলিফোনে ওয়াকি টকি যন্ত্রে নির্দেশ পাঠাল। শত্রুপক্ষকে ওদের দিকে আসতে যেন কিছুতেই না দেওয়া হয়। কারণ হিসাবে শুধু জানাল সামরিক গোপন প্রয়োজন। আর নিজের দলের মেডিক্যাল ইউনিটকে হাতের কাছে রাখার জন্য নির্দেশ দিল।

বেশী কথা কওয়া নিরাপদ নয়। কে জানে শত্রুর যন্ত্র আড়ি পাতছে কি না।

রাতের জঙ্গলের বিচিত্র জীবন। বন্য জন্তুর চঞ্চলতা ভরা কিচিরমিচির আওয়াজ। আকস্মিক গোলাগুলিব আব মানুষেব চিৎকারেব আওয়াজ। সব কিছুই থেকে থেকে প্রেতের প্রতিবাদের মত দূরে দূবে জেগে উঠছিল। অস্বাভাবিক আর্তনাদ, প্রাণভয়ে আকুল জন্তু জানোয়ারের হঠাৎ কাছ দিয়ে ছুটে যাওয়া, সমস্ত বনভূমির অস্থিবতা সব কিছুই মাইকেব অশান্ত মন আর দেহেব যন্ত্রণাকে থেকে থেকে বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

স্বয়ম্ বড় বিপন্ন বোধ কবল। আরো ইনজেকশন দিলে হযত হিতে বিপরীত হবে। তার সামান্য ফার্স্ট এড প্রাথমিক চিকিৎসার শিক্ষায় যা কবা সম্ভব তা সে কবেছে। নিজের মেডিক্যাল ইউনিটকে ডাকতে সাহস হয় না। মাটিতে এখনো ফিলড টেলিফোন পোঁতা হয়নি। শত্রুকে এড়িয়ে কথা বলতে চেষ্টা করার বিপদ আছে।

'কিন্তু মাইককে কথা বলে বলে ভুলিয়ে রাখতে হবে। সে ভাবতে লাগল। তার মনের কিনারে কিনারে অমরত্বের আশ্বাস ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। এই অন্ধকারের উপরে সেই অমরত্ব যেন ছায়াপথে নিজের স্বচ্ছ অভঙ্গুর অবিনশ্বর ভরসা ছড়িয়ে রেখেছে। সেই ভরসার বাণী রাতের আকাশে আগুনের স্ফুলিঙ্গ এঁকে এঁকে এগিয়ে আসছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। নীল কৃষ্ণ পটভূমিতে ক্ষণিকের স্বাক্ষর রাখছে।

সে বুঝতে পারল যে এয়ার ফোর্স ওদের দখল করা বনভূমির চারপাশে রক্ষাকারী বৃত্ত রচনা করবার জন্য অনেক প্লেন পাঠাচ্ছে। চূড়ায় চূড়ায় যে সব শত্রু মোতায়েন আছে তারা বোমার হামলার ভয়ে লুকোবে। অন্তত এই বনভূমিকে আক্রমণ করতে বের হবে না। তার মানে মাইকের উদ্ধারের ব্যবস্থা তৈরী হয়ে গেছে। সেই সাহসিক ব্যবস্থা নেমে এল বলে।.

মাইককে সে এই অনুমানটি জানাল।

মাইক খুশী হল। চিন্তাশক্তি হল সজাগ।

সে আস্তে আস্তে বলল, জান, আমি খুশী এজন্য যে আমার দেশ, আমার সেনাদল তার সামান্য সেবককেও ভোলেনি। সেজন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। জীবনের কাছে এবং ভগবানের কাছেও। আমার কথা বলতে বা যুদ্ধের কথা ভাবতে এখন ভাল লাগছে না। কিন্তু তোমাদের দেশের শাশ্বত বাণীর কথা তুমি একটু একটু করে আমায় শোনাতে থাক। মনে আমি শান্তি পাব। আমার দেহের যন্ত্রণা কম বোধ হবে।

স্বয়ম্ উৎসুক হয়ে, পুরোপুরি অবাক হয়ে আহত বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। ন্যাশন্যাল সার্ভিস য়্যাক্টের বা ন্যাশন্যাল ডাকেব জন্য শিক্ষিত ছেলেরা যুদ্ধে এসে যুদ্ধের চেহারা বদলিয়ে দিচ্ছে।

আশ্চর্য এই পৃথিবী। তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য হচ্ছে মানুষের মন। কোথায় কখন যে সে কিসে শান্তি পায় তা ধবাছোঁয়াব হিসাবের বাইরে। এমন একটা কথা যে একেবারে অবাস্তব। লোকে বলবে অসম্ভব. গাঁজাখুরি। তবুও তো এটা সত্য।

হঠাৎ তার মনে পড়ল আরেকজন তরুণ ইংরেজের কথা। ইংরেজ কবি উইলফ্রেড ওয়েন। ১৯১৮ সনে যেদিন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হল ঠিক সেদিনই সে শত্রুপক্ষের শেলের আঘাতে নিহত হয়। তার পকেটে পাওয়া গিয়েছিল তার নিজের হাতে নকল করা রবীন্দ্রনাথের কবিতা। যুদ্ধের হানাহানির প্রত্যক্ষ অংশীদারের মনে গাঁথা ছিল ভারত-আত্মার নিত্য বাণী। শান্তির সন্ধান। সান্ত্বনার বরাভয়।

সেই ঘোর বিশ্বযুদ্ধ যেদিন ঘোষণা হয়েছিল সেদিন মুখরিত ভাঙনের তীরে দাঁড়িয়ে ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ক্লেমেসোঁ আর ফরাসী মহিলা কবি কাউণ্টেস নুয়াইলে গীতাঞ্জলির কবিতার মধ্যে মানসিক আশ্রয় খুঁজেছিলেন।

তার অর্থ স্বয়ম্ এখন বুঝতে পারল।

এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে মরণ-বাঁচনের সন্ধিস্থলে শুয়ে ইংরেজ মাইক, বানিয়ার জাত বলে খ্যাত ইংরেজ সন্তান মাইক, স্বয়মের স্বদেশের শাশ্বত আত্মার বাণী শুনতে চাচ্ছে।

আশ্চর্য! কিন্তু পৃথিবীর সব চেয়ে বড়, জীবনের চেয়ে বড় বিস্ময়গুলি এমন ভাবেই হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয়।

মনে মনে স্বয়ম্ ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল যে সে এই দেশে জন্মিয়েছে। এই দেশের অমর বাণী জানতে পেরেছে। এত মহান, এত বিরাট তার উত্তরাধিকার।

নিজের মুখ মাইকের কানের কাছে এনে সেই বাণী সমৃদ্ধ গুঞ্জনে আবৃত্তি করে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তার ইংরেজী অনুবাদ। বেদ গানের ধ্বনি, মেশিনগানের হুহুঙ্কার নয়, যেন এই যুদ্ধে বিত্রস্ত বনভূমিরই মর্মবাণী। সমস্তটা সত্তা ঢেলে দিয়ে সুর করে সে বেদ থেকে আবৃত্তি শুরু করল।

আশ্চর্য এই যুদ্ধ। অবিশ্বাস্য এই যোদ্ধা দুজনের মনের ধারা। অস্বাভাবিক, সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হলেও ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শোন মাইক, তুমি যা চাও তাই তোমায় শোনাব। যতক্ষণ না তোমার উদ্ধারের ব্যবস্থা এসে পৌছচ্ছে। অথর্ব বেদের ভূমিসূক্তের কথা শোন। যে পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনবে ভেবে তুমি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলে সেই পৃথিবীকে প্রণাম জানিয়ে আরম্ভ করছি :—

"গিরয়স্তে পর্বতা হিমবন্তোঽরণ্যং তে পৃথিবী স্যোনমস্তু।" হে পৃথিবী, তোমার বরফে ঢাকা পর্বত, অরণ্য সমস্তই মঙ্গলময় হোক।

"শিলা ভূমিরশ্মা পাংসুঃ স ভূমিঃ সংধৃতা ধৃতা
তস্যৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যাং অকরং নমঃ।"

শিলা, মাটি, প্রস্তর ধূলি এই সব দিয়ে এই পৃথিবী তৈরী। দৃঢ়ভাবে গঠিত। সেই সোনার বক্ষযুক্তা পৃথিবীকে প্রণাম করি।

শুনতে শুনতে মাইকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শান্তির আভাসে ভরা হাসিতে উদ্ভাসিত।

মৃদুস্বরে বলল, এই মহাসঙ্গীত আরো বল। এখন যদি আমি মরি এই স্তোত্র শুনতে শুনতেই যেন আমি শেষ হয়ে যাই। য়্যাবাইড উইথ মি, ও লর্ড। আমার সঙ্গে থাকো, হে প্রভু।

মৃদু, অতি মৃদু স্বরে স্বয়ম্ বলল, না মাইক, তুমি সেরে উঠবে, বেঁচে

থাকবে। আজকের রাতে তোমার মনে যে কথা জেগেছে তাতে পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে আমরা যারা এই যুদ্ধে মরতে এসেছি, আমরা জীবনে আর মরণে দুইয়েতেই পৃথিবীকে নতুন কিছু দিয়ে যেতে পারব। তোমার মনে সেই সম্পদ আছে।

শান্ত, সমাহিত স্বরে মাইক অনুরোধ করল, আবার বল স্বয়ম্, আরো বল, তোমাদের বিশ্ব আত্মা অনুভবের কথা। আমি বার্লিনে বর্মায় বহু ধ্বংস করেছি। কিন্তু হিংসা করিনি। তাই সৃষ্টির কথা, প্রেমের কথা শোনাও।

স্বয়ম্ আবার বেদমন্ত্র শোনাতে লাগল,—

"জনম্ বিভ্রতি বহুধা বিবাচসং। নানা ধর্মাণং পৃথিবী যথৌকসম্॥

সহস্রং ধারা দ্রবিণস্য মে দুহাং। ধ্রুবেব ধেণুরনপস্ফুরন্তী॥"

বিভিন্ন ভাষার আর বিভিন্ন বিচারের নানা জাতির মানুষকে তাদের যথাযোগ্য বাসভূমিতে ধরণী ধারণ করে আছেন। সর্বদা দুগ্ধবতী গাভীর মত, অশেষ দুগ্ধবতীর মত, তুমি আমাদের ঐশ্বর্যের সহস্র ধারা দান কর।

আবেগে আবেশে মাইক স্বয়মের দুটি হাত মুঠোর মধ্যে ধরে চুপ করে রইল। ওর দু চোখে প্রসন্নতার ধারা।

হাজার কামান আর ইনসেনডিয়ারী বা নাপাম জ্বালানী বোমার আগুন সে ধারাকে কোনদিন নেভাতে পারবে না।

মাইকের মুঠিতে যেন একটি শান্তিকামী আত্মার অনুরণন স্বয়ম্ অনুভব করতে লাগল। সেই আত্মাকে আবাহন জানাচ্ছে মানুষ একটি চরম সংকটের মধ্যে পড়ে। যে সংকট সমস্তটা পৃথিবীর, সকলের অস্তিত্বের উপর মৃত্যুর ছায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সেই আত্মা সাহস আর উৎসাহ আর দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলছে। শুধু মৃত্যু নয়, জীবনের উপরও জয়ী হবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সেই আমন্ত্রণকে গ্রহণ করে জয়ী হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। মুমূর্ষু মানবাত্মাকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে হবে। বেঁচে থাকার অভিশাপগুলির উপর একটা পরম বিজয় হবে সেই ভাবে।

অস্ত্রের উপর আত্মার জয়।

মানুষ মানুষকে যে জয়ের মালা পরিয়ে দেয় তা এই জয়ের পুরস্কারের কাছে তুলনায় কিছুই নয়। স্বাধীনতা আর সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থেকে অনুভব করা এই জীবন। শুধু একটি দিনের পর দিন মরণ নয়। উদ্দেশ্যহীনভাবে ধূলিকণায় জন্মিয়ে ভস্মরাশিতে পরিণতি নয়। অনুভব করা যে অনন্তের বুক থেকে ছিনিয়ে

আনা আকাশছোঁয়া সম্পদ, নিজের বুকে তুলে নেওয়ার মত ধন হচ্ছে এই জীবন। আমরা যাকে জীবনধারণ বলে জানি তার চেয়ে এই জীবন অনেক বড়।

প্রাণের অনুভবে, প্রেমের অভিষেকে, করুণার অশ্রুনিষেকে।

ভাবতে ভাবতে স্বয়ম্ টের পেল যে মাথার উপর সুদর্শন চক্রের মত চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে নেমে আসছে সিকরৃস্কি হেলিকপ্টার। আওয়াজটা যথাসম্ভব কম্বল চাপা দেওয়া হয়েছে। অনেক ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারণ পাখী অন্ধকারে পাখা হাতড়াতে হাতড়াতে ঠিক জায়গাতে এসে নেমে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে খুদে স্ট্রেচার নিয়ে দুজন অর্ডারলি আর ডাক্তার লাফিয়ে নেমে পড়ল। খুব সাবধানে মাইককে তুলে নিল। তারপর একটি হুকুমনামা স্বয়মের হাতে দিল। যদি অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে মনে হয় তাহলে শ্রান্ত কর্ণেলও যেন তাঁর হেফাজতের মূল্যবান আহত পাইলটের সঙ্গে একই সঙ্গে চলে আসেন। তবে এ ব্যাপারে তাঁব নিজের বিবেচনাই চূড়ান্ত।'

অপারেশন অর্ডাবে কারো নাম লেখা নেই। অর্থাৎ হেলিকপ্টার ধবা পডলেও শত্রুরা মাইক আর স্বয়মের পরিচয় জানবে না।

স্বয়ম্ ধন্যবাদ দিয়ে জানালো যে সে যেতে পারবে না। তাব টাস্‌ক ফোর্সের কাজ এখনো পুরো শেষ হয়নি। এবং তাদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে তাদেব সঙ্গেই সে ফিরবে। কিন্তু 'হেলি' যেন এখনি—এখনিই উঠে পডে। তাকে নিজেকে এখনি 'ড্রপ জোনে' গিয়ে টাস্‌ক ফোর্সের ভার নিতে হবে।

ধোঁয়া, শাদা ধোঁয়ার ঘেরাটোপের মাঝ দিয়ে সুদর্শন চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে পুষ্পক রথই যেন আকাশে উঠে গেল। বুক ভরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্বয়ম্ উঠে দাঁড়াল।

জীবনের প্রতি, সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠল। যেন একটি মহান্ সঙ্গীতের রেশে। এই কি তার সেই আধো-জাগরণের সন্ধ্যায় শোনা মুনলাইট সোনাটা?

স্বাতীর ঘরে শোনা বীটোফেনের সঙ্গীতের মানে সে এখন খুঁজে পেল।

তার সমগ্র জাগ্রত চৈতন্য যেন সেই মধুর সুদূর সিম্ফনিতে ভরে উঠল। যেন মৃত্যুকে ছাপিয়ে উঠল জীবন সঙ্গীত। তার আঁধার অতীতের মধ্যে যা কিছু সত্য আর নিত্য ছিল, যা কিছু তাকে অসহায়ের মত সহ্য করেও টিকে থাকতে শক্তি দিয়েছে, যা কিছু বেঁচে থাকার গ্লানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রেরণা

দিয়েছে, তা যেন কোন রহস্যময় মন্ত্রে এক সঙ্গে মহৎ হয়ে উঠে তাকে এই বিশ্বের অখণ্ড ঝঙ্কারে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত করে তুলল।

অনির্বচনীয় একটা প্রসন্নতা নিয়ে সে উপরের দিকে আবার তাকাল। যে পথে পাখীর কুলায়ে ফিরে যাবার মত ভাবে 'হেলি' চলে গিয়েছে। যে পথ দিয়ে মাইক শীঘ্র কোন দিন স্বয়মের স্বাতীকে এই খণ্ডযুদ্ধের খবর মুখোমুখি দিতে পারবে।

আমিও সেই পথে যেতে পারতাম সঙ্গে। কিন্তু ওগো সাথী, মম স্বাতী, আমি সুযোগ হওয়া সত্ত্বেও সেই পথে ফিরে যাইনি। কেন যে যাইনি তাও তো তুমি জানবে। বুঝবে।

ওগো সাথী। মম স্বাতী।

তোমার নিরালা ঘরের নির্জনতায় সেই সন্ধ্যায় প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড সুরা পান করিনি। কিন্তু জীবনসুধা পান করবার, বাঁচবার বাসনা নিয়ে ফিরে এসেছিলাম :

ভোরের আলোয় প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড আভা ঢেউয়ে ঢেউয়ে সোনালী রূপোলী কেশবতী কন্যার চুলের মত ছড়িয়ে পড়েছে চার প্রান্তে। পাহাড়ের শিখরে শিখরে, বনভূমির আনাচে কানাচে।

বনান্তে।

দিগন্তে।

ক্ষিপ্র হাতে সে নিজের ওয়্যারলেস ফিল্ড মাইক্রোফোন তুলে নিল। টাস্ক ফোর্স ওরই নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। এইবার তাদের নিয়ে মায়াবিনী প্ল্যাটিনাম ব্লন্ডের রহস্য অবগুণ্ঠন ভেদ করতে এগিয়ে যাবে নতুন প্রমোশন পাওয়া কর্নেল স্বয়ম্ভু রায়।

সমাপ্ত